সংস্কৃতির রূপান্তর

সংস্কৃতির রূপান্তর

গোপাল হালদার

পুথিঘর
২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫১
তৃতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৬

মূল্য পাঁচ টাকা

জাতীয় মুদ্রণ, ৭৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅবনী মোহন
পাল চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
পুথিঘরের পক্ষ হইতে শ্রীসতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

বাঙালা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে

তাহার সংস্কৃতির

শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম,

আমার সেই

পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের

চরণোদ্দেশে—

গ্রন্থসূচী

ভূমিকা

'সংস্কৃতির রূপান্তরের' এইটি তৃতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণ শুধু 'পুনর্মুদ্রণ' ছিল না; কিন্তু এ সংস্করণ একেবারে পুনর্লিখিত বললেই ঠিক হবে।

এত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ল?—তার কারণ, সংস্কৃতির যে রূপান্তর ১৯৩৯ সনে সাধারণ মানুষের নিকট বিচার্য বিষয় ছিল,—১৯৪৫-এও তা'র রূপ অনেকের চক্ষে এত সুস্পষ্ট হয় নি,—কিন্তু আজ ১৯৪৯ সনে তা সকলকার নিকট প্রত্যক্ষ। আমাদেরই অনেকের চেতনায় তা একটা জীবন্ত সত্য। কেননা, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট শক্তি শান্তির সংগঠনে ও সংগ্রামের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীতে সমাজবাদ ও সমাজবাদী সংস্কৃতি আজ ধনিকবাদ ও ধনিকবাদী সংস্কৃতির তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। আবার, এখন চীনে গণতান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামে চীনের জনশক্তি জয়লাভ করাতে সমস্ত এশিয়াখণ্ডে বিরাট রূপান্তর আরম্ভ হবে। এসবের ফলও দেখছি: একমাত্র আমেরিকা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক শাসক-গোষ্ঠীই 'মজুর-কৃষক রাজের' বুলি আওড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

এ কথাও বুঝতে কারো দেরী হয় না যে, সত্য সত্যই ধনিকতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মই আজ এরূপ:—মুনাফার লড়াই, অর্থসংকট, ফলে অস্ত্র উৎপাদন, এবং শেষে যুদ্ধ। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। অথচ প্রত্যেকটি মহাযুদ্ধেই ধনিক-শক্তিরা দুর্বলতর হয়, শ্রমিক-কৃষক শক্তি অধিকতর শক্তিশালী হয়। কি শান্তিতে, কি যুদ্ধে, ধনিক ব্যবস্থার কোনো দিকেই বাঁচবার পথ এখন নেই। ইতিহাসে এসেছে আজ শ্রমিক বিপ্লবের দিন। এক-এক মাসে এখন এমন পরিবর্তন ঘটছে যা পূর্ব যুগে দশ-বিশ বৎসরেও ঘটত না। কিন্তু এ বিপ্লবী রূপান্তরের চলন্ত প্রতিলিপি দেওয়া এ জাতীয় গ্রন্থের সাধ্য নয়। এ দেশের কোনো মহাসাংবাদিক তা সংবাদপত্রের মাধ্যমেও দিয়ে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, আমাদের মুদ্রণ ও প্রকাশ-ব্যবস্থা ধীরগতি। তাই, দিন থেকে দিনের পরিবর্তনের চিত্র না দিয়ে এরূপ ক্ষেত্রে এখন থেকে লেখকের পক্ষে সম্ভব—প্রথমত, ইতিহাসের মূল গতিধারাকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা;

দ্বিতীয়ত, নূতন সংস্কৃতির মূল সত্য ও তার রূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এখন থেকে 'সংস্কৃতির রূপান্তরে' এই পদ্ধতিই তাই অবলম্বিত হবে: প্রথম খণ্ডে ইতিহাসের ধারা, বিশেষ করে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা, যথাসম্ভব প্রামাণিকভাবে বিবৃত হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে—বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজ সংগঠনের কথা, বিশেষ করে সোভিয়েট সভ্যতা ও বর্তমান সময়কার অন্য দেশের বিপ্লবী সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবিষ্ট হবে। বুঝা সহজ, অতি সংক্ষেপে বল্‌তে গেলেও একখণ্ডে আর এত নতুন জিনিসের কথা বলা সম্ভব নয়। দু'খণ্ডেও যা বলা যায় আসলে তা'ও হবে সংক্ষিপ্ত। বর্তমানে তৃতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল; দ্বিতীয় খণ্ড এখনো মুদ্রণোপযোগী করে প্রস্তুত করা হয় নি। পূর্বেকার প্রথম দেড় শত পৃষ্ঠায় যে ঐতিহাসিক অংশটি ছিল এ খণ্ডে এবার তা'ই পুনর্লিখিত হল, আর পাঠক তুলনা করলেই দেখ্‌বেন, তা শুধু নূতন সংযোজন নয়, তাতে ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিকতম (১৯৪৯ পর্যন্ত) গবেষণা ও সিদ্ধান্তসমূহও যথা সম্ভব গৃহীত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তবু দু'টি কথা স্মরণীয়।—এ গ্রন্থ মুদ্রণ যখন প্রায় শেষ তখন ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে একখানা পরম মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—এস্, এ, ডাঙ্গের ইংরেজিতে লিখিত আদিম সাম্যবাদ হতে দাসপ্রথা পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস (*India* : From Primitive Communism to Slavery, by S. A. Dange, Peoples' Publishing House, Bombay; 2/8)! ইচ্ছা থাক্‌লেও এ সংস্করণে সে গবেষণার সুযোগ গ্রহণ করার আর সময় ছিল না। তাতে হয়ত এ সংস্করণের কোনো কোনো গৌণ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ত—যেমন, 'দাসপ্রথার' কথা। ভারতীয় 'দাসপ্রথা' ও গ্রীক-রোমক 'দাস-যুগের' পার্থক্য তথাপি এতটা গুরুতর যে, তা বিস্মৃত হওয়া চলে না। এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে 'দাসোৎপাদনের' প্রসার কতটা ছিল, তা আরও আলোচনা না হতে বর্তমান মত ও পারিভাষিকই গ্রাহ্য রইল। কিন্তু কম্‌রেড্ ডাঙ্গের গ্রন্থের আসল প্রতিপাদ্য যা তা এসব গৌণ কথা নয়। ভারতীয় ইতিহাসের বস্তুবাদী আলোচনার দিক থেকে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে প্রায় বিপ্লব সাধন করেছেন। অবশ্য তিনি শুধুমাত্র বেদ, মহাভারত প্রভৃতি অবলম্বন করে প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রাচীনতম সামাজিক বিকাশের ধারা উদ্ধার করে দেখিয়েছেন। সে বইতে প্রাক-আর্য

প্রস্তরযুগ বা মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি উন্নতস্তরের বৃত্তান্ত আলোচিত হয়নি। সন্দেহের প্রায় অবকাশ নেই যে, বেদের প্রাচীনতম অংশে (যখন ও যেখানেই সে সব ঋক্ রচিত হোক্, আর যত পরেই তা গ্রথিত হোক্) 'আদিম সাম্যবাদী সমাজের, (তা ভারতীয় হোক বা অন্যখানকার আর্য-ভাষী গোষ্ঠীদের হোক) চিত্র রয়েছে,—যখন 'ব্রহ্মার' অর্থ ছিল সেই 'সমাজ', 'যজ্ঞের' অর্থ ছিল আহার্যের সমবেত উৎপাদন (শিকার) ও একযোগে ভোগ; ইত্যাদি। 'যজ্ঞের' এই চাবি কাঠি আবিষ্কার করে ডাঙ্গে মহাশয় বেদের সমস্ত সমাজ চিত্রকে বস্তুবাদীর পক্ষে সহজগম্য ও সহজ গ্রাহ্য করে তুলেছেন। আমরা দেখি—এসব শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে, 'আদিম সাম্যবাদ' থেকে 'গণ-গোত্রের' যুগ পেরিয়ে সমাজ চলে 'দাসপ্রথার' দিকে; আর বেদ সেই পরিবর্তনশীল সমাজের বিবিধস্তরের চিত্র সঞ্চিত করে রেখেছে (যেমন, ('পুরুষ সুক্ত'),—শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে তা পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। মহাভারতেও বিবাহ প্রথার বিকাশ থেকে আরম্ভ করে একেবারে দাসপ্রথার উৎপাদন ও কুরুক্ষেত্রে শোষকদের আত্মসংগ্রাম পর্যন্ত নানা চিত্র বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে। আর 'গীতায়' রয়েছে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে অর্থাৎ শোষক-শ্রেণীর নিজ ব্যবস্থার স্বপক্ষে, অধ্যাত্মবাদী কসরৎ। যথা, 'আত্মীয় স্বজন কেউ কিছু নয়। হে অর্জ্জুন, আমার কথা শোনো:—আসল হল এ শোষণধর্মী সমাজব্যবস্থা রক্ষা; নিষ্কাম হয়ে তা রক্ষা করো। কেননা, কামনা থাকলেই দেখ্‌বে তোমার কর্ম বা শোষণ-মূলক চেষ্টার ফলে আসলে কোনো অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না। তখন ব্যর্থতায় বিদ্রোহী হতে হবে এ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। নইলে যাবে মহাপ্রস্থানের পথে।'—কম্‌রেড্ ডাঙ্গের এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। মোটের উপর, ভারতীয় আর্যভাষীদের গ্রন্থ থেকে এ কয়টি মৌলিক কথা উপস্থিত করে কম্‌রেড ডাঙ্গে ভারতীয় সমাজ-বিকাশের প্রাচীনতম ইতিহাস অধ্যয়নের গোড়াপত্তন করেছেন।—এ গ্রন্থের পাঠকরাও অনুগ্রহ করে তা অনুধাবন করবেন।

দ্বিতীয় কথাটি আধুনিকতম ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে। স্বভাবতই এ বিষয়টি বিতর্কমূলক। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর বিভ্রান্তিকেই এখানে (পৃঃ ২৪৫) দূর করবার চেষ্টা হয়েছে, সাধারণের যুক্তিতে ও দৃষ্টিতে। শ্রেণীদৃষ্টি সম্পন্ন পাঠকের নিকট সে চেষ্টা অপ্রচুর মনে হবে কি? তথাপি আশাকরি নিরর্থক বা ভুল মনে হবে না। অবশ্য কেউ ভুল বুঝ্‌তে চাইলে

কারো সাধ্য নেই তাকে ঠেকাবে—বিশেষত যখন মুদ্রণ শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন। পাঠক সাধারণ মনে রাখবেন যে, ভাষার তর্ক কেন, প্রদেশের তর্ক ও অনুরূপ সকল তর্কের পিছনেই থাকে শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘাতের সত্য; এবং ভাষার কিংবা প্রাদেশিকতার তর্ক দূর হয় না যতক্ষণ শ্রমিক শ্রেণী আপনার শক্তির দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে এ মিথ্যা তর্ক মিটিয়ে না দেয়। কিন্তু তার পূর্বেও ভাষা-বিরোধ প্রভৃতিকে অবজ্ঞা করবার উপায় নেই; তা খণ্ডন না করলে প্রগতির পথ সুগম হয় না। শুধু শ্রেণীর দোহাই-ই যথেষ্ট নয়; শোষকের যুক্তিকে নানা দিক থেকেই খণ্ডন করতে হয়। আবার, সে চেষ্টায় এ মূল কথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আজ সমাজবাদী সংস্কৃতি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করছে,—এখনো তার পথে বাধা আছে, সে বাধা দূর করতে হবে;—কিন্তু সংকট আজ গণসংস্কৃতির নয়, সংকট আজ বুর্জোয়া সংস্কৃতির—যা ধসে পড়ছে তা'ই যা বাধাও। আজকের পৃথিবীতে সমাজবাদ ও সমাজবাদী সংস্কৃতিরই শক্তি বেশি, তা'ই সৃষ্টির শক্তি। অতএব, আজ সংস্কৃতির সত্যসত্যই সংকট ততটা নেই, বরং আজ সংস্কৃতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের দিন।

পূর্ব পূর্ব সংস্করণে যা বলা হয়েছিল এ সংস্করণে তা পুনরুল্লেখ করার স্থান নেই। তথাপি বলা প্রয়োজন—এ গ্রন্থ সংস্কৃতির বিশদ আলোচনা নয়, ইতিহাসের মৌলিক গবেষণা নয়: কোনো বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের জন্যই লিখিত নয়; সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্য সাধারণ একটি ভূমিকাগ্রন্থ মাত্র। তাতেও ভুলত্রুটী অসংখ্য থাকবার কথা;—তা প্রদর্শন করলে বাধিত হব। গ্রন্থপঞ্জিতে যথাসম্ভব সহজ লভ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁদের নিকট ঋণী তাঁদের নাম উল্লেখ করতে লজ্জা নেই, কারো নাম বাদ গিয়ে থাকলেই লজ্জার কথা।

শেষ কথা, মুদ্রণ কালে লেখক অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিও বিভীষিকাজনক। অতএব, কিছু কিছু অনাবশ্যক কথার জন্য, বিশেষত শেষ দুই অধ্যায়ের নানা ভ্রমপ্রমাদের জন্য পাঠকেরা ও মুদ্রণ-কর্মীরা লেখককে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। ইতি ৭ই আগস্ট, ১৯৪৯।

—লেখক

কথারম্ভ

কথাটা উঠিয়াছিল এইরূপে—উঠিয়াছিল ১৯৪০ সনের মে-জুন মাসে—মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন কারারুদ্ধ হইয়াছেন; 'জীবন-সাহিত্য' নামক একখানি ক্ষুদ্র হিন্দী মাসিকপত্রে পণ্ডিত বনারসী দাস চতুর্বেদী রাহুলজীর একটি জীবনী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দী সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে, চতুর্বেদীজী এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত—বাঙলায়ও তাঁহার সমকক্ষ নাই। কিন্তু কথাটি এই দিকে গেল না, গেল অন্য দিকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জীবন-সাহিত্যে'র সেই চৈত্র-সংখ্যা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, রাহুল সাংকৃত্যায়নের ফটো, আর তাঁর পার্শ্বে—যার জন্য এই পত্রখানা আপনাকে দেখাচ্ছি—দেখুন তো কি, কার চিত্র?"

দেখিলাম মাতৃ-আলিঙ্গন-নিবদ্ধ এক ক্ষুদ্র শিশু। নীচেকার লেখা পড়িলাম—"মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়নকী পত্নী শ্রীমতী এলেন স্মের্তোল্না, অপনে নবজাত পুত্র ইগোর রাহুলোবিচ্ সাংকৃত্যায়নকে সাথ।"

কৌতুক ও কৌতূহল দুইই প্রচুর বাড়িয়া গেল। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পর্কে আমার যাহা জানা ছিল তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সংবাদ যথেষ্টই পাইয়াছিলাম। তাহার উপর জানিতাম—এই অশান্ত মানুষটি যখন সেবার রুশিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্ববর্তী জীবনের বৈষ্ণব মোহান্তের পরিচ্ছদের মতোই পরবর্তী এই বৌদ্ধ শ্রমণের বেশবাসও পরিত্যাগ করিয়া কিসান কর্মী হিসাবে বিহারের অগ্নিগর্ভ কিসান আন্দোলনের মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বিহারের জমিদার-প্রভাবিত কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে এক প্রবল শত্রুরূপে গণ্য করিতে বাধ্য হন। লোকচক্ষে তাঁহাকে হেয় করিবার প্রধান অস্ত্ররূপে সেদিন বিহারের সেই মন্ত্রিমণ্ডলী প্রয়োগ করিয়াছিলেন রুশিয়ায় রাহুলজীর এই পরিণয়-সংবাদটি। বলা বাহুল্য, সংবাদটি মিথ্যা নয়; রাহুলজীও তাহা অস্বীকার করেন

নাই কিন্তু শুধু সংবাদের মধ্যেই প্রচার নিবদ্ধ রহে নাই। আর সেই প্রচার কিরূপ ক্রমবর্ধিত 'মিথ্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। যে দেশে ব্রহ্মচর্যের এত সমাদর যে, বিবাহ না করিলেই মানুষের চক্ষে মহৎ হইয়া উঠা যায়, সে দেশে সন্ন্যাসী বা শ্রমণের পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিলে কি আর প্রশ্ন আছে? রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও তাই রাহুলজী যে 'পতিত' এই কথাটি প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে ছিল তাঁহার রুশ-পত্নী ও পুত্রের চিত্র প্রভৃতি ডাকযোগে প্রাপ্ত এই সব প্রমাণ। অতএব, 'জীবন-সাহিত্যে'র ক্ষুদ্র ফটোটি সকৌতুকে ও সকুতূহলে দেখিলাম।

কিন্তু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঔৎসুক্য সেদিকে নয়। তিনি বলিতে লাগিলেন—"নামটি দেখলেন?—রাহুল-পুত্র ইগোর। এই ইগোর নামটির জন্যই আপনাকে এই ছবি দেখানো। ইগোর ছিলেন রুশ দেশের রুশ বীর। তিনি ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে তাতার আক্রমণ থেকে রুশদের রক্ষা করেন। রুশের বীরত্ব-গাঁথায় তাঁর আসন হচ্ছে তাই জাতীয় বীরের আসন। সাড়ে সাত শত বৎসর আগে রুশ দেশের উপরে, ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে, তাতার-তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছিল; বীর ইগোর তা রোধ করলেন। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে রুশের তখনকার এক স্যাগা। জাতীয় মনে ইগোর হন জাতীয় বীর। রুশিয়া তো এখন সাম্যবাদী; আর সেই হিসাবে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়-মনের অস্তিত্বই স্বীকার করে না; স্বীকার করে শুধু উৎপাদন-সম্পর্কে-নির্ণীত সামাজিক সম্বন্ধ আর তেমনি পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-মানস। কিন্তু যা-ই বলুক যে, ধীরে ধীরে আবার জাতীয় মন ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি রুশ-শাসকদের দৃষ্টি পড়ছে; আবার তাঁরা একটা রুশ-বৈশিষ্ট্যের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তারই প্রমাণ এই 'ইগোর'-স্যাগা পুনরুদ্ধারের কাহিনীতে পাবেন। 'ইগোরে'র, সেই বীরত্বগাথার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এক রুশ মঠে। ছাপার অক্ষরে প্রথমে তা গাঁথা হল ১৮০০তে। তার পরে নেপোলিয়নের সমরকালে মস্কো-দাহতে সেই ছাপা বই ও তার মূল পুঁথি সবই প্রায় যায় পুড়ে। এখন সোভিয়েট সরকার তা খুঁজে-পেতে পুনরুদ্ধার করেছেন; আর গত ১৯৩৪এ—সেই সময়টায় কাছাকাছিই রাহুলজী ছিলেন রুশিয়ায়—তাঁরা এই ইগোরের

"সার্ধ-সপ্ত শতাব্দ উৎসবের" মহাসমারোহে আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষ্যে নূতন করে আবার ইগোর-গাথা মুদ্রিত হয়েছে পুরানো রুশ হরফে চমৎকার চিত্রাবলীসহ। শান্তিনিকেতনে তার এক সংখ্যা পাঠিয়েছেন তাঁরা; আপনাকে দেখাবো। কিন্তু কথা হল, উৎসব হয় শত বৎসরে—এক শত হোক, দু' শত হোক বা সাত শত হোক—এরূপ শত বৎসর পরে। বর্তমান রুশের ইগোর-উৎসাহ কিন্তু সেরূপ দেরী সইতে আর পারল না—সাড়ে সাত শ' বা অমনি একটা ভাঙা-চোরা বৎসরেই উৎসব অনুষ্ঠিত করলে। ওঁদের জাতীয়তাবোধ আজ না হলে তৃপ্তি পাচ্ছে না। তাই, রাহুলাম্ভজের নাম হয়েছে ইগোর—যেমন আয়ার্লাণ্ডের নাম আজ আয়ার, শ্যামের নাম তাই-দেশ, পারস্যের নাম ঈরান, রেজা শাহ হলেন পহ্লবী, আর তাঁর পুত্র হলেন ঈরাণের জাতীয় বীরের নামানুসারে নামালঙ্কৃত—পুহ্‌র। পৃথিবীতে জাতীয় মন আবার নিজ জয়ই ঘোষণা করছে—ফ্যাশিস্তরা নিচ্ছে তার সুযোগ।"

বৃহদাকার ইগোর-গাথা পরে দেখিলাম। চমৎকার দেখিতে। অধ্যাপক মহাশয় মূল রুশ হইতে মাঝে-মাঝে পড়িয়া শুনাইলেন; উহার অর্থ করিয়া গেলেন; চিত্রগুলির নীচেকার পরিচয় বুঝাইয়া দিলেন। কোথাও শিশু ইগোর, কোথাও যুদ্ধোন্মুখ অশ্বারূঢ় বিজয়ী বীর ইগোর, আবার কোথাও ইগোর-পত্নী আকাশ-বায়ু-দেবতাদের দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে আকুল আবেদনে রত—কোথায় তাঁহারা তাঁহার সেই মহাবীর পতিকে অপহরণ করিলেন?—প্রাচীন যুগের বীরত্ব-গাথার এই সব সুপরিচিত রূপ তাহাতে বিদ্যমান। কিন্তু কৌতুককর এই নূতন গ্রন্থের চিত্র-রীতি। চিত্রগুলি বর্তমানকালকার রুশ-শিল্পীর আঁকা; কিন্তু মস্কোর 'কালাপাহাড়ী' মনের কোন চিহ্নই যে তাহাতে নাই। আমার স্বল্প-বিস্ময় মনে হইল এ যেন বাইজেণ্টাইন প্রভাবিত প্রাচীন রুশরীতির অনুযায়ী। সুনীতিবাবুও তাহাই উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"একেবারে শিল্পরীতির পর্যন্ত পুনর্বর্তন। কি বলবেন এর পরে? জাতীয় মনের ও জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি মস্কোর এই সব প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছে না?—কিন্তু ছোট ছোট অন্য জাতিদের বেলা এখন আর রুশিয়া সেই পূর্বেকার সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে কি?"

আমার মনের সম্মুখে আর একটি চিত্র জাগিতেছিল :—বৌদ্ধ গয়ায় অশোক (? সুঙ্গ)-রেলিংএ সমুৎকীর্ণ চিত্রাবলী আমাকে একবার দুইজন 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল'-অভিমানী ভারতীয় 'বামপন্থী' নেতৃবরের সঙ্গে দেখিতে হইয়াছিল। দল হিসাবে তাঁহারা অবশ্য কম্যুনিষ্ট নন, মত হিসাবে তাঁহারা কিন্তু তখন ছিলেন মার্কস্‌বাদী। ভারতশিল্পের সেই নিদর্শনগুলি তাই তাঁহাদের নিকট অর্থহীন ও হাস্যকর। তাহাতেও আমি বিস্মিত হই নাই। বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম—ভারতেতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহাদের সুগভীর অজ্ঞতায়। কিন্তু তাহাতেও বিস্ময়বোধ না করিয়া কৌতুকবোধই করিতে পারিয়াছিলাম খানিকক্ষণ পরে। কারণ, আমার সঙ্গীদের আচরণে এই অজ্ঞতার সাফাই গাহিবার একটা চেষ্টা ছিল সুস্পষ্ট। তাহা এইরূপ :—এই ইতিহাস, এই শিল্প যে তাঁহারা জানেন না তাহা নয়। জানেন; তবে এইসব বিশেষ কিছু নয়, সবই অতীত। দেখিয়া গেলেই হইল। আর দেখিবার মতো, বুঝিবার মতো ইহাতে কি-ই-বা আছে? বাজে জিনিস তো।—অজ্ঞতামাত্রই ঢাকিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা হইতেছিল মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নামে। উক্ত চেষ্টাও স্বাভাবিক,—এবং কৌতুকাবহ। মনে আছে প্রাচীন ভারতীয় বেশ-বিন্যাসে ইঁহাদের হাস্য উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যাম্‌লেট ইন্ প্লাস্‌ফোর্স কিংবা সুজাতা ইন্ কস্‌মেটিকস্ না হইলেই ইঁহাদের আধুনিক রুচিতে ও বাস্তব-বোধে বড়ই বেমানানো হয়।

সুনীতিবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে মনে পড়িল, আমার সেই মার্কসিষ্ট ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদ্বয়ও হয় ইগোরকে ইন্ প্লাস্‌ফোর্স দাবী করিতেন, না হইলে মস্কোর এই শিল্প-নিদর্শনকে বলিতেন—'জাতীয়বাদী রিয়েক্‌শ্যানারি'। শিল্পের ও স্মৃতির এইরূপ পুনরুজ্জীবনে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মহাশয়ও সাম্যবাদের বিরোধী ধারার বিকাশই দেখিতেছেন। ইগোর রাহুলোবিচ্ নামটি তাঁহার নিকটে রুশ জাতীয়-ধারার জয়চিহ্নরূপেই উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

২

মস্কোর তথনকার (১৯৪০) আর একটি সংবাদ—

"আজুরবাইজানের মহাকবি নিজামী গান্‌জেবীর (১১৪১—১২০৩

খৃঃ অঃ) 'অষ্টশতাব্দ জন্মজয়ন্তী' আগামী বৎসরে (১৯৪০-১) সমস্ত সোভিয়েট রুশিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে আজুরবাইজানের সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রধান নগর বাকু হইতে নিজামী ও তাঁহার কাব্যাবলী বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।"

নিজামী দ্বাদশ শতাব্দীতে গান্‌জায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন আজুর-বাইজান, আরব ও পারস্য আক্রমণকারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে। গান্‌জার বর্তমান নূতন নাম কিরোবাবাদ। নিজামীর নামও আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। মস্কৌর সংবাদটি বলিতেছে, "নিজামীর কাব্যে প্রাচ্যের সমৃদ্ধিশীল সংস্কৃতি রূপগ্রহণ করিয়াছে।" পাঁচখণ্ডে তাঁহার কাব্যমালা বিভক্ত—রহস্য-ভাণ্ডার, খোসরো-শিরিণ, লাইলা-মজনুন, সপ্ত-সুন্দরী এবং সেকান্দর-নামা। ককেশীয় ও সমীপপ্রাচ্যের পরবর্তী কবিকুল এই পঞ্চকাব্যের আখ্যায়িকা, রীতি, শব্দ ও বাগ্‌-ভঙ্গী লইয়া আপনাদের কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'মস্কৌ নিউজ' বলিতেছেন—"নিজামী মানব-প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার কাব্যে মানুষ ও মানুষের জীবনের সকল প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রতি এক সুগভীর প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। অগণ্য কাহিনীতে তাঁহার স্মৃতি সঞ্জীবিত হইয়া আছে। নিজামীর কাব্য কালের বিচারে জয়লাভ করিয়াছে—বিশ্ব সংস্কৃতিতে আটশত বৎসর পরেও তাহার মূল্য রহিয়াছে অক্ষুণ্ণ।"

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি মস্কৌর এই অনুরাগকে এই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র 'রুশ জাতীয়তাবাদ' বলিবার উপায় নাই। কারণ, নিজামী রুশ কবি নহেন; তিনি আজুরবাইজানের কবি। 'রুশ জাতীয়তাবাদ' বা "জারের সাম্রাজ্যবাদ" এই অবজ্ঞাত দেশের কবির প্রতি সমগ্র ইউ. এস. এস. আর. এর এইরূপ সম্মান প্রদর্শনের আয়োজন সমর্থনও করিত না, সহ্যও করিত না। তাই বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েট চিন্তার সশ্রদ্ধ অনুরাগই কি ইহাতে সূচিত হইতেছে না? ১

---

১ এই সম্বন্ধে গত দুই তিন বৎসরে এত প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে যে তাহা লইয়াই এক বিপুল গ্রন্থ লেখা চলে। এযুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা সোভিয়েটতন্ত্রে বিভিন্ন জাতির, বিশেষত এশিয়াখণ্ডের অবজ্ঞাত জাতিদের, এই সাংস্কৃতিক বিকাশ। গত দুই বৎসরের 'মস্কৌ-নিউজ', এখানকার 'ইণ্ডো-সোভিয়েট জর্ণাল' ও যে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ এ বিষয়ে পাঠ করাই যথেষ্ট। এই যুদ্ধকালেও সোভিয়েট দেশে 'মহাভারতের' ও 'তুলসীদাসের রামায়ণ' প্রভৃতির অনুবাদ চলিয়াছে;—ইহাও স্মরণীয়।

৩

সোভিয়েট চিন্তার গতি নির্ধারণ করিতে হইলে সোভিয়েট সৃষ্টি-প্রয়াসের আরও দুই একটি বিষয় অনুধাবন করা উচিত। মস্কোর ১৯৩৯ সনের সাহিত্য সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে দেখি—পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যে যেই সব জাতি ছিল অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত আজ তাহাদের জীবন-কথাই রুশেরা সগর্বে বলিতে শুরু করিয়াছেন। য়ুকাগি ও চুক্‌চি জাতি প্রায় মেরুমণ্ডলের অধিবাসী, ল্যাপল্যাণ্ডের যাযাবর জাতি। তাহাদেরই কাহিনী রচনা করিয়া ক্রাৎ ও মেন্‌শিকফ্‌ নামীয় দুইজন ঔপন্যাসিক রুশদেশের সম্মুখে ল্যাপল্যাণ্ডের জীবনধারা তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের লেখার ভঙ্গীতে কৃপার দৃষ্টি নাই, তাহাতে আছে সহযাত্রীর ও সহকর্মীর প্রাণময় স্পর্শ। রুশ লেখক বলিতেছেন, "গত বৎসরের রুশ সাহিত্যে আর একটি লক্ষণও সুস্পষ্ট। তাহা এই যে, ইউ. এস্‌. এস্‌. আর. এর (সোভিয়েট-সংঘের) নানা জাতির (১৯৩৯ সনের আগে ১১টি দেশের এবং ছোট বড় ১৮৫টি জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল এই সংঘ) তরুণ ও বর্ষীয়ান্‌ লেখকেরা আজ নিজ নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা তো পোষণ করেনই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির বিষয়েও আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন—উহাদের জীবনধারাকে জানিবার ও জীবনপ্রণালীকে রূপ দিবার জন্যও তাঁহাদের অশেষ আগ্রহ। সোভিয়েট লেখকেরা সোভিয়েট সংঘের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক অতীতকে মোটেই অবহেলা করিতে চান না। এই এক বৎসরেরই মধ্যে গুর্জী (জর্জিয়ান) জাতীয় বীর 'সা কাদ্‌জে'র স্মৃতিতে আন্না অন্তোনোবোস্‌কা এক পাঁচশত পৃষ্ঠার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; মুখ্‌তার আউজোব্‌ রুশীয়দের বিরুদ্ধে নিজ কাজাক জাতির বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন নাটক! মধ্য এশিয়ার জাতীয় বীর হোজা নাসিরুদ্দীনের বীরত্ব-গাথাকে অবলম্বন করিয়া লিউনিদ্‌ সোলোবিয়ব রচনা করিয়াছেন তাঁহার কল্পনা-কুশল গ্রন্থ।"

মোটের উপর কথাটি এইবার পরিষ্কার—সোভিয়েট ভূমিতে রুশ জাতীয় বীর আজুরবাইজানের জাতীয় লেখক এবং গুর্জী (জর্জিয়ান) বা অন্যান্য জাতির লেখকদের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধা নাই। এই নূতন 'জাতীয়তাবোধ' যে সোভিয়েট 'জাতি-বিধানের' অনুযায়ী এবং অসহিষ্ণু "রুশ জাতীয়তাবাদ" বা জার-যুগের সাম্রাজ্যবাদ নয়, সংস্কৃতিগত সাম্রাজ্যবাদও

নয়, তাই তাহাও স্পষ্ট। আর, সোভিয়েট সংঘে নিজের দেশের প্রতি অনুরাগ যে কত আদরণীয় তাহার প্রমাণ পাই সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শোলোকব-এর কথায়। And Quiet Flows the Don ও Virgin Soil Upturned প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক এই কসাক সাহিত্যিক আমাদেরও অনেকের সুপরিচিত। রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ "সোভিয়েট ভূমি"তে শোলোকব-এর যে একটি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই—শোলোকব সোভিয়েট পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনকালে বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন—"আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করছি। কারণ, আমি ডনের এক নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছি। ডনের তীরে আমি জন্মেছি, ডন আমায় লালন-পালন করেছে, এখানেই আমি শিক্ষালাভ করেছি। এখানেই যুবক হয়েছি, লেখক হয়েছি, হয়েছি আমার নিজ মহান্ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। আমার মহান্ ও অনুপম মাতৃভূমির আমি ভক্ত—সগৌরবে আমি বলতে চাই, আমার জন্মদাত্রী ডন-ভূমির আমি ভক্ত।" ভারতভূমির সাম্যবাদীরা এই বাক্যে অবশ্য চমকিত হইবেন না। কিন্তু বৈষম্যবাদীদেরও উল্লাসের কারণ নাই। কারণ এই দেশপ্রেমই সার্থক, গোটা দেশই আজ দেশের সকল মানুষের—বিশেষ কয়জন মুষ্টিমেয় লোকের নয়। তাই, বিকাশোন্মুখ সাম্যবাদী-সংস্কৃতি ও সোভিয়েট-সংস্কৃতি বুঝিবার পক্ষে এই সব তথ্য দিগদর্শন-স্বরূপ।

৪

১৯৪৮এর জুলাই মাসেও কিন্তু কথাটা চুকিয়া যায় নাই। কংগ্রেসের কয়েদখানা হইতে সদ্য ফিরিতেই অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে প্রশ্ন শুনিলাম—কমিউনিজম উইদআউট রুশিয়া হয় না?—রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে না?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ভারতের বহু পণ্ডিত ও বহু নেতার সমস্ত গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর দল পরাজিত হইয়াছে; এবং মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েট জাতিসংঘ সসম্মানে সমুত্তীর্ণ হইয়াছে; এমন কি, এই যুদ্ধান্তের পর্বে সেই সোভিয়েট সংঘ পুনঃসংগঠনের কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষায়ও এখন উত্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ,

কি যুদ্ধের পরীক্ষায়, কি শান্তির পরীক্ষায়, কোনো পরীক্ষাতেই সোভিয়েট ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে নাই। সেই সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন সোভিয়েট দেশ হইতে সম্প্রতি (১৯৪৭) আবার ফিরিয়াছেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হইতেও তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছেন, বর্তমান ভারতের হিন্দী প্রতিষ্ঠাকামী রাজনীতিকদের দ্বারা আবার মহাপণ্ডিতরূপে তিনি সংবর্ধিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে মুখে এই কাহিনীও নানাভাবে প্রচলিত—এবার সোভিয়েটে বাসকালে রাহুলজীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক আদর্শের নানা স্বপ্নই ভাঙিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের কানেও তাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাহুলজীর মুখে অবশ্য সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে উল্টা কথাই শোনা গিয়াছে, বারে বারে তিনি সোভিয়েট ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও অগ্রগতির কথাই সর্বত্র বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই কাহিনী ষোল আনা সত্য হইলেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কারণ, যাহা 'স্বপ্ন' তাহা ভাঙাই প্রয়োজন। আর, সোভিয়েট দেশ কেন, কোনো দেশই 'স্বপ্ন দিয়া গড়া' চলে না। সোভিয়েট দেশটাও মাটির এবং মানুষের ; তবে নতুন মানুষের। 'স্বপ্ন দিয়া গড়া' যে দেশ তাহার দশ মাসের "স্বাধীনতাতেই" অস্থির হইয়া অধ্যাপক মহাশয় তাই আর একটা স্বপ্নের খোঁজ করিলেন,—রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে না ?

কথাটার উত্তর এই : কোন জাতিকে বাদ দিয়াই সাম্যবাদ গড়া চলে না ;—রুশিয়ার মত বিপুল দেশ ও বিশাল জনসমাজকে বাদ দেওয়ার তাই কথাই উঠে না। ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদ ভারতবর্ষ বা চীনকে বাদ দিয়াও গড়া চলে না। সম্ভবত আমেরিকাকে বাদ দিয়াও গড়া সম্ভব নয়। কারণ সাম্যবাদ তো নৈয়ায়িকের তর্কের বিষয় নয় ; উহা যে একটা বাস্তব সমাজ-পদ্ধতি। এই জন্যই আজিকার বাস্তব পৃথিবীতে প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে বাদ দিয়া সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অবশ্য তেমন বড় দুই একটা দেশ পাইলে সেখানে সম্ভব হয় শুধু সাম্যবাদের গোড়াপত্তনের—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। রুশিয়া নামক একটি দেশে শুধু নয়, সোভিয়েট সংঘের ষোলটি জাতির দেশে এইরূপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হইতেছে। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই এখন রুশিয়া ও অন্য সেই পনেরটি দেশের অভিজ্ঞতা,—তাহাদের ভুলত্রুটি, সার্থকতা, শিক্ষা-দীক্ষা এই সবই হইল পৃথিবীতে যে-কোনো দেশে সাম্যবাদ

গড়িবার পক্ষে এক অপরিহার্য উদাহরণ, তাহার আদর্শ ও অবলম্বন। পৃথিবীতে সাম্যবাদ গড়িবার পক্ষে রুশিয়াকে বাদ দিলে তাই আজ চলে না; চলে না যেমন সোভিয়েট সংঘের পক্ষেও 'পশ্চিম ইউরোপকে' বাদ দিয়া রুশিয়াতে কমিউনিজম্ পুরাপুরি গড়িয়া ফেলা। এই মুহূর্তে বাস্তবক্ষেত্রে চীনকে বাদ দিয়া কিংবা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়াই কি স্থায়ীভাবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায় ইউরোপের বা এশিয়ার কোথাও? কিংবা ধনিকতন্ত্রই বেশীক্ষণ টিঁকিয়া থাকিতে পারে চীন ও ভারতবর্ষ যদি এখন ধনিকতন্ত্রীদের করচ্যুত হইয়া যায়?

অধ্যাপক সুনীতিকুমারের উক্ত প্রশ্নে এই বাস্তব সত্যের ও সাম্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে রহিয়াছে অজ্ঞতা। তাই তাঁহার সংশয় এখন এই নয় যে 'রুশিয়া' স্বাজাত্য বর্জন করিয়াছে, এখন তাঁহার ধারণা রুশিয়া উৎকট রকমের 'স্বদেশীই' হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি সাম্যবাদের নামে মধ্য এশিয়ার ছোট ছোট জাতিদেরও গিলিয়া খাইয়াছে। তাঁহার মতে ইহার প্রমাণ—সেই সব দেশে রুশভাষী অনেক অধিবাসী রহিয়াছে এবং সেই সব দেশের মানুষের নাম পর্যন্ত রুশ-ধরনের হইয়া উঠিতেছে—যেমন,' রহিম' হইয়াছেন 'রহিমভ', শ্রীমতী 'মোক্‌সদা হাজী' হইয়াছেন 'মোক্‌সদা হাজীয়োভা'। বলা বাহুল্য, মার্কিন-ইংরেজ প্রমুখ ধনিকতন্ত্রীদেরও প্রধান প্রচার এই যে, সোভিয়েট রাজ্য-বিস্তার করিতেছে। ১৯৪০-এও এই সন্দেহই সুনীতি বাবুর মনে ছিল; তখনকার দিনে উহার উত্তর লাভ তখনকার একটি সংখ্যা 'মস্কো নিউজ' হইতেও সংগ্রহ করিতে পারা যাইত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ১৯৪৮-এও তাঁহার সন্দেহের তবু নিরসন হয় নাই। ইতিমধ্যে যুদ্ধকালে তিনি ফ্রান্‌স্ ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি দেখিয়া ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে,আজিকার পৃথিবীতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয় প্রধানত প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষ করিয়া সাম্যবাদী শ্রমিক সাধারণ; আর নিজের দেশের স্বাধীনতাকে শ্রেণীর স্বার্থে অকাতরে বিকাইয়া দেয় ফ্রান্‌সের 'দুই শত পরিবার' ও তাহাদের শ্রেণীর "জাতীয়তাবাদী" ভদ্রলোকেরা। অন্যদিকে সোভিয়েট সংঘের ঐ সব দেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদেরও তিনি দেখিয়া থাকিবেন। ইচ্ছা করিলে সোভিয়েট ভূমি সম্পর্কে আরও অধিকতর তথ্যও তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন—যুদ্ধান্তে এই সুযোগও আজ আছে, হয়ত "স্বাধীন" ভারতে বেশিদিন এই সুযোগ থাকিবে না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রচারক তৃতীয় শ্রেণীর সাংবাদিক লুই ফিশার প্রভৃতির মারফৎ বা 'রীডার্স ডিজেস্ট' প্রভৃতির পাতা হইতে মালিক-নেতার মন-ভুলানো ছড়া, গল্প সংগ্রহ করিয়া আজ আর তবু এ দেশেরও কোনো অনুসন্ধিৎসু মন তৃপ্ত হইতে পারে না; উহাতে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারে। অবশ্য সেই আত্মপ্রবঞ্চনার উপযোগী কাগজ-পত্র ও সুযোগ আজ ভারতবর্ষে ভারতের বিকৃত ধনিকতন্ত্রের উদ্ভবে আরও অনেক সহস্র গুণ বেশি। না হইলে এদেশ হইতেও আজ সোভিয়েট সম্বন্ধে সংবাদ এখনো সংগ্রহ করা যায়। হাতের কাছেই এমনি একখানা পত্র রহিয়াছে (নয়াদিল্লী হইতে 'টাস নিউজ এজেন্সী'র প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড,' ১০ই জুলাই, ১৯৪৮, তারিখের); তাহাতে দেখি—এক উজবেকিস্তান সম্বন্ধেই ৬টি সচিত্র প্রবন্ধ। উজবেগদের আমরা বরাবরই জানিতাম মূর্খ ও বর্বর বলিয়া। কিন্তু সে উজবেগীরা আজ কোথায়? সোভিয়েট-ব্যবস্থায় তাহাদের (তুর্কী উজবেগী নাম নয়, মুসলমান ধর্মসূত্রে গৃহীত আরবী-ফার্সি নাম) নামগুলিই কি বদ্‌লাইয়াছে, না বিকশিত হইয়াছে চাপা-পড়া উজবেক জাতি, তাহাদের মনুষ্যত্ব?

অধ্যাপক মহাশয়ের উল্লেখিত প্রমাণগুলি অস্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন—সোভিয়েট সংঘে রুশদের সংখ্যা ১০ কোটির উপরে, উজবেগীদের সংখ্যা ৬০ লক্ষও নয়; অতএব রুশরা জাতে, সংখ্যায় ও শিক্ষায় প্রধান। তাহাদের প্রভাবও যে সমধিক তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রভাব মাত্রই কি বৈশিষ্ট্য-বিনাশী? সোভিয়েট রুশিয়া বা উক্রেনীদের প্রভাবে কি উজবেগী বা তাজিকদের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, বা আধ্যাত্মিক বিনাশ ঘটিতেছে, না বিকাশ ঘটিতেছে, তাহাই প্রথম প্রশ্ন! তাঁহার, 'প্রমাণগুলি' কি সত্যই প্রমাণ, না ছুটা-ছাঁটা কয়েকটি দৃষ্টান্ত? আর কতটুকুই বা সেই প্রমাণের গুরুত্ব? ঐসব ছুটা-ছাঁটা দৃষ্টান্ত অস্বীকার না করিয়াও এইভাবে তাহা যাঁচাই করিয়া দেখিতে হয়। কারণ পুঁথিপত্র না ঘাঁটিয়াও অন্যরূপ তথ্য এবং আরও অনেক বেশি, আরও অনেক ভারী দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। তাহা দিয়াই দেশের সাধারণ অবস্থার বিচার হইবে।

উজবেগ কবি জাম্বুলের নাম সমস্ত সোভিয়েট ভূমিতে উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য দেশেও তাঁহার নাম শুনিয়াছে বহুবার

১৯৪৫এ শতবৎসরের উপকণ্ঠে পৌছিয়া জাম্বুল দেহত্যাগ করিয়াছেন। উজবেগিস্তানের স্বাধীনতায় ও অগ্রগতিতে উদ্বুদ্ধ এই বৃদ্ধ চারণ কবি লেনিন ও ষ্টালিনের কীর্তিগাথা গাহিতে. কোনোদিন শ্রান্তি বোধ করেন নাই। মৃত্যুর পূর্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুশোকে আহত কবি বুক ভরিয়া গাহিয়াছেন সোভিয়েটের নব-রচিত বিজয় গান। হয়ত বলা হইবে—এই কারণেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ (রুশগণ) তাঁহার নাম রটাইয়া বেড়ান। কিন্তু উজবেগ কবি আলী শের নবোই সোভিয়েট যুগের মানুষ নন। তিনি জন্মিয়াছিলেন মধ্যযুগে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। একাধারে তিনি উজবেগীদের কবি, দার্শনিক, মানব-বিস্তার উদ্গাতা। সেকালের নিয়মে তিনি আরবী বা ফার্সি ভাষায় কাব্য-রচনা করেন নাই ; কবিতা লিখিয়াছেন উজবেগী ভাষায়। তুলনা করিয়া ফার্সি অপেক্ষা নিজের উজেবগী ভাষার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক শ্লোকে তাঁহার 'হাম্জা' (পঞ্চাধ্যায়ের কাব্য) লেখা ; উহা শিরীণ-ফরহাদ, লায়লামজনু প্রভৃতির গাথা। নবোই'র কবিত্বের, তাঁহার দার্শনিকতার, তাঁহার মানব-মমতার অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে হাম্জায়। আর প্রমাণ রহিয়াছে শিরীণ-ফরহাদ, লয়লা-মজনু প্রভৃতি প্রেম-কাহিনী ব্যাখ্যায় জাতিতে জাতিতে মৈত্রীবন্ধনের, সাধারণ মানুষের জন্য মমতার, অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভের ও ব্যক্তিহৃদয়ের প্রেমপ্রীতির প্রতি দরদের বহু ইঙ্গিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর উজবেগ কবির নিকট এই দৃষ্টিভঙ্গী একটু অপ্রত্যাশিত। নবোই'র পাঁচশত বৎসরের জন্মোৎসব এবার (১৯৪৮) মে মাসে পালিত হইতেছে সমস্ত সোভিয়েট দেশে—মস্কৌ, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বড় শহরে ১৫ই মে এইজন্য নানা অনুষ্ঠান হয়। উজবেগ রাজধানী তাশ-খন্দে এই জয়ন্তী উৎসবে বহুদিনব্যাপী উৎসব চলে। সোভিয়েটের নানা জাতির কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এক সম্মেলনে সমবেত হন। রুশ কবি কন্‌ষ্টানটিন সাইমোনেভ্ তাহাতে পৌরোহিত্য করেন। এখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় অপেরার নাম এখন হইতে হইবে 'নবোই অপেরা।' নবোই'র নামে সেই গৃহে একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহারই মর্মর পাদপীঠে স্থাপিত হইতেছে কবির নব-নির্মিত বোঞ্জের প্রতিমূর্তি। উজবেগিস্তানের বহু সমবেত কৃষি-প্রতিষ্ঠান, থিয়েটর, ইস্কুল ও লাইব্রেরির নামকরণ হইতেছে নবোই'র

নামে। সমরখন্দে কবি যৌবন কাটাইয়াছিলেন; তাই সমরখন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উজবেগ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারেরও নাম রাখা হইল তাঁহার নামে। উজবেগ বিজ্ঞান-পরিষদের এবার 'সার্ধ-শত উৎসব' হইতেছে; উহারও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে কবির স্মৃতিতে। পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার এই উজবেগী ভাষার কবিকে লইয়া সোভিয়েট-জগতের এই যে উৎসব, সোভিয়েটময় কবিপূজা, ইহা কি উজবেগী সংস্কৃতি বিনাশের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ, না উহার বিকাশের প্রয়াসের দৃষ্টান্ত?

এইরূপ ছুটা-ছাঁটা দৃষ্টান্ত অবশ্য উদ্ধৃত করিয়া শেষ করা যায় না। সেই কারণেই আরও বাস্তব তথ্য তুলিয়াও লাভ নাই। বিশেষত তথ্য প্রতিনিয়ত যোগ হয়, পরিবর্তিত হয়। সোভিয়েট পদ্ধতিতে সে পরিবর্তনের গতি আবার এত ক্ষিপ্র যে তাহার সহিত তাল রাখিয়া লেখকের চলা সহজ নয়। কিন্তু সেই সব তথ্যের মধ্য হইতে উজবেগ জাতির (ও সোভিয়েটের অন্যান্য জাতির) গতিপথের যে আভাস অভ্রান্ত হইয়া উঠে তাহা স্মরণীয়—আর তাহাই আসলে উজবেগ সংস্কৃতির অবস্থা বিচারের প্রধান প্রমাণ। যেমন, প্রথম কথা হইল, উজবেগিস্তান শুধু জারের শাসন-মুক্ত হয় নাই, মোল্লা ও ওমরাহদেরও সমস্ত রকম শোষণ-মুক্ত হইয়াছে। আজ উজবেগ রাষ্ট্র (এ. এস. এস. আর) সোভিয়েট সংঘে রুশ রাষ্ট্রেরই (আর. এস. এফ. এস. আর) সমতুল্য ও সমকক্ষ; উজবেগীদের জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত; আর নিজ রাষ্ট্রে আজ উজবেগী জনসাধারণই ভাগ্য-নিয়ন্তা।

এই 'রাষ্ট্রীয়' কথাই হয়ত কেহ কেহ মানিবেন না। মানিলেও বলিবেন, এই অধিকারের আড়ালে উজবেগ-জাতি অপরাপর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারাইতেছে। আর্থিক তথ্যের সাক্ষ্য তাঁহাদিগকে দেখানো যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক সেচপদ্ধতি প্রসারে উজবেকিস্তানের ফেরগানা অঞ্চল মহাযুদ্ধের পূর্বেই তুলার এক প্রধান উৎপাদন-ভূমি নামে খ্যাতি অর্জন করিতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র-শিল্পের এক প্রধান শিল্প-ভূমিতে পরিণত হইতেছিল। আজ তাহার নতুন পঞ্চ বার্ষিক সংকল্পের (১৯৪৬-৫০ এর) 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা পরিষদের' সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিলেও বুঝিতে পারি 'ভারী শিল্পের' উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে ১৯৪০-এর উপরে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ, বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন ১৯৪৬-এর তুলনায় শতকরা ১১·৩ ভাগ,

কয়লার ১৯৪৭-এর তুলনায় ৩ গুণ; এবং সাধারণের ব্যবহার্য খাদ্য, বস্ত্র, জুতা (১৯৪০-এর অপেক্ষা উহা শতকরা ৭৯'৪ হাজার বেশি) প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদনে এই দেশ কত দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। হয়ত আমরা যখন দামোদর উপত্যকা ও মোর-নদীর পরিকল্পনা লইয়া জটলা করিতেছি ততক্ষণে উজবেকিস্তানের পূর্বকার সেই সেচ-ব্যবস্থার (প্রধানত তাহা আমু-দরিয়ার নিম্ন স্রোত নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল) আরও প্রসার সুসম্পূর্ণ হইবে। সির-দরিয়ায় ফর্‌খাবাদ জল-বিদ্যুৎ-কারখানার বিদ্যুৎ-সঞ্চারও শুরু হইয়া গিয়াছে; সে দেশের অন্যত্রও আরও কয়েকটি জল-বিদ্যুদাগার সম্পূর্ণ হইতেছে।

অবস্থাটা হয়ত একটু তুলনা করিয়া বুঝিলে আরও পরিষ্কার হয়—মিশরের তুলা চিরপ্রসিদ্ধ। আধুনিক সেচ-ব্যবস্থায় সুদানের যেইটুকু সুজলতা ও সুফলতা আসিয়াছে তাহারই ফলে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-ফাঁস বিশ বৎসর যাবৎ মিশরের গলায় আরও আঁটিয়া বসিয়াছে। "স্বাধীন" এই মিশর আজও তাই শ্বাস লইতে পারিতেছে না;—কোথায় বা তাহার শিল্প, কোথায় বা তাহার অপরাপর পণ্য-উৎপাদন-ব্যবস্থা? উজবেকিস্তানের সঙ্গে মিশরের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে—ইউরোপের সাম্রাজ্য-প্রভাবিত মিশরের কি অবস্থা, আর সোভিয়েটের (অথবা সমালোচকেদের ভাষায় "রুশিয়ার") সমধর্মী ভ্রাতৃরাষ্ট্র উজবেকিস্তানেরই বা অবস্থা কি। হয়ত আরও সহজে বুঝিবার পথ আছে:—সিন্ধু প্রদেশ ও পশ্চিম পঞ্জাবও এখন তুলার দেশ। কিন্তু কোথায় তাহার কাপড়ের কল, বস্ত্র শিল্প? তুলা-জোগানই এই সব দেশের একমাত্র কাজ। অথবা আরও একটু তুলনাও করা চলে। মধ্যভারতেও তুলা যথেষ্ট; কোয়েম্বাটুরেও তুলা জন্মে ভালো। আর এই দুইখানেই বস্ত্রশিল্প আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়—বস্ত্র জন্মিলেই বা বস্ত্র পরিতে পায় কি এই দুই প্রদেশের মানুষ? সেই মধ্যভারতের বা কোয়েম্বাটুরের নরনারী? তাই শুনিলে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই যে, যে উজবেকিস্তান সমস্ত রুশিয়ার শতকরা ৭৯ ভাগ বস্ত্র উৎপাদন করে, সেই উজবেকিস্তান হইতেই এখন বস্ত্র আনিবার কথা চলিয়াছে পাকিস্তানের; আর সে বস্ত্রের দাম সমস্ত খরচপত্র দিয়াও অনেক সস্তা পড়িবে—অবশ্য যদি পাকিস্তানের চোরা-কারবারী ও মালিকতন্ত্র সত্যই তাহা সহ্য করে।

কিন্তু উজবেক আর্থিক জীবনের এই হিসাবপত্র দিয়া হয়ত অধ্যাপক-বর্গের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মতে আসল কথা হইল—উজবেক সংস্কৃতি কতটা ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে এই নূতন সোভিয়েট ব্যবস্থায়। উহারও একটা প্রমাণ সুবিদিত—যেখানে ১৯২৬এ ছিল শতকরা ১০·৬ জন মাত্র অক্ষরজ্ঞানা, সেখানে ১৯৩৯ এ তাঁহারা হয় ৬৭·৯। এই কথা বলিলেও চলিবে না—রুশ বা উক্রেইনী বিশেষজ্ঞরাই উজবেগ রাষ্ট্র চালায়, সে দেশের শিল্পজীবন, কৃষিজীবন ও শিক্ষাজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। উজবেগী অধ্যাপক, উজবেগী বৈজ্ঞানিক, উজবেগী গবেষক হইতে উজবেগী রাষ্ট্রবিদ্ পর্যন্ত সকলেই আজ মস্কৌতেও যায় সসম্মানে; আবার রুশ বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞও আসেন তাশখন্দে। শুধু রুশ নয়, তাশখন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে (লেনিনের নির্দেশে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ এ) প্রতি বৎসর উজবেক, তাজিক, কিরঘিজ, তুর্কমেন, কাজাক প্রভৃতি প্রায় ২০টি জাতির ছাত্রছাত্রী পড়িতে আসে। উহার অধ্যাপক গবেষকদের মধ্যেও নানা জাতির লোক আছে; দুই একটি নাম শুনিলেই বুঝা যাইবে—রসায়নের উপাচার্য (ডীন্) হইলেন সাদিকোভ্; টি. কারিনিয়াজোভ্ গণিতের; আব্দুল্লায়েভ্ ভূ-তত্ত্বের; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (রেক্টর) হইলেন ওমরোভ্ (প্রত্যেকটি মুস্লিম নামের পিছনে আছে রুশ বিভক্তি 'ওভ্')। চোখ মেলিলে হয়ত সেই গৃহে মধ্যএশিয়ার চন্দ্রমুখীদের সঙ্গে দেখিব সেখানকার গোলমুখ, অনুচ্চনাসা, তির্যক নেত্র, সেই চ্যাপ্টা টুপি-পরা উজবেগ তুর্কদের, এবং দু-একটি ইউরোপীয় নাক মুখ রঙও দেখিব।

হয়ত এই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারুবিদ্যার (টেক্‌নোলাজির) বিবিধ উজবেগ ব্যবস্থাও উজবেগ সংস্কৃতির সমুত্থানের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে না। কিন্তু সমরখন্দের উজবেগ মিউজিয়ামে যে প্রাচীন ভাস্কর্যের, দারু শিল্পের, পুরাতত্ত্বের ও ইতিহাসের এবং জীবন্ত শিল্পকলার অজস্র নিদর্শন এখন সুরক্ষিত হইতেছে, বিশেষত ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার যে নূতন সূচনা সেখানে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাও কি উজবেগ সংস্কৃতির পরিপোষক নয়? দেখিতেছি যে উজবেকিস্তানে 'থিয়েটর' ছিল না, যে উজবেগী ভাষায় ১৯১৮ এর সময়ে উজবেগ নাট্যগুরু হাম্‌জা হাকিম-জাদা নিয়াজী নামে মাত্র নাটক লিখিতেছিলেন, সেখানে আজ ৪০ টির উপর নাট্যশালা। অপেরা, নৃত্যমঞ্চেরও অভাব নাই; নূতন কালের উজবেগী বেতারকেন্দ্র ও উজবেগী ফিল্‌ম বা ছায়াচিত্রতো সর্বত্রই গড়িয়া উঠিতেছে; উজবেগীরা

ফিল্‌মের গবেষণাগার ও শিক্ষাপরিষদ্ স্থাপন করিয়াছেন। উজবেগ নট-শিল্পীরাও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত—অবরব্ হিদোয়াতোভ্ ও সারা ইশান্‌তুরায়াভা সেক্‌স্‌পীয়রের নাট্য-অভিনয়ে (উজবেগী অনুবাদ হইতে) পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আবিদ জলিলোভ্, জামিরা হিদোয়াতোভা প্রভৃতিদের নাম সোভিয়েট দেশের অন্য রাষ্ট্রেও সুপরিচিত। আর নিয়াজীর সময় হইতে অনুবাদ ছাড়াইয়া কামাল ইয়াশেম, তুইগুন্, ইজ্জৎ সুলতানোভ, সবির আবদুল্লা প্রভৃতির হাতে উজবেগ নাট্যসাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের কোনো নাটকের বস্তু উজবেগী ধারার কথা, কোনটির কথাবস্তু বিপ্লবী যুগের কথা। কোনটির বা বিষয় তৎপরবর্তী সোভিয়েট যুগের উজবেগী কৃষকের জীবন, তাহার আশা ও প্রয়াস। আবার আধুনিক নাটকে অনিবার্যভাবে আসিয়াছে উজবেগীদের এই মহাযুদ্ধকালীন বীরত্ব ও বিজয়ের আখ্যায়িকা। অর্থাৎ প্রাচীন হোক্ আধুনিক হোক্, বিষয়বস্তু মূলত উজবেগী জীবনের; কিন্তু রচনাকলায় তাঁহারা সযত্নে গ্রহণ করিয়াছেন সেক্‌স্‌পীয়র, শিল্লর হইতে রুশ নাটকের রীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত, রঙ্গশালাও জন্ম লইয়াছে আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে, অনুসরণে। বাঙলা নাটকেই কি আমরা যাত্রা কিংবা 'শকুন্তলা' 'মৃচ্ছকটিকের' ধারায় চলিয়াছি ? না চলিয়াছি ঐ জগদ্বরেণ্য মহানাট্যকারদের প্রদর্শিত পথে ও আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে ?

কিন্তু সংশয় ইহাতেও নিরাকৃত হইবার কারণ নাই। সমাজতন্ত্রী সভ্যতার অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন আজ বিশেষ করিয়া রুশ জাতি,—যেমন ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার পৌরোহিত্য লাভ করিয়াছিলেন এক দিন ইংরেজ জাতি। কিন্তু এই দুই ব্যবস্থার মূলগত নীতি ও স্বভাবে আকাশ পাতাল পার্থক্য; তাহা না জানিলে স্বভাবতই মনে হইবে প্রভাবের মধ্য দিয়া প্রাধান্যই ক্ষুদ্রতর জাতিদের উপর জাহির করা হয়। কারণ এত দিন পর্যন্ত ইহাই ছিল ধনিক সভ্যতার নিয়ম। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক এই চিরকালের 'প্রাধান্যের'ই অস্বীকৃতি; সভ্যতার মৈত্রী-বন্ধনেরই উহা আয়োজন, উহার মূল কথা আধিপত্য বিস্তার নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের সূত্রে সহযোগিতা। স্বভাবতই এই রাষ্ট্রীয় সত্য না বুঝিলে বিশ্বাস করা দুরূহ হয় যে, এক বড় জাতি ছোট জাতির উপর আধিপত্য করে না।

অবশ্য মানুষের সভ্যতায় ও মানুষের মনুষ্যত্বে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যদি সত্যই কেহ সোভিয়েট ব্যবস্থার স্বরূপ জানিতে আগ্রহান্বিত হন ;

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ধ্যান-ধারণার বশীভূত না থাকিতে চান। তাহা হইলে তিনি দুই দিক হইতে সোভিয়েট ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে অগ্রসর হইবেন। যথা, হয় তিনি মানব-বিষ্ঠার দৃষ্টিতে সোভিয়েট জীবনের মূল্য যাচাই করিয়া দেখিবেন, তখন ডীন অব্ ক্যাণ্টারব্যারির মত তাঁহার মনে হইবে—এই সভ্যতাতেই মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার সত্যকারের পাদপীঠ রচিত হইয়াছে। নয় তিনি এই ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে চাহিবেন সমাজবিজ্ঞানের নিস্পৃহ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া;—তখন সিড্‌নি ও বিয়েট্রিস্ ওয়েবের মত তাঁহারও সংশয় কাটিয়া যাইবে, মনে হইবে 'নতুন সভ্যতা' আবির্ভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তখন এই বৃহত্তর সত্যও বুঝা যাইবে যে, এই সংস্কৃতি-সৃষ্টিতে সোভিয়েট-কৃতি এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে যাহাতে উহার ক্রটি-বিচ্যুতিও ধরা পড়ে, আদর্শ-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া আসে। এইখানেই সোভিয়েট সংস্কৃতির আসল এক শক্তি—উহা এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও চালিত; আপনার বিচ্যুতিকেও যাচাই করিতে সমর্থ।

অবশ্য এই দুই পথেরই যাত্রীর নিকট ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে এই সত্য যে, সংস্কৃতি জিনিসটা শুধু 'সংস্কার' নয়—অপরিবর্তনীয় রীতিনীতি ধ্যানধারণা নয়, এবং তাহা শুধু সংস্কৃত-চিত্তদেরই 'শাশ্বত' ও 'একচেটিয়া' বিত্ত নয়। আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও শিল্পগত যে বিপ্লবের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ ও পুরাতন জাতিরা সোভিয়েটে নবজন্ম লাভ করিতেছে, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারে তাহাদের 'কালচার' বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু কাহার সেই 'কালচার' যাহা বিনষ্ট হয়? অবসর-বিলাসী শ্রেণীর (লেজর ক্লাশের) দুই চার জনের, না পরিশ্রমজীবী (টয়েলিং মাসেস্) পঁচানব্বই জনের? আশ্চর্য নয়, সংস্কৃতি বা কালচার বলিতে শুধু অবকাশেরই সূক্ষ্ম ও স্থূল রচনাই আমরা বুঝিতে চাই। এই অবসর-ভোগীদেরই আমরা তাই স্বতঃসিদ্ধরূপে সংস্কৃতির ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া ধরিয়া লই। তাঁহাদের ছাড়াও যে সংস্কৃতি থাকিতে পারে, তাঁহাদের বিলোপেও যে সংস্কৃতির সমুত্থান সম্ভব, এই কথা আর তাই ভাবিয়া উঠিতেও পারি না। 'ভারতীয় সংস্কৃতির' অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতাও তাই ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না—সোভিয়েট ব্যবস্থায় কোন্ ক্ষুদ্র জাতির ও কোন্ শ্রেণীর সংস্কৃতি অবজ্ঞাত হইয়াছে?—লোক-গীতি, লোক-কবিতা, লোক-নৃত্য, এক কথায় লোক-জীবন ও লোক-

সংস্কৃতির এমন গবেষণা, এমন অভ্যুত্থান, এমন প্রাণময় প্রেরণা ইহার পূর্বে কোথায় পাইয়াছিল উজ্‌বেকিস্তান বা তাজিকিস্তান, বুরিয়াৎ মঙ্গোলিয়া বা ইয়াকুটস্কের মানুষ?—সোভিয়েট-ভূমির ১৫০এর অধিক জাতিসমূহের সাধারণ নর-নারী? আর কোথায় শতকরা ৯৫ জন পাইয়াছে এই সংস্কৃতির স্বরাজ?

৫

কিন্তু সোভিয়েট সংস্কৃতির স্বরূপ লইয়াই শুধু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন এই যে সংস্কৃতি কি? কি তাহার স্বরূপ? মানুষের প্রাচীন স্মৃতি কি চিরায়ু? না তাহার দেহান্তর আছে, রূপান্তর ঘটে? সংস্কৃতি কি শুধু শাসক শ্রেণীরই সম্পদ, অবসরের রচনা? শতকরা পঁচানব্বই জনকে, সৃষ্টিশীল জনতাকে, সংস্কৃতি-বঞ্চিত না রাখিলেই কি সংস্কৃতি মরে? না, বরং অবসরের কৃত্রিম বিলাসে সংস্কৃতি আয়ুহীন হয়?—সাম্যবাদের অবশ্য মূল কথা হইল এই যে, মানব-সমাজ পরিবর্তিত হয় আর মানুষের সংস্কৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে খাত বদলায়। তাই, যখন এতদিনকার শ্রেণীশাসিত সমাজ রূপান্তরিত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজে রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন এই শ্রেণীগত সংস্কৃতিরও শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্য হইবে। এই মূল কথাটিকে লইয়া ভুল যে কত বড় হইতে পারে তাহাও সোভিয়েট ইতিহাসে আছে। প্রথম যুগে সাম্যবাদীরা যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই শ্রেণীগত, অতএব অগ্রাহ্য বলিয়া স্থির করেন। শিল্পে ও সাহিত্যেও এক আজব সৃষ্টির উন্মাদনায় তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। উহা 'বামপন্থী সাম্যবাদী' বিকৃতিরই সংস্কৃতিগত রূপমাত্র। আমার বৌদ্ধ গয়ার বন্ধুরা অবশ্য সেই স্তরেও পৌঁছেন নাই। তাঁহাদের মনোভাব মার্কিন-ট্যুরিষ্টদের সমতুল্য; এদেশের ধন-বিলাসী রাজনীতিজ্ঞদেরই তাঁহারা সগোত্র। এই উৎকট 'নতুন-ওয়ালারা' ভুলিয়া যান—শ্রেণীহীন সমাজ এখনো আসে নাই। যেই সমাজে আমরা নিশ্বাস লইতেছি তাহার বাস্তবরূপ না দেখিয়া কাল্পনিক শ্রেণীহীন সমাজের শ্রেণীহীন কাল্পনিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করা এক কল্পনা-বিলাস। আর কল্পনা-বিলাস সাম্যবাদের বিরোধী। ভারতীয় লেখকদের অনেকের 'কম্যুনিজমি' গন্ধও অনেকদিন পর্যন্ত ফ্যাসান-গত কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল। আজ তাঁহারা অনেক বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছে। অবশ্য অনেকে শুধু 'ভোল' বদলাইয়া জিতিতে চাহে।

তবু মোটের উপর সাহিত্যিক ভারতীয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে এখন দৃঢ়-সঙ্কল্প। তাঁহাদের এই গোড়ার কথাটি আজ মনে জাগিতেছে—সাম্যবাদ ঐতিহাসিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; তাহার দৃষ্টি ঐতিহাসিক। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় বিশ্বাস করেন বলিয়াই সাম্যবাদী জানেন—মানুষের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির অনুবর্তন মাত্র হইবে না, হইবে রূপান্তর। তেমনি তাঁহার ঐতিহাসিক-বোধ অমোঘরূপেই তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয়—মানবেতিহাসের কোন স্তরই অবজ্ঞেয় নয়, অবলুপ্ত নয়—মানব-প্রগতির পথে তাহা ঐতিহাসিক কারণে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক কারণেই তাহার অবসান হইয়াছে। ইতিহাসের প্রাচীন স্মৃতি সেই কারণ-পরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গিয়া মানব-প্রগতি-ধারাকেই স্পষ্ট করিয়া তোলে, চিহ্নিত করিয়া দেয়; আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দেয়—এই স্মৃতির সৌরভ যেমনি সংরক্ষণ-যোগ্য, তেমনি ভাবী সংস্কৃতির সুমহৎ সম্ভাবনাও অশেষ আগ্রহে সংগঠন-যোগ্য।

আসল কথা, সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারে পুনরাবর্তন নয়;—সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া মানুষ হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত। ১

প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতব্য—এই ইগোর নামটি শুধু ১৯৩৪ হইতেই রুশ দেশে দেখা দেয় নাই; রুশ দেশে নামটি চিরাগত প্রচলিত নাম। দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়াই কি প্রচলিত নাম রাম রাখা চলিবেনা? ভারতবর্ষে আমরা সাম্যবাদী হইলে কি আর নিজেদের নাম কৃষ্ণ, কানু, প্রতাপ, কিংবা আকবর, আওরংজীব, কবীর, সেকেন্দর (গ্রীক আলেক্জাণ্ডারেরই ফার্সি নাম) রাখিবনা? নাম রাখিব লেলিন বাঁড়ুজ্জে, ষ্টালিন খাঁ? নিতান্ত যান্ত্রিক চিন্তার বা আক্ষরিক অনুকরণ রীতির বশবর্তী না হইলে কেহ এইরূপ উদ্ভট কথা ভাবেন না—আর সাম্যবাদী দৃষ্টি বিস্তার এই যান্ত্রিকতার একেবারে বিরোধী। অবশ্য এই নাম লইয়া বাড়াবাড়িও যান্ত্রিকতা মাত্র। সাম্রাজ্য-বাদের আওতায় পরাধীন দেশে এইরূপ যান্ত্রিক চিন্তা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাহাতে দুই ফল ফলে: এক সময়ে আমরা আমাদের পুত্রকন্যা হইতে কুকুরের পর্যন্ত বিলাতী নাম রাখিতাম। আবার এখন উহারই প্রতিক্রিয়ায় এখন উদ্ভট রকমের দেশী নামও পুরাণ বা ইতিহাসের পাতা হইতে উদ্ধার করিতেছি; যেমন জনক রোড, মিসেস লোপামুদ্রা সরকার ইত্যাদি। নূতন পরিভাষার নিয়ম অনুসরণ করিয়া কি আমরা হালদার, মল্লিক প্রভৃতি কাশ্যপ ভরদ্বাজ প্রভৃতি হইব না? না, এই ল্যাজ কাটিয়া হইব তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ?

সংস্কৃতির গোড়ার কথা

সংস্কৃতির যে রূপান্তর হয়, সে রূপান্তর যে বারবার হইয়াছে—এই সহজ সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত মানেন না; আবার অনেকে মানিয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে মানেন না। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম কথা, সংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না। কেহ মনে করি, সংস্কৃতি বলিতে বুঝায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, ধ্যান-ধারণা; কেহবা মনে করি—আচার-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা-শিষ্টাচার; সে সম্পর্কীয় ভাবনা-ধারণা, নীতি-নিয়ম, এই সবও উহার অন্তর্গত। কেহবা উহাদের কোনো একটি জিনিসকেই সব বলিয়া মনে করি, যেমন, কেহ বলিবেন ধর্মই হইল সংস্কৃতি; ধর্ম সর্বব্যাপক। কেহবা অপর একটি জিনিসকেই মনে করি মুখ্য কথা। যেমন, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ইহাকেই বলেন 'কাল্চার'। তাই, সংস্কৃতির মানে কি, তাহার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি, প্রথমত এই কথাটাই আমাদের পরিষ্কার করিয়া জানা প্রয়োজন। ১

---

১ বাঙ্লা 'সংস্কৃতি' শব্দটি এই গ্রন্থে বরাবরই ইংরেজি 'কাল্চার' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানি, শব্দটি নূতন গঠিত, ইহার বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশি নয়। তৎপূর্বে 'কাল্চার'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে কখনো 'অনুশীলন,' কখনো বা 'সভ্যতা' ব্যবহার করিয়া অনেক সময়ে কাজ চালাইতে হইত। মাঝে 'কৃষ্টি' শব্দটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইত, এখনো 'কৃষ্টি' সেই অর্থে অচল হয় নাই। এমন কি, 'কাল্চার' শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়া কর্ষণাত্মক 'কৃষ্টি' শব্দ তৈয়ারী করা অন্যায়ও নয়। অবশ্য 'কৃষ্টি'ও অনেক পুরাতন শব্দ; উহার বৈদিক অর্থ এখন বিস্মৃত। সেই অর্থ ছিল 'সমুদায় কৃষক দল'। (দ্রষ্টব্য, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি,' ১ম ভাগ, পৃ ৬১)। 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে মানুষের 'কৃতির' বা সৃষ্টিমূলক সক্রিয় প্রয়াসের একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তাহা সর্ব যুগের মানুষের উপযোগী। যে কারণেই হোক্, কাল্চারের প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি' অপেক্ষা 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রচলনও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। 'সংস্কৃতি' এখানে সেই ব্যাপক ও সাধারণ অর্থেই মোটামুটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

বিচক্ষণ পাঠকের নিকট তথাপি প্রশ্ন শুনিতে হয়, 'সংস্কৃতি' শব্দটির কি অর্থে প্রয়োগ হইল? ইহা কি 'কাল্চার' বুঝায়? বুঝায় 'সিভিলিজেশন'?' সাৎসিতন্ত্রের দার্শনিক প্রবক্তা ওটো স্পেংলারের কৃপায় এখন 'কাল্চার' ও 'সিভিলিজেশনের' মধ্যে একটা অচল প্রাচীর কল্পনা করা এইভাবে অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইতে পারে। 'কাল্চার'এর মূল ব্যক্তি-সত্তার ও জনসত্তার প্রাণময়, গতিময় বিকাশ-অভীপ্সা; আর 'সিভিলিজেশনের' অর্থ সংগঠিত, পল্লবিত, সুস্থির স্থাণুত্ব-কামিতা;—এই মর্মের ব্যবধান টানা শুধু অর্ধসত্য নয়, উহাকেও বিকৃত করা, মিথ্যারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। বলা বাহুল্য, পৌর-জীবন ও পৌর

মূল একটি কথা স্পষ্ট—সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে, এবং মানুষের জীবন-সংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে; সেই জীবন-যাত্রারই ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ ও রঙ পরিবর্তিত হয়। আবার, সংস্কৃতির সহায়েও জীবনযাত্রা যেমন অগ্রসর হয়, সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন হইয়া উঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধ যখন দেখিতে পাই তখনি বুঝি সংস্কৃতি নিশ্চল নয়,—তাহার রূপান্তর ঘটে।

সংস্কৃতির বিষয়ে দ্বিতীয় কথাটি তাই এই—কোন্ নিয়মে সংস্কৃতির রূপান্তর চলিয়াছে তাহা বুঝিয়া লওয়া, পরিবর্তনের মূল তত্ত্বটির পরিচয় লওয়া। ইহার ফলে সংস্কৃতির মোট অবয়ব ও অবলম্বন কি, কি তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক, তাহাও বুঝিতে পারি। সংস্কৃতির রূপান্তরের ধার তখন প্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্যের দিকে তখনা একবার লক্ষ্য করিতে হয়,—দেখিতে হয় ইতিহাসের স্তরে

সংস্কৃতির উদ্ভব বাস্তব কারণেই ঘটে। কেন্দ্র বিশেষে তাহার পতন ঘটিলেও পৌর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দান তুচ্ছ নয়, তাহা শেষও হইয়া যায় নাই। বরং পৌর-সংস্কৃতির নব নব রূপই বিকশিত হইয়াছে, এবং পল্লী-সংস্কৃতি ও পৌর-সংস্কৃতির সমন্বয়েরও পথ এইকালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও ব্যবস্থাপনায় সুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কোনো কোনো পৌর-সভ্যতায় জরা-মরণ ঘনাইয়া আসিল এই জন্য যে—সেখানে সমাজ শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বৈষম্যে ও বিরোধে ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর পৌর-জীবনের আর্থিক প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিজয়, শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি বহির্বিরোধেও আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিল (দ্রষ্টব্য, ভিঃ গর্ডন চাইল্ডের Man Makes Himself, থিংকারস্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য)। অতএব, 'কাল্‌চার' ও 'সিভিলিজেশন'এর নামে স্পেংলারী গবেষণা বা আধুনিক "পৌর-সভ্যতার বিরুদ্ধে পল্লী-সভ্যতা, 'বিকেন্দ্রীকরণ' প্রভৃতি অতিকেন্দ্রিত প্রচারের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। এই গ্রন্থে অবশ্য আমরা 'সিভিলিজেশন' শব্দটির সাধারণ অর্থে 'সভ্যতা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি; বিশেষ অর্থে উহাকে 'পৌর-সংস্কৃতি' দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

পূর্ব-সংস্করণে 'কৃষ্টি' শব্দটি পরিহাসচ্ছলে (বাঙলার কাল্‌চার অধ্যায়ে) প্রযুক্ত হইয়াছিল। উহা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই এবার সেইরূপ অর্থে উহার প্রয়োগ হইল না। এই সংস্করণে 'কৃষ্টি' বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইল 'লোক-সংস্কৃতি' বুঝাইতে; কিংবা প্রাথমিক কৃষি-জীবীদের সংস্কৃতি বুঝাইতে; এবং স্থল বিশেষ সেইরূপ কৃষি-জীবীদের শিল্প-সামগ্রী বুঝাইতে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে কাল্‌চারেরও বিশেষ অর্থ আছে। তাহা না বলিলেও চলে। সাধারণ ভাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি উহার প্রতিশব্দরূপে প্রযুজ্য।

স্তরে সংস্কৃতির কোন্ কোন্ রূপ কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহাই এই প্রসঙ্গের শেষে প্রয়োজন—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতির পরিচয় সাধন। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহের পরিচয় লওয়া; বুঝিয়া লওয়া ইতিহাসের ধারা কোন্ দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে, কোন্ দিকে বহিয়া চলিয়াছে,—আমাদের দেশেই বা তাহা কোন্ খাত হইতে কোন্ খাতে বহিয়া আসিতেছে। ইহা বুঝিলে আর সন্দেহ থাকে না—দেশ-বিদেশে ইতিহাসের কোন্ নূতন রূপ আজ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা চলিয়াছে আজ কোন্ দিকে।

সংস্কৃতির অর্থ কি ?

সংস্কৃতির মানে কি, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্থ—মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি; এই 'কৃতির' বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া উঠিতেছে।

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা—বাঁচিয়া থাকা। মানুষ এই তাড়নায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া টিকিয়া থাকিতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইহারই নাম জীবিকা-চেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া, মানে, জীবিকা আয়ত্ত করা, তাহা সহজসাধ্য করা। তার প্রয়াস-প্রযত্নে এই জীবিকা সে ক্রমেই আয়ত্ত করিয়াছে—এই প্রয়াস-প্রযত্নেরই নাম পরিশ্রম। এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, শেষে সভ্যতার একটি একটি উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।

জীব-জগৎ প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। সে নিয়মকেই আপনার নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহারা বাঁচে, তাহারা মরে। কিন্তু মানুষ জীবজগতের মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। বাঁচিবার উপায়—জীবিকার উপাদান—সে নিজেই পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে, প্রকৃতির

একান্ত মুখাপেক্ষী থাকে না। তাই, সে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে কি করিয়া জীবন-যাত্রা তাহার সুলভ হয়, প্রাণধারণ তাহার সহজ হয়। এই লইয়াই তাহার বিপুল প্রয়াস, অফুরন্ত পরিশ্রম, আর প্রকৃতির সঙ্গে তাহার অশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়ী হইয়াছে, জীবিকার তাড়না ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ততটুকুরই নিদর্শন মিলে। তাই, এই সভ্যতা বা সংস্কৃতিই তাহার সেই চির-সংগ্রামের জয়চিহ্ন; আবার ইহাই তাহার জয়-অস্ত্র।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের এই বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই যুদ্ধাস্ত্রেরও আবার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পর্যায় দেখা গিয়াছে, জয়-চিহ্নও হইয়াছে বিচিত্রতর।

সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ

গোড়াতেই তাহা হইলে দেখিতেছি—এই ভাবে আমরা সংস্কৃতিকে সাধারণত বুঝিতে চাহি না। সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার, বড় জোর বিজ্ঞানও। কখনো আবার ভাবি সংস্কৃতি দেশগত, কখনো বা ভাবি তাহা কালগত। যেমন, কখনো আমরা বলি ভারতীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা। কিংবা আরও খণ্ড করিয়া বলি বাঙ্গালার কাল্‌চার, 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি', 'ভাগীরথী-সভ্যতা' ইত্যাদি (এইসব ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দদুটি 'কাল্‌চার' অর্থে যদৃচ্ছা ব্যবহার করি)। অথবা ধর্ম ও জাতিগত সূত্র ধরিয়া বলি হিন্দু সংস্কৃতি, 'ব্রাহ্মণিক্ কাল্‌চার', মোস্‌লেম সভ্যতা, ইত্যাদি। আবার কখনো কালের হিসাব মনে রাখিয়া বলি প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, ইত্যাদি। এইসব হিসাব অবশ্য একেবারে মিথ্যা নয়, সব সময়ে এইগুলি পরস্পর-বিরোধীও নয়—কিন্তু এইরূপ হিসাব খুব যুক্তিসঙ্গতও নয়। যেমন ভারতীয় সভ্যতা বলিলে তাহার মধ্যে হিন্দু সভ্যতাও আসে; আবার তাহাতে প্রাচীন সভ্যতাও যেমন বুঝাইতে পারে, মধযুগের সভ্যতাও তেমনি বুঝাইতে পারে।

এই সব নামে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঠিক পার্থক্য বা প্রকৃতি বুঝা যায় না; উহাতে সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সম্মত পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি এইরূপ নাম-দানে সুবিধা অনেক—জনমন সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে

পারে, আর তাহাদের মনের যৌথ-অহমিকা বা 'গ্রুপ প্রাইড্' বেশ তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এইভাবে সেই নাম-মাহাত্ম্য আমাদের মনে এমনি এক-একটা প্রকাণ্ড কম্‌প্লেক্‌স বা মোহের ঘূর্ণী সৃষ্টি করে যে, আমরা ভুলিয়া যাই সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ কি, তাহার মূল কোথায়, আর তাহার বৈশিষ্ট্যই বা কি দিয়া নির্ণীত হয়। তাই এক-এক জাতি বা জন-যূথ ধরিয়া লয়, এই মূল আছে তাহার রক্তে—সে রক্ত নর্ডিক রক্ত হইতে পারে, ল্যাতিন রক্ত হইতে পারে, আর্য রক্তও হইতে পারে, এমন কি বাঙালী রক্তও হইতে পারে। কেহ বা আবার বলে, তাহার সংস্কৃতির মূল আছে তাহার ধর্মে—ইস্‌লামে, হিন্দুত্বে অথবা খ্রীষ্টধর্মে কিংবা ভূতপূজায়। আর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও তেমনি প্রত্যেকে নিজের অভিরুচি মত নির্ণয় করিয়া ফেলে, কোনো সংস্কৃতির নাম দেয় 'আধ্যাত্মিক', কোনো সংস্কৃতিকে বলে 'জড়বাদী'। হইতে পারে গোষ্ঠীর ও ধর্মের গুণাগুণ খানিকটা আছে; আর বৈশিষ্ট্যও হয়ত খানিকটা সত্যই প্রত্যেকেরই নিজস্ব থাকে। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য প্রায়ই আপেক্ষিক, কাহারও 'একান্ত' নয়। আর, সে 'বৈশিষ্ট্য'ও আবার নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়। তাহা ছাড়া, সংস্কৃতির মূল-বিচারে, রূপ-নির্ণয়ে বা বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে সেই সব নিতান্তই গৌণ। সেখানে মুখ্য কথা এই—জীবন-যাত্রার কোন্ সৌকর্য সাধন সে সংস্কৃতি করিতেছে? প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের যে অফুরন্ত প্রয়াস মানুষের, তাহার কোন্ স্তরের আভাস সেই সংস্কৃতি দেয়?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাঁহারা তাই সংস্কৃতির বিচার করেন তাঁহারা দেখিতে পান সংস্কৃতির অর্থ এই—মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূলভিত্তিও অত্যন্ত বাস্তব—জীবিকা-প্রয়াস সহজায়ত্ত করা। কথাটাও তাই পরিষ্কার—জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয়, সংস্কৃতিরও পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, মানে, তাহার পরিবর্তন চলে।

এই কথাটাই আরও একটু তলাইয়া বুঝা দরকার—মানুষ নিজেও পরিবর্তিত হইতেছে; আর মানুষ ও তাহার পরিবেশ দুইই পরিবর্তনের স্রোতে পরস্পরকে পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মনে রাখা ভালো 'মানুষ পরিবর্তিত হয়', এই কথাটি কি অর্থে সত্য। মানুষের

নাক-মুখ-চোখ মোটামুটি সবই আছে (অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই আবার এই সবদিকেও একটু-না-একটু বৈশিষ্ট্য আছে); মানুষের আবেগ-কামনা, ক্ষুধা, জরা-মরণ,—তাহাও তো ঠিকই আছে; তবে মানুষ পরিবর্তিত হয় কি অর্থে? সে অর্থ এই যে, মানুষ যেই পরিমাণে পশুপক্ষীর মতো মাত্র জীব, সেই পরিমাণে সে প্রকৃতির বাধ্য, প্রাণ-বিজ্ঞানের বা বায়োলজির নিয়মের অধীন; সেই পরিমাণেই তাহার পরিবর্তনও হয় না। সে আহার চায়, সন্তান চায়, মৃত্যুতে ভয় পায়, সঙ্গম খোঁজে। কিন্তু মানুষ তো শুধু মাত্র জীব নয়, সে আপনার জীবিকা আয়ত্ত করিয়াছে, আর্থিক জীবন গড়িয়াছে। প্রকৃতির উপরে সে নানারূপে অধিকার স্থাপন করিতেছে। সে অন্য জীবের মত আহার করে, কিন্তু কত রকমে সে আহারকেই প্রস্তুত করে। সে সন্তান চায়, আবার কতকটা সেই ইচ্ছাকে নিয়মিতও করিতে পারে। সে মৃত্যুতে ভয় পায়, কিন্তু আবার অনেকাংশে ভয়কেও দূর করিতে পারে,—ভূতপ্রেতের ভয়, পশু-শ্বাপদের ভয় কাটাইয়াও মানুষ উঠিতেছে, এমন কি, সে মৃত্যু বরণও করে। সে যৌন কামনার অধীন, জরামরণের অধীন, কিন্তু তাহাও আবার কত ভাবে ছাড়াইয়া উঠে, বিচিত্র করিয়া তোলে। এই সব কারণেই তাহার পরিবর্তনের অসম্ভব সম্ভাবনা ও অবকাশ। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের জৈবধর্ম বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু উহার প্রকাশভঙ্গী ও শক্তি পরিবর্তিত হয়,—যাহাতে তাহা জীবনযাত্রার বেশি সহায়ক হইয়া উঠে। এইরূপেই জৈবধর্ম মনুষ্য-প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। তাই সেই জীবিকার প্রয়োজনেই যেমন মানুষের আর্থিক জীবন পরিবর্তিত হয়, পরিপুষ্ট হয়, তেমনি তাহার প্রবৃত্তিও আবার বিকশিত হয়, বিচিত্র হয়, নূতন ভঙ্গীতে, নূতন শক্তিতে প্রকাশিত হয়। এই অর্থেই মনুষ্য-প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। মানুষ শুধু মাত্র জৈবপ্রেরণার বশে চলিলে এই প্রকৃতি পরিবর্তিত হইত না। মানুষের আর্থিক জীবন না থাকিলে, সাংস্কৃতিক জীবন না থাকিলে, তবেই থাকিত শুধু তাহার পশু-জীবন—যাহার পরিবর্তন নাই—যাহা নিজের পরিবেশকে বদলাইতে পারে না, নিজেও পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের শক্তি আছে বলিয়াই সে মানুষ, আর ঠিক সেই কারণেই মানুষের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে (দ্রষ্টব্য, 'বাজে লেখা', লেখক)।

এই পরিবর্তন অবশ্য জানায় অজানায় নিত্যই ঘটিতেছে। সাধারণত

তাহা মানুষের চোখেও পড়ে না। কারণ জীবনযাত্রার এক স্তর হইতে আর এক স্তরে মানুষ নিত্য উত্তীর্ণ হয় না। সেইরূপ বিরাট ভাঙ্গা-গড়া, বিপুল বিপ্লব ঘটে এক-এক যুগে এক-একবার। সেই যুগান্তরে সমাজের দেহান্তর হয় আর সংস্কৃতিরও হয় রূপান্তর। তাহাতে মানব-প্রকৃতিও আপনার বিকাশের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া যায়, আর বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষের বিজয় স্বীকার করিয়া আরও একটু নতি স্বীকার করে।

এইভাবে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে অনেকখানি। সেই প্রস্তরযুগের মানুষ আজ আর নাই। শিল্পযুগের মানুষ এখন সংঘবদ্ধ শক্তিতে সচেতন ও সপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিতেছে। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, এখনো তবু প্রকৃতির একাংশও মানুষ জয় করিতে পারে নাই। আর একটি কথা—প্রকৃতির সহিত মানুষের এই সংঘাত একেবারেই যেমন জন্মগত, তেমনি মনে রাখা দরকার মানুষও প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। বিশ্ব-প্রকৃতিরই এক প্রতিকূল শক্তি মানবপ্রকৃতি। প্রকৃতিরই সেই বিশেষ একটি প্রকাশ হিসাবে সে দাঁড়ায় আবার প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে। আর সেই দ্বন্দ্ব চালায় বাহু-পদের সাহায্যে, বিশেষত হস্ত ও মস্তিষ্কের দ্বারা, দেহের স্বাভাবিক বলে—প্রকৃতিজাতকে আপনার প্রয়োজনারূপে পরিবর্তিত করিয়া লইতে। অন্য জীবের এই সব দৈহিক সুবিধা নাই, তাই তাহারা প্রকৃতির নিগড়ে বাঁধা। আবার বহিঃপ্রকৃতির সহিত এমনি প্রয়াসে এমনি ভাবে তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়াই মানব-প্রকৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া যায়: "He (man) opposes himself to nature as one of her own forces, setting in motion the arms and legs, head and hands, the natural forces of his body, in order to appropriate nature's productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his nature." (*Capital*—Marx, Vol. I. Pt. III, Ch. vii, Sec I.)

রূপান্তরের মূলতত্ত্ব

সমস্ত পরিবর্তনের মূলতত্ত্বটি এইবার জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ, সমাজ পরিবর্তিত হয় ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, ইহা না হয়

মানিলাম ; কিন্তু কেন, কি নিয়মে এই পরিবর্তন ঘটে তাহা না জানিলে, —কোন্ কোন্ দিকে মানব-সমাজের পরিবর্তন চলিয়াছে, আর তাই সংস্কৃতির আগামী রূপান্তরে কোন্ বিশেষ চেষ্টা সার্থক হইবে এবং কোন্ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে—তাহা বুঝিতে পারিব না। এই সত্য না বুঝিলে, বুঝিব না কেন সোভিয়েট প্রয়াস সার্থক হইবে, কেন ফ্যাশিস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য ; কেনই বা এই সোভিয়েট-প্রয়াসের আবির্ভাব, আর কেনই বা তাহার সঙ্গে পুরাতন অন্য তন্ত্রের, বিশেষ করিয়া প্রতিক্রিয়া-নেতা ফ্যাশিতন্ত্রের বিরোধ অনিবার্য ; কেনই বা ফ্যাশিতন্ত্র পরাজিত হইলেও মার্কিন-বৃটিশ প্রতিক্রিয়া-শক্তি এখন মূলত সেই ফ্যাশি-নীতিকেই আশ্রয় করিতেছে, এবং নূতন করিয়া আবার পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে ব্যূহ-রচনা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এইসব কথা পরিষ্কার হইয়া যায় সভ্যতার রূপান্তরের মূলতত্ত্ব বুঝিয়া লইলে। অবশ্য এই মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার-বিতর্কের অন্ত নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব টিকিয়া গিয়াছে। পরে ('বিজ্ঞানের জগৎ' অধ্যায়ে) আমরা তাহা দেখিব। এখন শুধু তত্ত্বটি জানিয়া সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা, অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসের ধারা, এই আলোকে আপাতত একবার দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে—বুঝিতে পারিব সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা কোন্ দিকে চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের সাক্ষ্য

মানুষের সামাজিক জীবন ও মানুষের অন্তর্জগৎ এই সমস্তই যে নিয়ম মানিয়া চলে তাহা "আধ্যাত্মিক" নয়, নিতান্তই "বাস্তব"। অবশ্য এই বস্তুবাদের মতে 'মন' যে নাই তাহা নহে ; মনও আছে, তবে তাহা বস্তুরই এক বিকাশ। বস্তুই মূল জিনিস আর পৃথিবী বা মানুষ সবই বাস্তব ; কিছুই জড় নয়, বস্তুও জড় নয়, প্রকৃতিও জড় প্রকৃতি নয়—তাহাও চঞ্চল, পরিবর্তমান, নূতন নূতন আবির্ভাবের উৎস।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে একটি আলোড়ন অনির্বাণ জ্বলিতেছে, তাহারই ফলে সেই নূতন নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব—ইহাই বিজ্ঞানেরও সাক্ষ্য। বস্তুপুঞ্জের পঞ্জরে পঞ্জরে এক ঘূর্ণীর হাওয়া লাগিয়াই আছে—বৈজ্ঞানিক তাহার সন্ধান দিয়াছেন। উহার নিত্য নূতন তথ্য তাঁহারা আবিষ্কারও করিতেছেন। বিশ্বের মূল উপাদান খুঁজিয়া তাঁহারা

একদিন পাইয়াছিলেন—ইলেক্ট্রন্ ও প্রোটোন; এখন আরও সন্ধান পাইয়াছেন নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোট্রন (মসন), এবং সম্ভবত নিউট্রিনোর। এই সব উপাদানের সংঘর্ষে জন্ম হয় নব নব বস্তুর। অবশ্য সেই নূতন আবির্ভাবের বুকের মধ্যেও গুপ্ত থাকে সেই চিরন্তর দ্বন্দ্ব। তাহাই আবার ক্রমে ফুটিয়া বাহির হয়, আবার বাধে সংঘর্ষ, আর তাহার সমাধান হয় নূতনতর আবির্ভাবে। এমনি করিয়া দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে চঞ্চল বস্তু আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের তাগিদে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। যথা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকার দ্বন্দ্বে হঠাৎ দেখা দেয় জল। জলকে শুধু হাইড্রোজেনও বলা যায় না, অক্সিজেনও বলা যায় না; দুই-ই উহাতে আছে, কিন্তু উহাও একটা নূতন বস্তু। আবার জলও ফুটিতে ফুটিতে এক সময়ে বাষ্প হইয়া হঠাৎ উড়িয়া যায়। জল ও তাপ মাত্র নয়, বাষ্পও আবার একটা নূতন বস্তু। বস্তু-চাঞ্চল্যের মূলে আছে এই দ্বন্দ্ব, আর আভ্যন্তরীণ সেই দ্বন্দ্বের বশে বস্তু এমনি করিয়া বাড়িয়া চলে; কণিকার পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে (quantitative change) শেষে পুরানো বস্তুই একেবারে নূতন ধরণের, নূতন গুণযুক্ত (qualitative change) বস্তু হইয়া উঠে; আর সেই নূতন বস্তুর মধ্যে তখনকার মতো মিলাইয়া যায় পুরানো বিরোধ। কিন্তু দ্বন্দ্বই যখন মূল ধর্ম তখন এই নিয়মই অনুসরণ করিয়া নূতন বস্তুও নূতনতর হইবে। হইতেছেও তাহাই। শুধু পুরাতন হইতে নূতন, বা নূতন হইতে নূতনতর ধাপে সে সমুত্তীর্ণ হয় আকস্মিক রূপে—একটু বড় রকমের বাধা ডিঙাইয়া—এক উৎক্রান্তিতে (jump)। মানুষের সমাজে এই উৎক্রান্তিরই নাম—বিপ্লব। ইহারই বশে হয় বিরোধের বিনাশ, নূতনের আবির্ভাব,—আবার নূতনের বুক ফাটিয়া নূতনতরের জন্ম। ইহাই 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ', ডায়েলেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্। মানুষের ইতিহাসেও এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মিলে; এ জন্যই ইহাকে আবার বলা হয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', হিষ্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্।

বস্তুর বুক চিরিয়া এমনি এক পরম মহৎ বিপ্লব ঘটে যখন পৃথিবীতে প্রাণবীজ বস্তুকেন্দ্রে জন্মাইল—যাহাকে প্রাণবিজ্ঞান নাম দিয়াছে প্রোটোপ্লাজম্। বস্তু হইতে প্রাণ—দূরত্বটা ভাবিলে আজ সংশয় জন্মে বটে, কিন্তু প্রোটোপ্লাজম্ বস্তুর বড় নিকটবর্তী। একবার প্রাণের

আবির্ভাব হইলে পর দ্বন্দ্বমূলক বস্তু-প্রগতির যে ইতিহাস শুরু হইল, ডারউইনের শিষ্যবর্গের কল্যাণে তাহা সুবিদিত, এবং আজ অবিসংবাদিত। প্রাণীর জীবন-সংগ্রাম চলিল। তখনো কিন্তু প্রাণী অচেতন। সেই অচেতন প্রাণীর জগতে শেষে হঠাৎ চেতন প্রাণীর আবির্ভাব হইল—যে চেতন প্রাণীর চরম নিদর্শন মানুষ। কিন্তু চেতনাহীন প্রাণী হইতে এই যে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি—প্রাণীজগতে উহাও আর এক সুবৃহৎ বিপ্লব। এখানেও হয়ত আবার আমাদের মনে সংশয় হানা দেয়। কিন্তু প্রাণী হইতে ক্ষীণ-চেতন, প্রায়-অচেতন ও অচেতন প্রাণীদের ক্রম-পর্যায় বাহিয়া নামিলে কথাটা অসম্ভব মনে হয় না। বস্তু-বিকাশের শেষ দান কিন্তু মানুষের এই ক্রম-পরিস্ফুট চৈতন্য —যাহার বলে সে বস্তুর উপর নির্ভরশীল হইয়াও বস্তুকে আপনার দাস করিয়া লইতে শিখিতেছে; প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা হইয়াও প্রকৃতিকে বন্দিনী করিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু তবু তাহার বুকে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব, বিরোধের নব-নব সূত্র তাহারও সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুস্যূত হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতি সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, নূতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়। আর এই উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সংকট (Crisis) এবং বিপ্লবের (Revolution) পথ,—ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য। 'অমিট্রায়ের' বেনামীতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এমনি ধরণের কথা আমাদের জানাইয়াছেন তাঁহার অনবদ্য ভাষায়—যদিও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বমূলক বা বিপ্লবী বস্তুবাদে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন: "মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

ইতিহাসের সাক্ষ্য

বিশ্বনিয়মের পূর্বোক্ত মূলসূত্রটি যাঁহারা না মানিতে চান তাঁহারাও এইরূপে স্বীকার করেন, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ বিপুল উৎক্রান্তির সাক্ষাৎ মিলে। মানুষের ইতিহাসের তলায় কোন্ শক্তি জমিয়া উঠিয়া তাহাকে এমনি করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেয়, বস্তুপ্রগতির সূত্র না জানিয়াও

তাহার আভাস পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করিলেও যে তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহাই যথেষ্ট। দেখিয়াছি, মানুষের ইতিহাস মূলত শুরু হয় তাহার জীবিকা-প্রয়াস হইতে; কিন্তু একটু পরেই তাহার ইতিহাস হইয়া উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সেই মূলত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য শ্রেণী-বিরোধের কাহিনী, দ্বন্দ্বমূলক প্রগতির কাহিনী।

প্রাণীবিজ্ঞানের যাঁহারা ছাত্র তাঁহারা জানেন, সাধারণ জীবেরা প্রাণধারণের জন্য নিজ নিজ পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশ-বিজ্ঞানই (Ecclogoy) জীবজগতের বড় শাস্ত্র। কিন্তু মানুষের বেলা এই পরিবেশ-বিজ্ঞান মানুষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হইয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থ-বিজ্ঞানে। Ecologyর স্থান লইয়াছে Economics; ইহার সূচনা হইয়াছে সেদিন যেদিন মানুষের আদিপুরুষ উন্নত দেহ লাভ করিল, খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিল দুইখানি কর্মক্ষম হাত; উন্নত মস্তিষ্ক, উন্নত দৃষ্টিশক্তি; তারপর মননশীল মানুষের (হোমো সেপিয়ান্) পক্ষে দুই হাত ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার তখন সম্ভব হইল। তার দৈহিক গঠনের বলে নিজের জীবন সংস্থানের অবলম্বন (means) সে নিজে উৎপন্ন করিতেই অপরোক্ষভাবে মানুষের জীবন-যাত্রার বস্তু-উপকরণও (material) উৎপন্ন হইল। "They begin to differentiate themselves form animals as they begin to produce their means of subsistence, a step which is conditioned by their physical organisation. By producing their means of existence men indirectly produce their material life itself." (*German Ideology* —Marx-Engels)।

সংস্কৃতির গোড়াকার কথা তাই জীবিকা, অর্থাৎ আর্থিক উদ্যোগ। সেই জীবিকার তাড়নায় মানুষ তাহা আয়ত্ত করিবার উন্নততর উপায় সর্বদাই খোঁজে, সমাজ তাহার আর্থিক বনিয়াদ বারে বারে বদলায়; কারণ প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেইতো লুক্কায়িত আছে বিরোধের বীজ। এক-একটা ব্যবস্থা চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে তাই সমাজের মধ্যে উৎপাদন-শক্তির (forces of production) তেজ এত বাড়িয়া যায়, তাহা এত প্রবল হয় যে, তখন পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থাৎ পরস্পরের উৎপাদন-সম্পর্ক

(production relations) আর সেই উৎপাদন-শক্তিকে সেই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যেই দ্বন্দ্ব বিশ্ববস্তুর অন্তর্নিহিত রূপে দেখিয়াছি, তাহাই এই ক্ষেত্রে উৎপাদন-শক্তির ও উপাদান-সম্পর্কের দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। কিছুতেই কিন্তু পুরানো ব্যবস্থা আপনার বিনাশ বা বিলোপ চায় না, নূতনকে সে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। প্রভুশ্রেণী তাহাদের অধিকার ছাড়ে না, নূতন শক্তিধর শ্রেণী বিপ্লবের দ্বারা তাহা কাড়িয়া লয়, প্রভুর শ্রেণীতে উঠিয়া গিয়া নিজেদের উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত করে। এইরূপে বারবার নূতন শ্রেণী জয়ী হয়, পুরাতন প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। অবশ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরানো শ্রেণীর অনেক সৃষ্টিও চুরমার হয়—তাহার ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা, সাহিত্য, সুকুমার-কলা, রস-নিদর্শন, যাহা কিছু সৌধ-শিখরের মুকুট-শোভা, সমাজ-সভ্যতার পরম গরিমা! উপায় নাই, তাহার ভিত্তিই যে টলিয়া গিয়াছে। সান্ত্বনা এই যে, নূতন ভিত্তি গড়া হইতেছে; আর তাহা গড়া হইতেছে উন্নততর ভূমির উপর। আর পুরানো সংস্কৃতি—তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির সারবস্তু ও সৃষ্টিকলা নূতন স্রষ্টারা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে—তাহা বিলুপ্ত হইবে না, মিশিয়া নবায়িত হইয়া উঠিবে, নতুন সৃষ্টিতে, রূপে সঞ্জীবিত হইবে। সমাজ এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া আবার কিছু দিনের মতো স্থির হইবে, গড়িয়া উঠিবে নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় তদ্রূপযোগী মানস-সম্পদ; হইবে পুরানো সংস্কৃতির রূপান্তর।

ইতিহাসের মুখ্যরূপ

মোটামুটি মানুষের ইতিহাস এই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির ইতিহাস—আর তাই ইহার অনেকটাই শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস। পুরাতত্ত্বের, নৃতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের গবেষকদের হাতে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে। আমরা অবশ্য সাধারণ-ভাবে শুনি—নানা কারণেই মানুষের ইতিহাস নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, হয়ত কোন রাজার খেয়ালে, কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে, কোনো ধর্মপ্রচারকের ধর্মপ্রচারে। তদনুযায়ী রাজা-রাজড়ার রাজ্যারোহণ বা রাজ্যচ্যুতি দিয়া আমরা ইতিহাসের কাল নির্দেশ করিয়া

থাকি; কিংবা কোনো রাজবংশের রাজ্যপ্রাপ্তি বা কোনো বিশেষ শক্তির রাজ্যাধিকার দিয়া ইতিহাসের যুগবিভাগ করি—বলি, আকবরের আমল কিংবা হিন্দু-রাজত্ব বা মুঘল-যুগ। এসব একেবারে মিথ্যা নয়, তাহা জানি,—কিন্তু তথাপি আবার মনে রাখা দরকার, এ সব গৌণ। এসবেও ইতিহাস প্রভাবিত হয়, কিন্তু ইতিহাসে মুখ্য প্রভাব আর্থিক অবস্থার, আর তাহারই জন্য ইতিহাসের মুখ্যরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম।

বিশ্বচরাচরের এই বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বটি বুঝিয়া লইলে সংস্কৃতির মূল উপাদান ও উহার রূপান্তরের নিয়ম সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। গোড়াতেই দেখিয়াছি—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, কারণ মানুষ জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। মানে, মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়।

সংস্কৃতির তিন অঙ্গ

কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি শুধু মাত্র যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যান-বাহন বুঝায় তাহা নয়। শুধুমাত্র যে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়—চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়,—তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি—মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে, দেখিতে পাই।

প্রথমত উহার মূল ভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means); দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure); আর তৃতীয়ত সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদে—উহা এই হিসাবে সমাজ-সৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (superstructure)। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধ সত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার মানে কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর

একটি অর্ধ সত্য। কথা এই যে, উহা সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্য-ছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়—এইটিই আসল কথা।

সমাজের রূপ—উপাদানের দান

সমাজের পরিচয়ও অবশ্য আমরা আবার জাতি বা ধর্ম দিয়া নির্দেশ করি। কিন্তু একটু পিছনে দৃষ্টিপাত করিলেই যখন এই সব জাতির ও ধর্মের ঠিকানা দুর্লভ হয়, তখন সমাজকে আমরা চিহ্নিত করি বৈজ্ঞানিক উপায়ে—তখনকার দিনের জীবিকার উপাদান (means of living) দিয়াই তখনকার সমাজের পরিচয়। যেমন আমরা বলি প্রস্তর যুগের মানুষ—প্রস্তরের ছুরিকা, বল্লম এবং কুঠার ও তীর ছিল ইহাদের জীবিকার অস্ত্র; স্বর্ণ ও তাম্রযুগের মানুষ—প্রস্তর ছাড়াও এই সব ধাতুর ব্যবহার তখন ইহারা শিখিয়াছে; শেষে বলি লৌহযুগের মানুষ—লৌহের উপকরণ ইহারা ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই সব মানুষের ধর্ম বা জাতি কি ছিল জানি না; কিন্তু বুঝি ইহারা কি উপকরণ দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত; আর-সেই সব উপকরণের নামেই তাহাদের তখন নাম দিই, ঐ উপাদান হইতেই তাহাদের সমাজের রূপ চিনি।

সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব—উপকরণ

আমাদের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই প্রস্তর যুগের বা তাম্র-প্রস্তর যুগের বা লৌহ যুগের মানুষ ছিল 'অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপদান তবু তাহারা আয়ত্ত করিতেছে, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের সূত্রে ভাবভঙ্গী ছাড়াও অন্যরূপ প্রণালী (কণ্ঠধ্বনি) আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বিশেষ বিশেষ অর্থে এক-একটা শব্দকে প্রয়োগ করিয়া 'ভাষা' নামক অদ্ভুত মানস-সম্পদেরও অধিকারী হইয়াছে; এক কথায় এই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের গণনায় তাই তাহাদেরও 'সভ্যতার' নাম আছে; উপাদান দিয়াই সেই নাম স্থিরীকৃত হয়। কারণ ইহাদের সভ্যতার সাক্ষ্য, উহার বিচারের উপাদান—ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ইহাদের আহার্য ও পানীয়-পাত্র, ইহাদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এইসব বস্তুরই আমরা সন্ধান পাই এখনো, অন্য উপায়ে ইহাদের

কথা জানিবার পথ নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপও (টাইপ্) চিনিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরণের (টাইপের) উপকরণ মিলে তাহার একযোগে তাঁহারা নাম দেন সেই 'কালচার' বলিয়া। যেমন সোয়ান নদীর উপত্যকার 'সোয়ান্ কালচার'—পাথরের একটা বিশেষ ধরণের কৃতি তাহাতে দেখা যায়।

এই সব বাস্তব উপকরণ হইতে আবার ইহাদের সামাজিক বা মানসিক গঠনেরও একটা আভাস আমরা লাভ করিতে পারি—আহার, শিকার প্রভৃতি একই উদ্দেশ্য সাধনে উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু উপকরণের নির্মাণে ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঐতিহ্যও হয়ত এক-একটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। তাহার অনুসরণ করিয়াই সেই বিশিষ্ট 'টাইপের' ছবি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রভৃতি নির্মাণ চলে। এই সামাজিক ঐতিহ্যের আভাসও তাই উপকরণে নিহিত থাকে। আলতিমারা ও দর্দঞের গুহা-চিত্র এই কারণেই এত গবেষণার বস্তু। কারণ, মানুষ ও তাহার জীবিকার উপকরণ, এই দুই যেমন মানুষের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার বস্তু, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ-সৌকর্যের জন্য মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে—জীবিকার দায়ে মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্যাস গঠন করিয়া চলে,—তাহারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর জীবন-যাত্রায় পরস্পরের সম্পর্ক, উহা দিয়াই সমাজের মুখ্য পরিচয়; ধর্ম, জাতি এই সব দিয়া সমাজের নামকরণ এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক।

দ্বিতীয় অবয়ব—সামাজিক রূপ

কিন্তু প্রশ্ন হইবে উপকরণ হইতে না হয় উৎপাদন-প্রথা অনুমান কর' গেল, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অনুমান করা গেল, কিন্তু উহা হইতে সেই সমাজের মানুষের মনের হিসাব পাওয়া যাইবে কি করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, মানুষের মানসিক সৃষ্টি যেখানে পাইনা, সেখানেও মানুষের মানসিক গঠনের একটু পরিচয় তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যেমন, যে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়া শিকার করিয়া খাইত, বুঝিতে পারি তাহারা দল বাঁধিয়া দুর্বল বা

বৃদ্ধ পশুকে তাড়া করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া খাইত, শিকারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের মনে ক্ষুধা, পশু, শিকার, দল—এই সবই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু যে মানুষ কৃষি আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মনে নদী, মেঘ, ঋতু, জমির মালিকানা এ সবই হইবে বড় চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বড় বিষয়। মানুষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরও বেশি পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সামাজিক ব্যবস্থা হইতে—তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার-বিচার, উৎসব-অনুষ্ঠান জানিলে।

যে মানস সম্পদকে আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলিয়া থাকি,—যেমন, দর্শন,কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান,—যেই যুগে মানুষের সেই সব রূপের খোঁজ পাই না সেখানেও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ অনুমান করিতে পারি—প্রথমত সে যুগের জীবন-যাত্রার উপকরণ হইতে, দ্বিতীয়ত তাহার সামাজিক রূপ হইতে। কোন যুগে জীবন-যাত্রা তাই কি কি উপকরণ দিয়া নির্বাহ হইত, তাহা জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সে যুগের সংস্কৃতি কি স্তরে পোঁছিয়াছিল। জীবন-যাত্রার উপকরণ দিয়া প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুমান করিতে পারি, কতকটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্য প্রস্তর যুগের (নিয়েন্ডারথাল) মানুষও মৃতসন্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধিতে খাদ্য-পানীয় রক্ষা করিত; অর্থাৎ বুঝিতে পারি—'মানুষ মরে না', 'অমর' এরূপ একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের আগেকার মানুষের মনেও জন্মাইয়াছে। শুধু তাহা নয়, লাখ খানেক বৎসর পূর্বকার মানুষ তাহার পাথরের অস্ত্রশস্ত্রকে এমন করিয়া সযত্নে পালিশ করিত যে দেখিয়া বুঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, নিজের মনেও জিনিসটি সুন্দর করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিত। তারপর দেহসজ্জা, প্রসাধন প্রভৃতিতে 'অসভ্য' মানুষের এই মানসিক ভাবনা-ধারণার রুচি-রীতির অনেক হদিসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদান অপেক্ষাও মানুষের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক রূপে। যে যুগে আসিয়া সংস্কৃতির এইরূপ ঐতিহাসিক উপাদান মিলে, অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থা জানা যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়া সভ্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়াই সেই সংস্কৃতিরও নামকরণ করা আরম্ভ হয়। যেমন পশুচারিক (Pastoral) সভ্যতা, কৃষিমূলক

(Agricultural) সভ্যতা। অবশ্য, এই সব সভ্যতার বা সংস্কৃতিরও আরও স্তর-বিভাগ করিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আবার নূতন নূতন স্তর ক্রমশ দেখা দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তর-ভেদের মূলেও আছে জীবিকার্জনের নূতন প্রয়োজনের চিরন্তন তাগিদ।

"The special manner in which this union (between worker and means of prodution) is accomplished, distinguishes the different economic epochs from one another," (*Capital*—Marx, Vol II, Kerr edn, p. 44). কোনো যুগের উপকরণ কি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া সে যুগের মানুষ জীবন-যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে, উপকরণের প্রয়োগের সেই সেই বিশেষ পদ্ধতি হইতেই সে যুগের সংস্কৃতির স্তর নির্ণীত হয়।

শেষ অবয়ব—মানস সম্পদ

কিন্তু যেখান হইতে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ সেখান হইতে সংস্কৃতির মানস-সম্পদেরও প্রায়ই আমরা সন্ধান পাই। আচার অনুষ্ঠানের বোঝা বহিয়া কখনও চিত্র, কখনও গান, কখনও কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে সেই যুগের মানস-ইতিহাস খুলিয়া দেয়। নিজেদের সংস্কৃতি-বিচারে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসকে আমরা বড় মনে করিনা বটে, কিন্তু যখন এইসব প্রাচীন বা আদিম জাতির এই গীত-গান, নৃত্যের বা চিত্রের হিসাব লই, তখন আমরা উপলব্ধি করি সেই সব মানস-সম্পদ তাহাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা-প্রণালীর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান নাচ, বা কৃষিজীবীর গান নাচ তাহার পশুপালন বা তাহার কৃষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, এইরূপ জীবিকা-প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবেই রচিত হইয়াছে। ঐসব মানস-প্রয়াসে তখনকার জীবিকা-প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কৃতি পূর্ণতর হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে কড্‌ওয়েল রচিত 'ইল্যুশন্ এণ্ড রিয়েলিটি' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

পারস্পরের সম্পর্ক

বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন জীবিকার নূতন উপকরণ আবিষ্কার করাতে জীবন-যাত্রা অগ্রসর হইয়াছে,—তাহাতে সমাজ-সম্পর্ক নূতন হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, আর উহারই ফলে মানসিক ক্ষেত্রে নূতন চেতনা, নূতন চিন্তা, নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে,—তেমনি আবার মানসিক ক্ষেত্রের সেই নূতন চেতনা, নূতন চিন্তা, নূতন সৃষ্টিও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার নূতনতর উপকরণ আবিষ্কারে ও নূতনতর বাস্তব সৃষ্টিতে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে,—তাহার সামাজিক জীবনযাত্রাকেও ঐরূপ সৃষ্টির পক্ষে নূতন-ভাবে বিন্যাস করিতে প্রেরণা দিয়াছে। এইভাবে বাস্তব সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি পরস্পরের সহায়ক হইয়াছে, সক্রিয়ভাবে এক ক্ষেত্রের সৃষ্টি অন্য ক্ষেত্রের সৃষ্টিকে পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে; তাহাতেই আবার সমস্ত সংস্কৃতি উন্নত, ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে, থামিয়া থাকে নাই, বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ আর মানসিক সম্পদ এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতিযুগে সেই যুগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে।

উপমা দিলে বলা যায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সম্পদ যেন গাছের ফল ফুল; সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও তাহার শাখা প্রশাখা; আর জীবিকার উৎপাদন-প্রথা যেন সেই গাছের মূল। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক ভুলিবার নয়। ফুল যে মিথ্যা, এই কথা মনে করিলেও ভুল হইবে; আবার মূল ও কাণ্ড হইতে তাহাকে একেবারে নিঃসম্পর্কিত বলিয়া মনে করিলেও ভুল হইবে। মূল যেমন ফুল নয়, ফুলও তেমন আকাশে ফোটে না। আর একটা উপমা লওয়া যাইতে পারে—উৎপাদন-প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি; সমাজ-সম্বন্ধ যেন তাহার নিম্নতল বা গ্রাউণ্ড প্ল্যান, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সৃষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্যখচিত উপরতলা, বা সৌধ-চূড়া। দূর হইতে দেখিলে উপরতলার রূপেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম, তারপর নিম্নতলের দিকেও দৃষ্টি যায়; কিন্তু ভিত্তির কথা স্মরণ না রাখিলেও তো ভুল হইবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যে, আসল কথাটা

হইল এই যে, অবয়বের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির গভীর যোগ আছে; সে যোগ সক্রিয় যোগ; আর উহার সমস্ত মিলাইয়া যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাই সংস্কৃতি—ফল-ফুল-ভরা বৃক্ষ বা নানা-কক্ষ-সমন্বিত প্রাসাদ। অবশ্য এইসব উপমায় একটা ভুল ধারণা হইতে পারে—গাছ বা গৃহের মত সংস্কৃতি বুঝি স্থাণু, নিশ্চল। কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে একটু একটু করিয়া জয়ী হইতেছে—আর সংস্কৃতি তাহার সেই যুদ্ধের অস্ত্র আবার সেই যুদ্ধেরই বিজয়-নিদর্শন; মানুষের সেই জীবন-যুদ্ধ যেমন নূতন নূতন রূপে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সংস্কৃতিও তেমনি রূপান্তরিত হইতেছে। মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই তাহার সংস্কৃতির এই রূপান্তরের ধারাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

গ্রন্থপঞ্জী

মার্ক্সীয় দর্শন—সরোজ আচার্য
দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—জোসেফ ষ্টালিন
বাজে লেখা—লেখক
Historical Materialism—Marx-Engels.
Man Makes Himself—Gordon Childe.
Illusion and Reality—Christopher Caudwell.
Dialectical Materialism—Jackson.
Anti-Duhring—Engels.
Dialectic in Nature—Engels.

ইতিহাসের ভূমিকা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস মানুষের জীবিকোপায়ের হিসাব মতো যুগে যুগে বিভক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক সেই যুগগুলির মোটামুটি পরিচয় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতে পারেন। সেইসব যুগের নামকরণ হইয়াছে সেই-সেই যুগের বিশেষ জীবিকা-অবলম্বন ও উৎপাদন-প্রথা হইতে। সংস্কৃতিরও নামকরণ অনুরূপই হইবে। অবশ্য এইসব যুগ একেবারে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুই তিন যুগেরই উপায়-উপকরণ রক্ষিত হয়। কিন্তু যুগের নামকরণ হয় কোন্‌টি কখন মুখ্য তাহা হইতে; প্রাচীন প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, তামা, লৌহ ইত্যাদি বাস্তব হাতিয়ার হইতে। না হইলে প্রাচীনতর যুগের চিহ্ন ও আধুনিকতর যুগের চিহ্ন অনেক সমাজেই পাশাপাশি খুঁজিলেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশেই তো তাহা আছে; আদিম টোডা, ভীল, সিংহলের বেড্ডা প্রভৃতি জাতি হইতে নবজাত টাটা-বিড়লা প্রভৃতি ধনিক-শ্রেণী পর্যন্ত এই দেশেও আছে। তাই দেখিতে হইবে সমাজে কোন ধরণের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-প্রথা কখন মুখ্য।

প্রস্তর যুগ—প্রাচীন প্রস্তর যুগ

মানুষের ইতিহাস বহু বৎসর পর্যন্ত প্রায় প্রাঙ্‌নরের (hcminids) ইতিহাস। চীনে, জাভায়, টাঙ্গনায়িকায় (আফ্রিকা), জার্মানিতে ইহাদের করোটি ও নানাচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরে জন্মাইল 'হোমো সেপিয়ান্‌' বা সজ্ঞান নৃজাতি।

প্রস্তর যুগই এই মানুষের ইতিহাসের প্রথম যুগ—তাহার দুই ভাগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগ। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে প্লেইষ্টোসিন্‌ যুগ তখন মোটামুটি চলিতেছে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের কাল নাকি প্রায় লাখ দুই বৎসর। পাঁচ লক্ষ বা আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে নাকি তাহা আরম্ভ হইয়াছিল, অবশ্য এই দীর্ঘকালের আবার আদি, মধ্য প্রভৃতি ভাগ আছে। ইহার মধ্যে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহা মনে রাখা দরকার। ততদিন মানুষ

পাথরের করকুঠার ও ছুরি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র চাঁছিয়া তৈয়ারী করিত; ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিত; শিকারের পশু আগুনে পুড়িয়া ঝল্‌সাইয়া লইত, সবাই মিলিয়া-মিশিয়া ফলমূল ও মাংস খাইত। নদী ও সমুদ্র হইতে মাছও তাহারা ধরিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর খাদ্য তখন বড় অনিশ্চিত। বহু কাল যাবত অন্য প্রাণীরই মত মানুষ খাদ্য কুড়াইয়া লইত, 'সংগ্রহ করিত'। মর্গ্যান এই যুগটাকেই বলিয়াছেন 'স্যাভেজারি'র যুগ। বাংলায় 'অসভ্য' না বলিয়া ইহাকে বলা ভালো 'নিষাদ সমাজের' যুগ। মানুষের না ছিল তখন পরিবারের চিহ্ন, না সম্পত্তি। কাজে কাজেই সমাজ-সম্পর্ক ছিল জীবিকাগত আর মানসবোধও তেমনি, শ্রেণী-বিভাগও তখন এই আর্থিক গড়নে প্রথম দেখা দেয় নাই—তাই এই অবস্থাকে আদিম সাম্যতন্ত্র বলা হয়। পনের কুড়ি জনে এক সঙ্গে শিকার করে খায়; মেয়েরা কুটনা কুটে, শিশুপালন করে। তবু ইহারই শেষার্ধে এই নিষাদ-জীবনেও ওরিগ্‌নেশিয়ান হইতে ম্যাগ্‌ডেলিয়ান স্তর পর্যন্ত সংস্কৃতি বার পাঁচেক রূপান্তরিত হয়। এইসব স্তরের মানুষ যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। এখনো মালয়ে, মধ্য আফ্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়, মেরু প্রদেশের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে এরূপ স্তরের মনুষ্য-গোষ্ঠী বাঁচিয়া আছে, তাহা মনে রাখা উচিত। অবশ্য এই জাতীয় প্রস্তরাস্ত্র শুধু ইউরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ভারতে ও পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায়ও পাওয়া গিয়াছে তাহাও স্মরণীয়।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের 'নিষাদ-জীবনের' বিশিষ্ট সামাজিক গড়ন দেখা যায় তাহাদের 'টোটেমে'। 'টোটেম' শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, কিন্তু জিনিসটির সঙ্গে তা বলিয়া আমাদের যে পরিচয় একেবারে নাই তাহা নয়। কথাটা এই—সেই যুগের এক-একটি আদিম উপজাতির (ট্রাইবের) অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুল (ক্ল্যান) উদ্ভূত হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়—এইরূপ এক-একটি কুল কোনো জীবজন্তুকে, কিংবা বৃক্ষলতাকে নিজেদের আদিপুরুষ বা আদিমাতা বলিয়া জানে; হয়ত সেই কুলের জীবন-যাত্রায় খাদ্য বা সম্পদ হিসাবে ঐ প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী। অবশ্য তাহার পর হইতে সেই টোটেম-পিতা বা টোটেম-মাতা হইয়া যায় পবিত্রতম বস্তু আর তাই টোটেমের তাহা অভক্ষ্য। তাহার নামেই সেই কুলের পরিচয় হয়। আর কুলস্থ সকলে তাহার সন্তান-সন্ততি বলিয়া জাতভাই; তাহাদের পরস্পরে

তাই বিবাহ চলে না। শুধু তাহাই নয়, আসল পিতা এবং পিতৃ-পর্যায়ের সকলেই তখন হয় পিতা ('তাত' ?), মাতৃ-পর্যায়ের সকলেই মাতা। প্রথম দিকে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধই তাহার অভিজ্ঞতার জন্য এই টোটেমের নেতা বা কুলপতি নির্বাচিত হইত; এইসব অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের লইয়া টোটেমের পঞ্চায়েত বসিত। জন্মসূত্রেই অবশ্য টোটেমের লোক বলিয়া প্রত্যেকে নিজেকে জানিত; তবু যৌবনাগমে তাহাদের আবার টোটেমের নিজস্ব প্রণালীতে দীক্ষা না হইলে তাহারা পুরাপুরি টোটেমে গৃহীত হইত না। (দ্রষ্টব্য *What Happened in History*, Gordon Childe, P 41).

এই সমাজ-পদ্ধতিকেই বলে টোটেমিক সমাজ। উহার স্মৃতি কি আমাদের মধ্যে একেবারে লোপ পাইয়াছে? টোটেম বলিতে আমাদের হিন্দুদের 'গোত্রের' ('গোত্র' ও 'গোষ্ঠ' গো-ধন সম্পর্কিত এক একটি সমাজ-সম্পর্কের পরিচায়ক) কথা মনে পড়ে; টোটেমের জীবপিতার কথা বলিতে হনুমান, জাম্ববানদের কথা মনে পড়ে; আর বিবাহ বা দীক্ষার কথা বলিতেও উপনয়ন ও বিবাহের নানা আচার নিয়মের কথা মনে পড়ে।

এই সমাজ-গড়ন হইতে আমরা নিশ্চয়ই এই নিষাদ জীবনের মানসিক চিন্তাভাবনারও কিছুটা পরিচয় পাই। পবিত্রাপবিত্র, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, বিবাহ-উপনয়ন প্রভৃতি ধর্মনীতির ধারণা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের মন বুঝিবার মত আরও কিছু কিছু চিহ্ন আছে: উত্তর স্পেনে ও দক্ষিণ ফ্রানসে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে ম্যাগ্‌ডেলিয়ান কৃষ্টির যে সব চিহ্ন আছে (আল্‌তামিরা ও ফোঁ দ্য গ্যোম্‌-এ) তাহাতে দেখি গুহাগাত্রে ও অন্যত্র তাঁহাদের আশ্চর্য চিত্র-নৈপুণ্য। হাতিয়ার সুন্দর করিয়া গড়িতে দেখিয়া বুঝিতে পারি প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের মনে জাগিতেছে প্রথম সৌন্দর্যবোধ। উহার পিছনে সে কালের যাদুর তাগিদও ছিল—শিকারের প্রাণী ও মাতৃকা মূর্তির ('ভেনাস্‌'এর) এই জন্যই প্রাচুর্য বেশি। চিত্রিত মৃগয়া-দৃশ্যের যাদুশক্তি আছে; সেই যাদুর সাহায্যে দুর্লভ শিকারের পশুকে আয়ত্ত করা যায়; মাতৃকা-মূর্তি সুফলা ধরণীরই উদ্বোধক;—হয়ত এই সব ধারণা হইতেই তাহাদের গুহাচিত্রের ও এসব 'ভেনাস্‌' মূর্তির বিকাশ হয়। শিকারের উপর জীবন নির্ভর করে, শিকারের পশুর ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও মগ্ন। আর কী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ ও সত্যসন্ধ তাঁহার এই পশুজগৎ বিষয়ক দৃষ্টি!

আধুনিক কালের শিল্পীরাও নিষাদশিল্পীদের এইশিল্পকুশলতা ও এই দৃষ্টি-ক্ষমতার জন্য তাঁহাদিগকে নিজেদের আত্মীয় বলিয়া গণনা করিতে পারেন। তবু মনে রাখিতে পারি—উহা জীবনবিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চা নয়, জীবনের দায়ে জীবিকা-চর্চা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের 'ধর্মবোধ' বা 'মতাদর্শের' এক বিশেষ পরিচয় এই 'যাদুতে' (ম্যাজিক-এ)। অজ্ঞতা, ভয় আর বিস্ময় হইতে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই নিজের ভাগ্যবিধাতা, ভূত বা দেবতা বলিয়া সন্তুষ্ট করিতে চাহিত। এখনো অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাই 'ধর্ম'। সেই সন্তুষ্ট করিবার একটা প্রাচীন কৌশল যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র। জীবিকার প্রয়োজনে ও নিজ কামনার অনুরূপে মানুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে নাচে-গানে, নানা অনুকৃতি-মূলক কাজে জীবজন্তু, বৃক্ষলতাপাতা হইতে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে আপনাদের কবলে আনয়ন করিতে চাহিত। যেই ফল-লাভ তাহাদের অভীষ্ট, সেই ফল-লাভ যেন ঐ অনুকৃতি-মূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ত হয়; লক্ষ্য ও পদ্ধতি যেন অভিন্ন, এইরূপই সম্ভবত ছিল সে দিনের মানুষের ধারণা। হয়ত যাদুর নিয়ম-নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়া সত্যই মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তিরও এতটা উদ্বোধন ও অনুশীলন হইত যে, মানুষ সত্যই মৃগয়ায় বা জীবিকাযুদ্ধে এই ভাবে ক্ষিপ্রতর, কুশলতর এবং বিচক্ষণ শিকারী হইয়া উঠিত। জীবিকা-চর্চা হিসাবে নাচ-গান-চিত্র-নাট্য, নানা রীতিনীতি এইভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে এই যাদুকে আশ্রয় করিয়া। আবার যাদুই হয় একদিকে ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণের মূল; অন্য দিকে বৈদ্যের-ওঝার ঝাড়-ফুঁকের, মন্ত্র-তন্ত্রের ও ঔষধ-প্রলেপেরও মূল। পরে তাই এই যাদুকর—একাধারে যে মন্ত্রজ্ঞাতা পুরোহিত ও প্রাণদাতা বৈদ্য—অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারীও হইতে থাকিবে, তাহাও সহজেই অনুমেয়।

নব্য প্রস্তর যুগ

নূতন প্রস্তর যুগের কাল কম,—হাজার দশেক বৎসর পূর্বে তাহা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই সময়ে প্রস্তরাস্ত্র ক্রমশ মসৃণ ও সূক্ষ্ম হইল, এই সময়ে কুঠার আর তীর দেখা দিল; পাথর ঠুকিয়া আগুন জালিতে মানুষ আগেই (প্রথম যুগে) শিখিয়াছিল—তাহার সংস্কৃতির পক্ষে কম বড় কথা নয় সেই

আবিষ্কার। এই স্তরই মর্গ্যানের কথিত বারবারিজম—বর্বর জীবন কাল।

তারপরে হাজার পাঁচেক বৎসর পরে—হাজার সাতেক বৎসর হইল হয়ত—কৃষিবিদ্যা মানুষের আয়ত্ত হয়। ঘট ও পাত্র নির্মাণ চলিল, পশুপালনও আগে বা পরে শুরু হয়। শেষে সুতাকাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ হইল। এই সব কাজে মেয়েরাই ছিল মুখ্য। তাই মাতৃকর্তৃত্ব ছিল তখন স্বাভাবিক। এই হাজার কয় বছরের মধ্যে মানুষের সমাজ যে দুইটি নূতন রূপ পাইল, তাহার একটির বনিয়াদ ছিল পশুপালন, অন্যটির কৃষিকর্ম;—কোনোটিই আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই—শুধু অনেক সমাজে তাহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

পশুপালনের পরিণতি

পশুপালনের দিনে জীবিকা একটু সুস্থির হইল; সম্পত্তি জুটিতে লাগিল—গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, শূকর ইত্যাদি। —ইহাদেরই নাম আমাদের ভাষায় 'গোধন'। পার্বত্য ও মরু প্রদেশের মানুষদের চারণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাই সেরূপ মানুষ ছিল যাযাবর। ঘোড়া, উট প্রভৃতির আদর এইজন্য আরও বৃদ্ধি পায়। 'গোধন' বৃদ্ধি পাইলে একদিকে সমাজ বৃদ্ধি পাইল; পনের কুড়ি জনের পরিবর্তে দুশ তিনশ লোকও এক সঙ্গে এক কুলে (clan) বসবাস করিত; আর বংশ ও পশুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে পশুচারণের জন্য অন্যের জমি কাড়িয়া লওয়া দরকার হইত, তাই এই আর্থিক আত্মীয়কুল এক সঙ্গে মিলিয়া সামরিক উপজাতি বা কৌম (tribe) গড়িত; পরাজিতকে প্রথম প্রথম এই বিজেতারা হত্যা করিত; পরের দিকে তাহাকে হত্যা না করিয়া কাজে লাগাইল, করিল দাস। এই দাস ও পশুর ভাগাভাগি লইয়াই নাকি সম্পত্তির ভাগাভাগির সূত্রপাত। আদিম সাম্যতন্ত্র এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অন্যদিকে এই যুদ্ধবিগ্রহে ক্রমেই দেখা দেয় পিতৃকর্তৃত্বের যুগ। গোষ্ঠী-পিতাই কর্তা, সমাজের স্ত্রী ও শিশুরা তাহারই উপর নির্ভর করে। গো-মেষ পালনের জন্য প্রয়োজন মতো বহু স্ত্রী গ্রহণ চলে। ধর্ম আগে ছিল প্রকৃতিপূজা, ভূতপূজা, মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুর দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করিবার, বন্য জন্তুকে বধ করিবার কামনা-কল্পনা। পরে, কুল ও কৌমের যে ধর্ম ছিল আগে টোটেম-তাবু-গত, সেই ধর্মই হইল গোষ্ঠী-পিতার পূজা; পরের দিকে তাহারই প্রতিচ্ছায়ায় দেবতা হইলেন গোষ্ঠী-পতি (Lord of Hosts)। এইরূপে

জীবিকার উপকরণের অনুযায়ী হইল তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা; আবার সেই সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাদের মানস-দৃষ্টিতে।

কৃষির দান

ইতিহাসে এমন ঘটনা আর তৎপূর্বে ঘটে নাই—কৃষিকার্যের প্রচলনের মত বিপ্লবী ব্যাপার। পুরাতত্ত্ববিদরা তাই ইহাকে 'প্রথম বিপ্লব' বলেন। কৃষির আবিষ্কার হইয়াছিল যখন তখনো মানুষ "বর্বর জীবনের" স্তরে। ধাতু বিশেষে, কাঠের খুন্তি বা পাথরের কোদালি দিয়া জমি খুঁড়িয়া বীজ ছড়াইয়াই তখন চাষ চলিত। কিন্তু ক্রমে উহার বিস্তার হইল,—সমাজে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইল, মানুষ "সভ্য জীবনে" উত্তীর্ণ হইল। এই বিরাট পরিবর্তন প্রধানত ঘটিয়াছিল নব্য প্রস্তর যুগের শেষে উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপে, পূর্ব এশিয়ার বিশাল নদনদীর ধারে। তাই পরবর্তী কালে মিশরের নীল নদ, ইরাকের টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী, চীনদেশে হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং, আর ভারতবর্ষে সিন্ধু নদীর তীরে সভ্য জীবনের প্রথম পৌরকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সেই সব সভ্য-সমাজের সাধারণ নাম—'এশিয়াটিক সমাজ।' কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের শেষে মানুষ পশুপালন ও কৃষিকর্ম আয়ত্ত করিয়া এই ঈষদুষ্ণ মণ্ডলের এক-একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসিল, 'গৃহস্থ' হইল। জমি হইল তাহার সম্পত্তি, অবশ্য পশুও আছে। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন সেচের, অর্থাৎ বৃষ্টির কিংবা নদীর; তাই ইন্দ্র—দেবশ্রেষ্ঠ, নাইল—দেবতা, গঙ্গা—দেবী। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পূর্বযুগে ছিল 'ভূত; ক্রমে তাহারা 'দেবতার' আসন দখল করিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পূর্তবিদ্যারও পত্তন হইল, আর কৃষির 'খন্দ' বুঝিবার দায়ে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার বা জ্যোতির্বিদ্যারও সূচনা হইল। কৃষির প্রথম দিকেও অবশ্য এই জমিজমা সবই ছিল 'জিন্' বা 'জনের' সম্পত্তি; 'জন' বলিতে বুঝাইত এক একটা গোষ্ঠীকে, আর 'জনপদ' বলিতে এক এক গোষ্ঠীর বাসভূমি। তখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াই জীবন যাপন করিত, সব সাধারণ-সত্ব। প্রথমদিকে বিবাহও হইত অনেক স্থলে গোষ্ঠীগত—এক গোষ্ঠীর মেয়ে মাত্রই হইত অন্য গোষ্ঠীর স্ত্রী। অবশ্য ইহারও অনেক রকমফের হইত তাহা বলাই বাহুল্য। জমির বিভাগও ক্রমে বৈষম্যের সৃষ্টি করিল,

আদিম সাম্য-তন্ত্রের দিন ফুরাইল। উহাতে আর মানুষের জীবিকোপায় তখন পরিপুষ্ট হইতেছিল না—প্রত্যেকের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দীর্ঘ নব্য প্রস্তর যুগ ব্যাপিয়া নানা কেন্দ্রে মানবের জীবন-যাত্রা অবশ্য বিবিধ রূপ হাতিয়ারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিল, আর নানা পর্বে সেই বিবিধ কেন্দ্রের বিবিধ কৃষ্টিও আবার নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তবু নব্য প্রস্তর যুগের প্রথমার্ধে 'বর্বর জীবনের' মোটামুটি একটা রূপ ছিল বলা যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে মিশরের নীলনদের তীরবর্তী ফায়ুম্, মেরিম্‌দে প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে এশিয়া মাইনরের রাস্ শাম্‌রা, ইরাকের নদীউপকূলস্থ নিনেভা, সাম্‌রা, সুসা, উর প্রভৃতি কেন্দ্র, এবং ইরাণের তুর্কিস্থানের সিয়াল্‌ক, হিসসার ও সিন্ধুনদতীরের হরপ্পা, মোহেন্‌জোদড়ো প্রভৃতি কেন্দ্রের দিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রধান প্রধান মনুষ্য বসতিগুলি বিস্তৃত ছিল, ইহা বলা যায়। আর ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে (তাম্রযুগে) সেই সব কেন্দ্রে বর্বর জীবন মোটামুটি আর একটা নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল,তাহাও বুঝা যায়। মানুষের কৃষ্টির যে পরিচয় আমরা এই নব-প্রস্তর যুগে পাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার একবার হিসাব লওয়া উচিত।

'নব্যপ্রস্তর যুগের' বর্বর-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যখন প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের মত সামর্থ্য লাভ করিল—কৃষি, পশুপালন উহার কারণ। তাহাতেই ঘটনির্মাণ, বয়ন প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তির উদ্ভব হয়; আর সেই সূত্রে আবার সেই আদিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কারুবিদ্যারও জন্ম-সম্ভাবনা ঘটে। পাথরের বা গাছের ডাল দিয়া 'জুমের' মত চাষ (লাঙ্গল তখনো আবিষ্কৃত হয় নাই), টেকোয় সুতা কাটা, কাপড় বোনা, মৃৎপাত্র নির্মাণ—জীবিকার এই প্রধান কাজগুলি তখনো ছিল স্ত্রীলোকের হাতে; পুরুষেরা প্রধানত করিত শিকার ও গোচারণ। তাই তখন জীবনেও স্ত্রীজাতি প্রাধান্য খোয়ায় নাই। সে যুগের চিন্তা ভাবনার কিছু কিছু আমরা সন্ধান পাই। তাহাদের শব-সমাধিতে তখন আরও বিধিনিয়ম আড়ম্বর বাড়িয়াছে। মাতৃকামূর্তিগুলিও নিশ্চয়ই শস্যপ্রসবিনী পৃথিবীরই যাদু-প্রতীক। যাদু এইরূপ আরও অনেক দিকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জীবিকা-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গ্রামগুলি ছাড়িয়া নূতন গ্রামের পত্তন হইতেছিল। প্রথম দিকে মনে হয় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর, মোটামুটি তাহার শান্তিও অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু ইহার পরেই দেখি যুদ্ধাস্ত্রের প্রাচুর্য—বুঝিতে পারি যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয়

ও দাসত্ব দেখা দিয়াছে (দ্রঃ Neolithic Barbarism, '*What Happpened in History*', pp. 38).

ধাতুর আবিষ্কার—তাম্র যুগ

'নব্য প্রস্তর যুগ' শেষ হইয়া গেল ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে—পাথরের প্রহরণ যন্ত্রপাতি লোপ পাইল না, অনেক জিনিস রহিয়া গেল, কিন্তু ধাতব যন্ত্র ও অস্ত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। সেই বিপ্লবে বর্বর জীবনের প্রথমার্ধের অবসান হইল, আরম্ভ হইল দ্বিতীয় পর্বের 'উচ্চতর বর্বর জীবনের' পালা। ইহার মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইবে প্রথম 'পৌর সভ্যতা'; তাম্র ও ব্রোঞ্জ, ও পরে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) লৌহ যখন প্রচলিত হয় তখন এই পৌরসভ্যতা অগ্রসর।

খুব বেশি দিন নয়, হাজার ছয় বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের কাছাকাছি) নিকট প্রাচ্যে প্রথম আবিষ্কার হইল তামার, পরে ব্রোঞ্জের প্রয়োগ—তামার হাজার দেড়েক বৎসর পরে আসে ব্রোঞ্জ (তামা ও টিনের মিশ্রিত ধাতু)—এই দুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও পরিবর্তন ঘটিবেই। তামা ও ব্রোঞ্জের বস্তু বিশেষজ্ঞ কারিগরেই নির্মাণ করিতে পারে—অন্যেরা নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য চাষ করিয়া, শিকার করিয়া, পশু পালন করিয়া খাদ্য জোগাইত। এই কারিগরদেরও যাদুকর বলিয়া মান ও সম্মান থাকা স্বাভাবিক; আর খনি হইতে এই ধাতু তুলিতে, চুল্লীতে গালাইতে, ঢালাই করিতে, খাদ মিশাইতে, গড়িয়া পিটিয়া হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে শুধু বুদ্ধি আর ধাতুবিদ্যার জ্ঞান নয়, নানা নূতন যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন হইয়া পড়িল, এবং এই ধাতু যখন একবার আবিষ্কৃত হইল তখন তো ক্রমেই নূতন হইতে নূতনতর যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। চাষে, বস্ত্রবয়নে তো উহা লাগিলই। ক্রমে এই বহু বহু যন্ত্রপাতির কারিগররূপে দেখা দিল সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর, লোহার, খোদাইকার, চর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি; অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমাজে পরস্পরের উপর নির্ভরপরায়ণতা অপরিহার্য হইল। ধাতব যন্ত্র ব্যবহারের এই প্রথম দিককার হাজার বৎসরকে তাই পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন বর্বর জীবনের "দ্বিতীয় বিপ্লবের" যুগ। অন্য দিকে কাঠের লাঙ্গল আবিষ্কারে ও কুম্ভকারের 'চক্র' প্রচলনে কৃষিতে ও মৃৎপাত্র

শিল্পে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য কমিয়া গেল—পুরুষ ক্রমেই জীবনযাত্রায় সর্বে-সর্বা হইয়া উঠিল। ইহা ছাড়াও আবিষ্কৃত হইয়াছিল গো-যান, পালের নৌকা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি যানবাহন। যে শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই শুরু হইয়াছিল জীবিকোপায়ের উন্নতি হইতে তাহা এই ব্রোঞ্জ যুগে সুস্পষ্ট হইল—আদিম সাম্যবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এই সময় নিঃশেষ হইল। 'সভ্য জীবনের' প্রারম্ভ হয় পশুপালন, দাসদাসী, জমি, যন্ত্রপাতিতে পরিবারগত সত্ব ও এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ লইয়া।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ

পশুপালন ও কৃষিকর্মের ফলে যেমন পশু, শস্য, যন্ত্রপাতি, জমির তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়িল। চাষের সুবিধার জন্যই এক-এক খণ্ড বিশেষ বিশেষ জমি এক-এক গোষ্ঠীর হাতে গেল, পরে গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া তাহাও পরিবারের হাতে থাকিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে সেই পশুর ও দাসদের ভাগাভাগি পাকা হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে তখন তাঁতে আবার বস্ত্র বয়ন শুরু হইয়াছে। ধাতব দ্রব্য গালাইয়া নূতন নূতন অস্ত্র ও অলঙ্কার তৈয়ারী হইতেছে, অর্থাৎ গৃহ-শিল্পের সূচনা হইতেছে। আর যাহারা দরিদ্র হীনাবস্থ তাহারা ওইসব অস্ত্র, যন্ত্র পায় না। পশুপালন, কৃষিকর্ম ও কুটির-শিল্প—এই সবের জন্য ক্রমেই আবার দাসদের উপযোগিতা বাড়িল। তবু দরকার হইল শ্রম-বিভাগ,—কারণ কৃষির ও পশুপালনের উন্নতিতে উৎপাদন বাড়িয়াছে, সকলের সব কাজ করা দরকার নাই। এবং কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী যখন দেখা দিল, তখন উৎপাদন-শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, আর এইরূপ শ্রম-বিভাগের সঙ্গে শ্রেণী-বিভাগও আরও পাকা হইয়া উঠিতে লাগিল। কৌম বা গোষ্ঠীগত অধিকারে আর চলে না; তাই সম্পত্তি পরিবারগত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন পর্যন্ত জমি ও উৎপন্ন তবু পরিবারগতই ছিল, ব্যক্তিগত বলিয়া গণ্য হয় নাই।

এই পরিবারের আবির্ভাব মানুষের মানসিক জীবনেরও একটা বড় ঘটনা। আজও আমরা পারিবারিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিত্রতম সম্পর্কের কথা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মূলত ইহার আবির্ভাব সমাজের আর্থিক পরিবর্তনে, একটা আর্থিক বিন্যাসের তাগিদে। সন্তানের জন্য

মায়া স্তন্যপায়ী জীবদের জননীর পক্ষে প্রায়ই একটা জৈবিক ধর্ম ;—কিন্তু তাহাদের জনকের পক্ষে তাহা সত্য নয়। এই জননীর কৃপায় মানব-শিশুর জীবন সম্ভব হয় ; মানব-মাতাও এই শিশুর মায়ায় বশ। সেই কারণেই নারী একদিন ছিল কর্ত্রী। প্রাচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ-প্রধান সমাজ। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগে নারী আর আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইল। এই ভাবেই হইল মানব-শিশুর পিতৃ-পরিচয় ও পিতৃ-স্নেহের সূচনা, আর নারীরও কর্ত্রীত্ব হইতে ধীরে ধীরে অধোগমন। পরিবার সৃষ্টি হইলে এইবার স্ত্রীরা গৃহলক্ষ্মী হইল, অর্থাৎ গৃহাবদ্ধ হইল। যুদ্ধবিগ্রহ, হলকর্ষণ ও ধাতুশিল্প পুরুষ-সাধ্য কঠিন কর্ম, অন্যদিকে শ্রমবিভাগের বিস্তৃতিতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৃত্তিধারীও দেখা দিয়াছে। ঐসব পরিশ্রমের কাজে তখন নারীর স্থান হইয়াছে গৌণ ; সংসারেও তাই তাহাদের স্থান গৌণ হইয়া পড়িল —প্রধান কাজ হইল ঘরকন্না করা আর সন্তান ধারণ ও পালন করা। বিবাহও এইবার অনেকটা পরিচিত রূপে দেখা দিল। তাহার একটি প্রধান কারণ এই : সম্পত্তির সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথা উঠে—তাহা কে পাইবে ? এইখানে সন্তানের দর বাড়িল। ফলে তাহার মাতার সঙ্গে পিতার সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী হইল ; বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্করূপে দেখা দিল। অবশ্য তখনো সম্পত্তি পরিবারগত, ব্যক্তি-গত নয় ; তাই বিবাহ এই প্রথম স্তরে কখনো কখনো পরিবারগত ছিল—এখনো কোথাও কোথাও তাহাই আছে। আর বহুবিবাহও ছিল, বিবাহবিচ্ছেদও ছিল।

এদিকে যখন কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল শিল্প তখন ধীরে ধীরে জিনিসপত্রের বিনিময় শুরু হইল। দেখা দিল কেনা-বেচা, লেন-দেন, পণ্যের উদ্ভব ;—বর্তমান যুগের উৎপাদনের যাহা সব চেয়ে বড় লক্ষণ সেই পণ্যজাত এই ভাবেই সমাজে প্রথম আসিল। এই বিনিময়ের কাজটা সরাসরি এখনো এদেশের কোথাও কোথাও চলে। কিন্তু গোধন, কার্ষাপণ হইতে টাকা পয়সা আর নোট ও চেকের যুগও আজ এদেশে আসিয়া গিয়াছে।

ইহার পরের স্তরগুলিও এই শ্রমবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের

মধ্য হইতে ক্রমাগত ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বহিঃশত্রু হইতে রক্ষার তাগিদে পরিবারগুলি ঐক্যবদ্ধ হইত; clan, কুল একত্র হইত tribe, উপজাতি বা কৌমে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহারা চাহিল নেতা, যাদুশক্তির (ধর্মের) প্রয়োজনে চাহিল পুরোহিত। অনেক প্রাচীন দেশেই এরূপ বিভাগ ছিল, কিন্তু কোন কোনোখানে এইরূপে সৃষ্টি হইল চাতুর্বর্ণ্য—একবারে ইস্পাত-মোড়া শ্রমবিভাগ। শ্রেণীবিভাগকে তাহা পাকা ও অনড় করিয়া রাখিতেছে। কিন্তু সবখানেই ধীরে ধীরে দেখা দিল এক ক্ষাত্রশক্তি—যুদ্ধ যাহার কাজ; আর পুরোহিতশক্তি—সেকালের গোষ্ঠীগত বিধি-নিষেধ, 'টোটেম', 'তাবু' হইতে মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত 'ধর্মগত' রহস্যের যে ছিল সংরক্ষক,—সে-ই আবার কখনো পুরোহিততান্ত্রিক সমাজে ব্রাহ্মণ্য-শক্তিও হইয়া উঠিত। আবার প্রাচীন মিশরের মত অনেক দেশে এই পুরোহিত শক্তিই হইতেন শাসক। ঐ শাসক শ্রেণী হইতেই উদ্ভূত হইলেন রাজা। অর্থাৎ এইবার রাষ্ট্রের জন্ম। বৈশ্যদের অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের স্থান তখনো ইহাদের নিম্নে। কারণ, তখনো বিনিময় সমুদ্রতীরের দেশে (এশিয়া মাইনরে ও পশ্চিম ভারতে) ছাড়া তত প্রভাব বিস্তার করে নাই। অন্যান্য বৈশ্য উৎপাদকেরা, বৃত্তিজীবীরা প্রাচীন গ্রীসে ছাড়া উৎপাদন-প্রথায় মুখ্যস্থান অধিকার করিতে পারে নাই—ভারতবর্ষেও না, রোমেও না। আসল প্রভুশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোহিতেরা, বণিকেরা এই পর্যায়ের নিচে,—তাহাদেরই সহযোগী, কিন্তু স্বশ্রেণীর নয়। ক্রমে পরাজিত বন্দী ও শোষিত দাসদের কাজ হইল এই তিন শক্তির সেবা, অর্থাৎ পরিশ্রম ও খাদ্য উৎপাদন; আর সমাজশীর্ষে প্রভুশক্তির কাজ হইল তাহা ভোগ করা; আর ক্ষাত্রশক্তির কাজ পররাজ্য লুণ্ঠন, গোধন কাড়িয়া লওয়া, ইত্যাদি। একদল পরিশ্রম করিবে অন্য দল তাহার ফল ভোগ করিবে,—সমাজের মধ্যখানে এই একটা দারুণ বৈষম্য ও বিরোধিতার সম্পর্ক এইরূপে আদিম সাম্যবাদ ভাঙিয়া 'সভ্য সমাজের' যুগে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে স্থায়ী হইয়া উঠিল।

শ্রেণী সংঘর্ষ

'সভ্য জীবনের' ('আদিম সাম্যবাদের' শেষ ও 'দাসপ্রথার' প্রারম্ভ) সময় হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস এই শ্রেণীবৈষম্যের ইতিহাস—

—যেখানে একদল ক্ষমতাশালী পরশ্রমভোগী বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর শ্রমের উপরে জীবন যাপন করে। আমাদের পরিচিত সভ্যতার বনিয়াদ এই কঠিন সত্যের উপর স্থাপিত। একথা যাঁহারা সভ্যতায় বা সমাজে শ্রেণী-বিলোপ বা সাম্যবাদ মানেন না তাঁহারাও স্বীকার করিয়া ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি বলিতে পারি: "মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। ...তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

রাষ্ট্রের স্বরূপ

সভ্যসমাজ, শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের জন্ম-সম্ভাবনা অবশ্য হইয়াছিল কৃষির আরম্ভ হইতেই; নব্যপ্রস্তর যুগ ছাড়াইয়া তাম্রযুগে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সে সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কৃষি-প্রধান গ্রাম ও জনপদগুলিতে শ্রম-বিভাগের দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইলে 'সভ্যতার' যুগ আসিতে থাকে। যতই এই সভ্য সমাজ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ ততই পাকা হইতে লাগিল, শাসক ও শাসিত শ্রেণী দেখা দিল, —অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক শাসন-যন্ত্রটির উন্মেষ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, শ্রেণীভেদের ফলে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব, শাসিত শ্রেণীকে দমন রাখাই উহার প্রধান ও মূল কাজ; হিংসার উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি; সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী রাষ্ট্রেরও রূপ প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত হয়; রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এইরূপ নানা তন্ত্রে শাসক শ্রেণী নিজ শ্রেণীস্বার্থই সিদ্ধ করে;—কিন্তু যদি শ্রেণীভেদ দূর করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হয়—তখন শাসক ও শাসিত থাকিবে না। তাহা হইলে দমনমূলক, হিংসামূলক এই পীড়নযন্ত্রেরও আয়ু ফুরাইবে, —সেই সাম্যবাদী সমাজ পরিচালনা করিবে তাহার উৎপাদক জনগণ সমাজের প্রয়োজনানুরূপ পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিয়া।

সভ্য-সমাজ ও যুগ-বিভাগ

প্রথম সভ্যসমাজের উন্মেষ হয় প্রধানত আফ্রিকা এশিয়ার বিশাল নদীতীরগুলিতে—দক্ষিণ ইউরোপের 'উচ্চতর বর্বর-জীবন' এই স্তরে উন্নীত হইবার সুযোগ তখন পায় নাই। কারণ, সমাজ-বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র সমান গতিতে সমছন্দে হয় না, কেহ আগাইয়া যায় কখনো, কেহ পিছাইয়া পড়ে। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ ধাপ হইতে যাহারা তাম্রযুগে অগ্রসর হইয়া গেল তাহাদের প্রধান কেন্দ্রগুলি আফ্রিকার মিশর হইতে নিকট প্রাচ্যের পূর্ব-উত্তর ইরাণ ও তুর্কিস্থান এবং সিন্ধু ও উত্তর পাঞ্জাবের মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই অঞ্চলের নদীর উর্বর উপকূল, বন্যার জল, পলিমাটি, নাতিশীতল আবহাওয়া কৃষির অনুকূল; সেচ-ব্যবস্থায় তাহা আরও উর্বর হইল। ইহারই মধ্যে মিশরে নীলনদের ধারে, ইরাকের ইউফ্রেতিস্ ও টাইগ্রিসের তীরে তীরে দেখা দিল প্রথম সভ্য-সমাজ প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্বে। সম্ভবত ইরাকের এই 'দোয়াবে' তাহার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে; বাইবেলে সে দেশের নাম শিনার; সেখানে দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি বাস ছিল সুমের জাতির, আর উত্তরে আরব হইতে আগত সেম গোষ্ঠীর আক্কাদ জাতির। ইহারাই প্রাচীনতম সভ্য-সমাজের পত্তন করে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতাও প্রায় ইহাদের সমসাময়িক। একটু পরেই (প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২,৫০০) সিন্ধুনদের তীরে ইহার অনুরূপ সভ্যতার সন্ধান পাই মোহেন-জো-দড়ো হরপ্পায়; প্রায় তেমনি সময়ে চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী দুইটির তীরেও দেখি এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাশ লাভ করিতেছে। অবশ্য স্থান কাল অনুযায়ী প্রত্যেক কেন্দ্রেই উপকরণ, উৎপাদন ও রীতিনীতির রকমফের থাকিবার কথা, তাহা ছিলও; কিন্তু মোটামুটি তবু এই সভ্য-সমাজের রূপে মিল দেখা যায়। এই সাধারণ লক্ষণ দেখি—ইহাদের সকলের সেচ-ব্যবস্থায় ও হল-কর্ষণে; ইহাদের পৌর জীবনে ও ইটপাথরের বাসগৃহে; সমাজে কারিগর, মিস্ত্রি, পুরোহিত, রাজা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায়; ধাতুবিদ্যা ও মৃৎপাত্রের উন্নতিতে; জিনিসপত্রের বিনিময়, আমদানী-রপ্তানি ও তুলাদণ্ডের প্রচলনে; পালের নৌকা ও চক্র-চালিত রথের ব্যবস্থায়; এবং শীলমোহর ও লিপির উদ্ভাবনায়। এই সকলে দেখি সেই সভ্যতার প্রারম্ভ কালের রূপ।

এই আফ্রিকা এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্য-সমাজের সাধারণ নাম 'এশিয়াটিক সমাজ'।

'তাম্রযুগ' পিছনে ফেলিয়া এশিয়াটিক সমাজ 'ব্রোঞ্জের যুগ' আরম্ভ করে; খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ উহার প্রসার কাল। তাহার পর সে নাগাল পাইল লৌহ যুগের। সর্বাগ্রে আমানিয়ার মিতান্নিতে কোনো এক অখ্যাত আর্যভাষী শাখা উহা আবিষ্কার করে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ শতাব্দের দিকে)—সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-বস্তুর ও উৎপাদন-প্রথারও দ্রুত পরিবর্তন হইল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের পূর্বেই 'সভ্য-সমাজ' আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসে তখন হইতে উহার সুসংবদ্ধ লিখিত কাহিনী মিলে। তাই সভ্যসমাজের আরম্ভ হইতে আর উপকরণ দিয়া যুগ বিভাগের প্রয়োজন থাকে না। কেহ কেহ ভাগ করেন তাহা সুমের, মিশর প্রভৃতি দেশ বা জাতির নাম দিয়া; কিন্তু সমাজ-বৈজ্ঞানিক যুগ বিভাগ করেন উৎপাদন প্রথার বিপ্লব-বিবর্তন অনুযায়ী। তাই সেই আদিম মনুষ্য সমাজ হইতে আজ পর্যন্ত জীবিকা উৎপাদনের পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের ইতিহাসে পাঁচটি প্রধান যুগ দেখিতে পাওয়া যায়:

১। আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ:—প্রধানত, 'সভ্য-জীবনের' উদ্ভবের পূর্বেই প্রায় উহার অবসান হইয়াছে: নিষাদ জীবন ও বর্বর জীবনেই উহা সীমাবদ্ধ ছিল।

ইহার শেষে 'এশিয়াটিক সমাজে' উদ্ভূত হয় এক ধরণের প্রাচীন সামন্ত-তন্ত্র; আর ভূমধ্যমণ্ডলে উদ্ভূত হয় দাসপ্রথা।

২। দাস-প্রথার যুগ:—দাসদের উৎপাদনেই তখন মুখ্যত সমাজ চলিত। গ্রীস রোমের সমাজের বনিয়াদ ছিল মোটের উপর এইরূপ দাসপ্রথা। অবশ্য ইহার রকমফের আছে। আর ভারতীয় প্রাচীন সমাজে দাস প্রথা উৎপাদনের মুখ্য ব্যবস্থা ছিল কিনা তাহা সন্দেহস্থল।

৩। সামন্ততন্ত্রের যুগ:—ইহারই অন্য নাম বলা হয়, 'ক্ষুদ্র কৃষকতন্ত্র ও ক্ষুদ্র বণিকতন্ত্রের' যুগ, ঐরূপ উৎপাদন উহার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

৪। পুঁজিতন্ত্রের যুগ:—যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে ইহার প্রারম্ভ ও প্রসার। পুঁজিদারের মুনাফার জন্য মজুরের দ্বারা পণ্য উৎপাদন ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৫। সমাজতন্ত্রের যুগ:—উৎপাদন-যন্ত্র এই প্রথায় সমাজের ও সর্ব-সাধারণের সম্পত্তি, পুঁজিদারের মুনাফা জোগানোর হাতিয়ার নয়।

'এশিয়াটিক সমাজ'

সমাজ-বৈজ্ঞানিকের এই যুগ-বিভাগ মোটামুটি সত্য হইলেও যে-কোনো সভ্য-সমাজকে যেমন করিয়া হউক এই ছকে ফেলিয়া দিতে গেলে তাহা বৈজ্ঞানিক কাজ হইবে না। তাই কি দাসতান্ত্রিক উৎপাদন, কি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন, উহারও রকমফের আছে। বিশেষত মধ্যযুগ পর্যন্তও যানবাহন ও আদানপ্রদানের সূত্রে সভ্যতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে যোগাযোগ একালের মত এত ঘনিষ্ট ছিল না; নানারূপ বৈচিত্র্য ও পার্থক্য তখন একই স্তরের সভ্যতারও নানা কেন্দ্রে সুস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক; পুঁজিতন্ত্রের যুগ হইতেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সেই পার্থক্যেরও মাত্রা কমিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানত ইউরোপীয় মণ্ডলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আদিম সাম্যবাদের পরেই গ্রীস-রোমের দাসতান্ত্রিক উৎপাদন হইতে গণনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যখানে সভ্যতার প্রথম প্রারম্ভ হয় সুমের-আক্কাদ, প্রাচীন মিশর, সিন্ধু-উপত্যকায়, (ও চীনে); তাঁহারা ইহারই নাম দিয়াছেন 'এশিয়াটিক সমাজ'। কিন্তু এই সমাজকে দাসতন্ত্রী সমাজ বলা সম্ভব নয়, বরং উহাকে এক ধরণের প্রাচীন সামন্ত প্রথা বলাই শ্রেয়ঃ। মধ্যযুগের ইউরোপের 'ফিউডাল সমাজ' (মোটামুটি খ্রীষ্টাব্দের ১০০০-১৫০০ পর্যন্ত) হইতে এই প্রাচীন সামন্ত সমাজের কিছু পার্থক্য থাকিলেও মিলও অনেক।

'এশিয়াটিক সমাজের' মোটামুটি রূপটা কি, তাহার আভাস আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার উৎপাদনের ধাতব উপকরণ (তাম্র, ব্রোঞ্জ—টিন ও তামার মিশাল ধাতু, যেমন দস্তা,—লৌহ) ব্যবহার হইতে ও তাহার সভ্য জীবন-যাত্রার পরিচয় হইতে। একটা বড় কথা, এই সভ্যতা পৌর-সভ্যতা, এরেক্, এরিদু, লাগাস্ এবং উর প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি জনসংখ্যায় ও আয়তনে গ্রাম নয়, রীতিমত 'নগর' বা পুর। গ্রাম জনপদের যুগ ইহা কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাই ইউরোপীয় ভাষায় ইহা 'সিভিলিজেশন'। গোড়ায় এ সমাজের কল্পিত কর্তা ছিলেন পুরাধিষ্ঠাতা দেব-দেবী; পুরবাসী সকলে যেন তাঁহারই পরিবারভুক্ত। তাই মন্দিরই তখন জীবন-কেন্দ্র। কিন্তু দেবতার মুখপাত্র হইতেন মানুষ, তিনিই প্রধান, আর তিনিই হইতেন প্রভু। খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার অব্দের কাল হইতে ইহাদের লিপিচিত্রের কাহিনীর পাঠোদ্ধার হইয়াছে—অর্থাৎ লিখিত

ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া লাগাস্‌-এর বাউ-দেবীর জমিজমা হিসাবপত্রই বেশি পাই। খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দের দিকে দেখা যায় সুমের ও আক্কাদে খণ্ড খণ্ড পৌররাজ্য ছিল, উহার স্থানীয় প্রধান বা রাজাও ছিল, ইহাদের নাম ইশাক্কু। ইহারা একাধারে এই সব জমিদার ও পুরোহিতদের নেতা। ইশাক্কু ছাড়া পুরোহিততন্ত্রও ছিল প্রবল। চাষীদের নিকট হইতে ইশাক্কু রাজস্বরূপে শস্যের সপ্তমাংশ আদায় করিত; আর রাজ্যের বাঁধ খাল, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাষীদের বেগার খাটাইত। এই আদায় উশুল করিবার জন্য ও বেগার খাটাইবার জন্য নিয়োগ করিত এক ধরণের কর্মচারী—হয়ত তাহারা বেতনভুক। ইহা ছাড়া হিসাবপত্রের জন্য (অঙ্ক ও লিপিচিত্র দেখা যায়) ও লিখিবার জন্য কেরাণীও ছিল। আর মন্দিরের ও প্রাসাদের সঙ্গে থাকিত তাহাদের আশ্রিত কারিগর—হয়ত মধ্য যুগের কারিগরদের মতই। অবশ্য দাস ছিল, তাহারা গৃহকর্ম করিত; প্রভুদের জমি চাষ করিবার জন্য প্রভুর যাহাদের কাজে লাগাইত তাহারাও ছিল দাসের সামিল। কিন্তু সমাজের প্রধান গঠন প্রভু-দাসের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বলা চলে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্রের অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বিনিময় হইত; তাই ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণীরও এইসব দেশে উদ্ভব হয়। কিন্তু বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রস্তুত করা তখনো নিয়ম হইয়া উঠে নাই। আর এই বণিকেরাও ছিল প্রভুশ্রেণীর আশ্রিত; ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রধানত প্রভুরাই ভোগ করিত। এই সমাজ-ব্যবস্থাকে 'রাজস্বভোগী রাষ্ট্র' বলা হয়, কিন্তু ইহাকে 'সামন্ত তাঁবেদারি' ("ভ্যাসালেজ্‌") ব্যবস্থা বলাই বোধহয় আরও শ্রেয়ঃ। আর এই ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্যই হইল স্থাণুত্ব। দেবতা বা দেবতার প্রতিনিধি-রূপে রাজা ও পুরোহিতে মিলিয়া এই শাসক-শাসিতের সমাজকে অচলায়তন করিয়া তোলে। তাই সুমের ও আক্কাদে নানা শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যেও এই কাঠামো বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। ছোট ছোট রাজ্য ভাঙিয়া যখন সুমের-আক্কাদে শারুকিন (বা সারগোন্‌) নামক একজন নেতা সম্রাট হইয়া বসিল (খ্রীঃ পূঃ ২৮৭২-২৮১৭) তখনো আসলে সমাজ রূপান্তরিত হইল না, ইহার পরে কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটিল—কিন্তু তাহাতে কি? কত সম্রাটের কত কীর্তি-কলাপ, জয়-পরাজয়ে সুমেরের পৌর সভ্যতা প্রসারিত ও গৌরবান্বিত হইল;—পশ্চিমে মিশর ও পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এই সভ্যতার

আদান প্রদান চলিল; —সিন্ধু উপত্যকার শীলমোহর, মৃৎপাত্রাদি চিহ্ন এই কালের (খ্রীঃ পূঃ ২,৬০০-২,১০০) সুমের নগরীতে পাওয়া যায়। তারপর খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের কাছাকাছি খাবিলন নগরীর প্রধানরা এই সুমের সাম্রাজ্য আয়ত্ত করিল, এই অঞ্চলের নাম হইল তখন 'বাবিলনিয়া'; আরও হাজার খানেক বৎসর পরে উত্তরের পাহাড় হইতে দুর্ধর্ষ আসিরীয় রাজারা লৌহাস্ত্রে ও সৈন্যবলে বিজয়ী হইয়া এই অঞ্চলের সম্রাট হইয়া বসিল; পারস্য হইতে মিশর পর্যন্ত ছিল তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত। শত দুই বৎসর পরে আর একবার স্বাধীন বাবিলানিয়া শত খানেক বৎসর নূতন সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ইহারই নাম 'কালডিয়া সাম্রাজ্য'। আর তাহার পরে আসিল কাইরাসের প্রতিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্য। খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে সেই পারস্য সাম্রাজ্যও গ্রীক সম্রাট আলেকজেন্দার অধিকার করিলেন;—প্রাচীন 'এশিয়াটিক সমাজের' প্রধান প্রধান কেন্দ্র তখন ভাঙিয়া গেল। কিন্তু এই চার হাজার বৎসরে এত রাজা রাজড়ার পরিবর্তনে সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' মৌলিক কোনো রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় যায় না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির প্রাসাদ, পূর্ত বিদ্যার উন্নতি, সময়ের হিসাব, বারো মাসে বছর, সাতদিনে সপ্তাহ, বারো ঘণ্টায় দিনের পরিমাপ;—গ্রহ নক্ষত্রের জ্ঞান, অঙ্ক ও হিসাব, আর লিপিচিত্রের পরিবর্তে ফিনিসিয়ার উদ্ভাবিত আক্ষরিক লিপির প্রচলন—অন্যান্য পরবর্তী সভ্যতা সুমেরের এইসব কীর্তি বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু পূর্বাপর সেই সামন্তপ্রথাই সুমেরীয়দের মধ্যে এই চার হাজার বৎসর বলবৎ রহিয়াছে—সম্রাটেরা দুর্বল হইলে ছোট রাজারা সম্রাটকে বিব্রত করিত বা পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহে মাতিত, জনগণকে উৎপীড়ন করিত; আর সম্রাট সবল হইলে শোষণ কেন্দ্রীভূত হইত; পুরোহিত, মালিক ও বণিকদের স্বার্থকে তিনি নিজের আশ্রয়ে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেন, কোন সময়েই কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো প্রকৃত পরিবর্তন হয় নাই, শোষণ প্রথার কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নাই।

সুমেরের সমসাময়িক মিশর, আর তাহার অপেক্ষা সামান্য কনিষ্ঠ হইলেও তাহার সমজাতীয় সভ্যতা মোহেন-জো-দড়ো হরপ্পার সভ্যতাও (দ্রষ্টব্য ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা, আদিপর্ব, উহাতে তাহার উল্লেখ করা হইল)।

মিশরের কীর্তি-কাহিনী কিন্তু আরও বিস্ময়াবহ—তথাপি প্রাচীন মিশরের সামাজিক ব্যবস্থা ও ইতিহাস আসলে এই 'এশিয়াটিক সমাজের'ই একটা রকমফের—সুমেরের সমসাময়িক ও সমতুল্য। হাজার সাতেক বৎসর

পূর্বে মিশরের সভ্যতার উন্মেষ হইতে থাকে নীলনদের তীরস্থিত ফায়ুম, মেরিমেদি প্রভৃতি কেন্দ্রে—তখনো 'বর্বর-জীবন' শেষ হয় নাই। সভ্য জন-সমাজের প্রারম্ভকালে ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য এখানেও ছিল। জীবনযাত্রার দিক হইতে তবু এখানে বিশেষ লক্ষিত হয় দুইটি জিনিস:— টোটেমিক জীবন,—অর্থাৎ আদিপুরুষের বা আদিমাতার ধারণা—তাহার নামে গোত্র বিভাগ; এক একটি কেন্দ্র বা শহর ছিল এইরূপ গোত্রের বাসভূমি। সেই আদিমাতা বা আদিপুরুষ তাই সেখানে আদিদেব হয়। প্রাচীন মিশরও প্রায় দেবতার দেশ হইয়া উঠে অর্থাৎ দেশ হইয়া উঠে কখনো দেবতার বংশধর পুরোহিত রাজার, কখনো বা রাজা-বিরোধী দেবতার প্রতিনিধি পুরোহিততন্ত্রের। দ্বিতীয়ত, অমরত্বের স্বাভাবিক কামনায় শব-রক্ষা অন্যত্রও বহু দিন হইতেছিল। কিন্তু শব-সমাধি মিশরে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হয়। 'মমি'রূপে দেহ-সংরক্ষণের বিস্তার তাই এক দিকে উন্নয়ন চলিত, অন্য দিকে পীরামিডের মধ্যে রাজা রাজড়ার প্রত্যেকের ভোগ আড়ম্বরের অশেষ উপকরণসমূহও সঞ্চিত হইতেছিল—পরকালের দেহযাত্রার জন্যই যেন ইহকালের সমস্ত অয়োজন। মিশরীরা ইহসর্বস্ব নয়, অথচ দেহসর্বস্ব নিশ্চয়; তাই মিশর পীরামিডের দেশ। অবশ্য সাহিত্য, কবিতা, পৌরাণিক গল্প, সমাধি-মন্দিরের স্থাপত্য, চিত্রকলা, মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য, আর নানা তৈজসপত্র, —দেশ বিদেশের বাণিজ্যের সাক্ষ্য, প্যালেষ্টাইন হইতে আনীত তাম্র, নুবিয়ার স্বর্ণ, লেবাননের দেবদারু কাষ্ঠ, আফগানিস্তানের লেপাস্-লেজুলি প্রস্তর, ইজিয়ান্ মণ্ডলের মর্মর প্রস্তর, সভ্যতার এই সব অজস্র সম্পদের জন্য প্রাচীন মিশরের স্থান ইতিহাসে অতুলনীয়। আর, মিশরের ঐতিহাসিক কাহিনী ও সম্রাট-গোষ্ঠীর পরম্পরাও মোটামুটি জানা গিয়াছে: গোটা চল্লিশেক ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙ্গিয়া প্রথম উদিত হয় উত্তরে ও দক্ষিণে এক একটি রাজ্য, তাহার পর খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হাজার অব্দের কাছাকাছি মিশর এক রাজ্যে পরিণত হয়। সম্রাট মেনেস্ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ জুড়িয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩১৮৮ হইতে ২৮১৫) চলে মিশরের "প্রাচীন" যুগ। তারপর উত্থান-পতনে ১১টি রাজবংশের কথা আছে, এই রাজাদের উপাধি আমরা জানি—'ফেরাও'। পুরোহিত ও প্রধানরা তবু কম ছিল না। সেই সব বিত্তবান্দের শোষণেরও

সীমা ছিল না। রাজস্ব জোগানো, বেগার খাটা, এই ছিল সাধারণের ভাগ্যলিপি। চাবুকের জোরে খাজনা আদায় হয়, দুর্ভিক্ষে আগাছা খাইয়া চাষীরা বাঁচে—এই রূপ বহু চিত্রে ইহার প্রমাণ মিশরীরাই রাখিয়া গিয়াছে। ইহার উপরেও ছিল রাজার শোষণ—পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করা আর পিরামিডের মত কীর্তি নির্মাণের জন্য চাবুক মারিয়া বেগার আদায় করা। কিন্তু এই রাজারা দেবতার বংশধর; কেহ কেহ বা স্বয়ং দেবতাও। কাজেই তাহাদের ইচ্ছা অমান্য করিবার কথা ভাবাও সাধারণের পক্ষে সহজ ছিল না। তবু বারে বারে মিশরে প্রজা বিদ্রোহও হইয়াছে; রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র ও বিত্তবানরা মিলিয়া বিদ্রোহ দমন করিত। প্রজাদের অসন্তোষ অবলম্বন করিয়াই খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর পূর্বে থীব্‌সের সামন্তরা ফেরাও হইয়া বসে; আবার এক প্রজাবিদ্রোহে সাত শত বৎসর পরে তাহারা সাময়িকভাবে ক্ষমতা হারায়; মিশর প্রকাণ্ড কেন্দ্রীভূত সামরিক সাম্রাজ্য হইয়া উঠে; ভাড়াটে সৈন্যও থাকিত শান্তিরক্ষার জন্য; অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন আহরণ করিত এই সম্রাটরা; পরকালের জন্য তাহা জমাইত পীরামিডে! এই প্রজার অসন্তোষ কাজে লাগাইয়া শেষ দিকে পুরোহিততন্ত্র—তাহারা সামন্তদেরই সগোত্র—ফেরাওদেরও খর্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। উহার কিছুকাল পরে আসেরীয়রা মিশর জয় করে। তার পরে পারস্য-সাম্রাজ্যের দিন, আর শেষে আসিলেন গ্রীক আলেকজেন্দার (৩৩২ খ্রীঃ পূঃ)।

একদিকে সুমের ও সিন্ধুতীরবর্তী ভারতবর্ষ, অন্যদিকে 'মিশর', গ্রীক বিজয়ের ফলে এই বিস্তৃত 'এশিয়াটিক সমাজের' শেষদিককার কীর্তি-কলাপ, উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার প্রভৃতি সভ্যতার দানকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন পাশ্চত্য জগৎ তাহার সভ্যতা গঠনের সুযোগ লাভ করে। অবশ্য ইহা জানা কথা—গ্রীসদেশের মুল সভ্যতা বনিয়াদ স্বরূপ পাইয়াছিল ভুমধ্য সাগরের উপকূলস্থ 'উচ্চতর বর্বর-জীবনের' কেন্দ্রগুলিকে, সেখানেও সভ্য-সমাজ 'পৌর-সভ্যতা' রূপে ক্রিটে, এশিয়া মাইনরে, ট্রয় প্রভৃতি স্থলে ও সমুদ্র তীরবর্তী অন্যান্য শহরে জনপদে সভ্যতার এই পথেই ধীরে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল, তাম্রযুগ ও ব্রোঞ্জযুগের মধ্য দিয়া (খ্রী পূঃ ৩০০০-১২০০)। সেই গ্রীকদের অন্যতম প্রধান আশ্রয় ছিল পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি বিদ্যা; কারণ, গ্রীসের অনুর্বর ভুমি কৃষিকার্যের অনুকূল ছিল

না। মাইনোস্ (ক্রীট দ্বীপের) পর্ব হইতে মাইকেনী (নিজ গ্রীসের) পর্ব পর্যন্ত (খ্রীঃপূঃ ২,০০০ হইতে ১,২০০ পর্যন্ত) ঈজিয়ান্ মণ্ডলের এই সভ্যতায় রাজা-রাজড়া আছে, মন্দির আছে (বিশেষত মাইনোস্-এ) যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, যোদ্ধৃশ্রেণীও আছে (ভাড়াটে সৈনিক নয়, বরং সামন্ত অধিনায়কের মত, মাইকেনীর রাজার বশ্যতা স্বীকার করে); কিন্তু এশিয়াটিক সমাজের মত কৃষি-নির্ভরতা ও সামন্ততন্ত্র বেশি বিকশিত হইবার পূর্বেই আর্য-ভাষী অসভ্য গ্রীক-জাতির আক্রমণে এই প্রাচীনতর গ্রীকসমাজ (খ্রীঃ পূঃ ১২০০-৭০০ এর মধ্যে) ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর গ্রীকরা তখন সমাজ গড়িল দাস প্রথাকে প্রধান অবলম্বন করিয়া।

দাস প্রথার যুগ

সেই প্রায়-বর্বর জীবন হইতেই মনুষ্য সমাজে দাস আছে, তাহা সুবিদিত। ইহা যে এই যুগেও টিকিয়া ছিল,—দশ বৎশর পূর্বেও নেপালে দাসপ্রথা চলিতেছিল,—তাহাও আমরা জানি। কিন্তু দাসদের পরিশ্রমেই সমাজে উৎপাদন ও আর্থিক জীবন মুখ্যরূপে সংঘটিত করে গ্রীস ও রোমের সভ্য-সমাজ। তাহার পূর্বে 'এশিয়াটিক সমাজেও' এইরূপ উৎপাদনের প্রাধান্য ছিল না, তাহার পরে ইউরোপের প্রাচীন বা মধ্যযুগেও আর ঠিক দাস প্রথার প্রচলন রহে নাই; সেই মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে দাসপ্রথা পরিবর্তিত হইয়া ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব হয়।

গ্রীসের গ্রীক জাতীয় বিজেতারা ছিল আর্যভাষাভাষী (অর্ধ-বর্বর)। পূর্বে তাহারাও সম্ভবতঃ আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের প্রাচীন মাইকেনীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যখন তাহারা জয়ী হইল তখন দেখি যুদ্ধের প্রয়োজনেই গ্রীকদের মধ্যে দলপতির উদ্ভব হইয়াছে। ছোট বড় বিত্তবানদের শ্রেণীভেদ হইয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে যে প্রধান দলপতি, সে আবার রাজা বলিয়া গণ্য হইতেছে, আর বিত্তবানরা মিলিয়া তাহার মন্ত্রণাসভা বা পঞ্চায়েৎ গঠন করিতেছে। এই সভার হাতে প্রভূত ক্ষমতা। হোমারের উল্লেখিত বিজয়ী গ্রীকদের সমাজ অনেকটা এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। এশিয়া মাইনরের এই উপকূলে ক্রমে গ্রীকদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহাদের সমবেত নাম আইওনিয়া, সংস্কৃত 'যবন' কথাটির উৎপত্তি ইহা হইতে, এই নামে সাধারণভাবে পূর্বে গ্রীকদেরই

বুঝাইত। কিন্তু হোমারের গ্রীক সমাজে দাসদাসী আছে বটে, তবু গ্রীক সমাজে দাসপ্রথা ঠিক মত গড়িয়া উঠিতে আরও শত পাঁচেক বৎসর লাগে। তাহার পূর্বে লৌহ-উপাদানের ব্যবহার সুপ্রচলিত হইয়াছে, আর সেই পরাজিত মাইকেনীয় সভ্যতারও কিছু কিছু দান গ্রীকসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে—যেমন, ফিনিশিয়ার আবিষ্কৃত বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি, মাইনোস-মাইকিনিয়ার নৌ-বিদ্যা ও বাণিজ্যবৃত্তি, এবং মুদ্রাপ্রচলন, আর আঙ্গুর ও জলপাইর চাষ, জ্যামিতিক ক্ষেত্র নির্মাণ পদ্ধতি, ইত্যাদি। কিন্তু গ্রীসের ভূমি অনুর্বর। তাই পশুপালন এই গ্রীকদের একটা প্রধান জীবিকোপায় হইয়া রহে, প্রধানত এক একটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে একটি 'পলিস' বা পুররাষ্ট্র। পশুপালনের সঙ্গে আরম্ভ হয় ঐ অঞ্চলের তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ ধাতুর উত্তোলন, তাহার যন্ত্রাদি নির্মাণ; এই সব জিনিসের বিনিময়ে বিদেশ হইতে শস্য, মাছ, প্রভৃতি আমদানী করা গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাজ হইয়া উঠে। এবং ক্রমে লেনদেনের ব্যবসায়, লগ্নী কারবারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া সমুদ্রে অভিযান ও লুণ্ঠন, আর সমুদ্রের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনও চলে। আর আঙ্গুরের মদ্য, জলপাইর তৈল, বাসনপত্র, ধাতু নির্মিত হাতিয়ার প্রভৃতি নির্মাণের কাজে মজুর কারিগরেরও দিনের পর দিন বেশি প্রয়োজন হইল। এশিয়াটিক সমাজে ব্যবসায়ী ও কারিগর ছিল মন্দির পুরোহিতের আশ্রিত, ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের অনুগত শ্রেণী মাত্র। কিন্তু অনুর্বর গ্রীসে ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের এত অর্থ ও বিত্ত ছিল না; গ্রীসে মালিক বণিকেরা ও বৃত্তিজীবীরাও তাই যথেষ্ট প্রভাবশালী হইবার সুযোগ পাইল। মালিকদের ব্যবসা ও কারখানায় ক্রীতদাসদের দ্বারা উৎপাদন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে।

তবু গ্রীস সভ্যতার প্রথম দিকে এই বণিক ও শিল্প-মালিকের উৎপাদন-উদ্যোগে দাসদের নিয়োগ তত বেশি হয় নাই। কিন্তু তাহার পূর্বেই গ্রীক সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়—মালিক ও অভিজাতবর্গও বঞ্চিতদের দমনার্থে যথারীতি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র হইতে রাজাকে অপসারিত করিয়া অভিজাত শ্রেণী রাজ্যভার গ্রহণ করে। এক দিকে এই অভিজাতবর্গ, আর দিকে ডিমোস্ বা জনসাধারণ —এই সংগ্রামের শেষে এথেন্সে জনসাধারণ জয়ী হইল. ডিমোক্রাসি

বা সাধারণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। আর স্পার্টায় জয়ী হইল যোদ্ধবর্গ—তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিল একরূপ টোটেলিটেরিয়ান্ বা 'সার্বিক' শাসন। ক্রমে প্রগতিশীল এথেন্স ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবলে প্রবল হয়। তাহার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য সমস্ত ঈজিয়ান-উপকূলে ছড়াইয়া পড়ে; প্রতিক্রিয়াশীল স্পার্টাও অস্ত্র শক্তিতে পেলোপোনিসিয়া অঞ্চলের সকলকে পরাজিত করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। এই দুই নগরীর পরস্পর যুদ্ধের কাহিনী অনেকাংশে বণিকশক্তির আর ক্ষাত্র শক্তির সংঘর্ষ, আর সেকালের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষও বটে। এথেন্সের বণিকরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে বিকাশ ও পতন আবার সাম্রাজ্যবাদের এক শোচনীয় পরিণামের প্রমাণও। এবং যুদ্ধাবসন্ন স্পার্টা ও এথেন্সের অবসান ঘটাইয়া যখন অর্ধ-গ্রীক মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ (আলেকজেন্দারের পিতা) আপন সামরিক শক্তি লইয়া সমুত্থিত হইল, তখন গ্রীক বিত্তবানেরা তাহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠা খুঁজিল। ইহার অর্থও বুঝিবার মত—শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে বিত্তবানেরা শেষ পর্যন্ত নিজ রাষ্ট্র ও নিজ জন্মভূমিকে বিদেশীর নিকট সমর্পণ করিতে দ্বিধা করে না—তা সেই বিত্তবান্ বণিকই হউক, কিংবা অভিজাত ক্ষত্রিয়ই হউক—কিংবা হউক ফ্রান্সের 'দুইশত পরিবার', বৃটেনের ক্লাইব্‌ডেন্ চক্র, আর ভারতের ধনিক ও জমিদার। অবশ্য ম্যাসিডোনিয়ার প্রতাপে গ্রীকমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তারপর আলেকজেন্দারের দিগ্বিজয়ে গ্রীকেরা নূতন শক্তির ও সম্পদের আস্বাদন লাভ করে। এই দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রীক সমাজের মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ ঘটে নাই। মাত্র গ্রীক ইতিহাসে আর এক নূতন পর্বের প্রারম্ভ হয়:—ইহার নাম হেলেনিষ্টিক্ পর্ব। তাহার তিনটি প্রধান কেন্দ্র—মিশরে টলেমি বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব করিতে থাকেন; পশ্চিম এশিয়ায় সেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব চালান (অবশ্য আফঘানিস্তানে ভারতবর্ষে গ্রীক 'যবন' রাজারাও ছিলেন); এই দুই কেন্দ্রের গ্রীক রাজারা কতকাংশে পুরাতন 'এশিয়াটিক সমাজের' ঐতিহ্য গ্রীক নামের আড়ালে মানিয়া লইয়া চলে। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়াকে কেন্দ্র করিয়া গ্রীক দেশ বহন করিয়া চলে তাহার দাসপ্রথায় পরিচালিত সমাজ-যাত্রা। খ্রীঃ পূঃ ২০০-১৫৫ এর দিকে রোমের হাতে উহা তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল গ্রীস সমাজের মূলরূপ—দাসপ্রথার উৎপাদন।

কী সেই রূপ? এথেন্সে স্পার্টায় যতই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটুক,

চমকপ্রদ নানা রাজনৈতিক বিন্যাস (ডিমোক্র্যাসি, ওলিগার্কি বা মনার্কি) ও তাহার নীতি ও সূত্রের যত উদ্ভাবনা হউক—গ্রীকেরা যখন শৈশব উত্তীর্ণ হইল তখন হইতে দাসপ্রথাই হয় তাহাদের প্রধান অবলম্বন। গৃহকর্মে তো নিশ্চয়ই, পশুচারণায়ও বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া কারখানায়, খনিতে, পরিশ্রমের সর্বক্ষেত্রে দাসেরাই হইয়া উঠে গ্রীক মালিকের, বণিকের, গ্রীক 'নাগরিকের' আর্থিক জীবনের নির্ভর। এথেন্‌সের সৌভাগ্যের দিনে দেখা গেল তাহার প্রয়োজনীয় শস্যের বারো আনি আসে বাণিজ্য সূত্রে বিদেশ হইতে; তাহার মদ্য, জলপাই তৈল, মৃৎপাত্র, ধাতব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে সেই চালানী ব্যবসায়ের রপ্তানী পণ্য হিসাবে—এমন কারখানাও গড়িয়া উঠিতেছে যেখানে এক শতের মত ক্রীতদাস কাজ করিত। যেমন দেখি—কেফালসের ঢাল তৈয়ারীর কারখানায় দাস খাটে ১২৪এর উপরে, ডিমোস্‌থেনিসের পিতার খাটের মিস্ত্রিখানা, অস্ত্রের কারখানা প্রভৃতিতে ২৫।৩০ করিয়া দাস নিযুক্ত আছে। সমগ্র এথেন্‌সে এই দাসেরা তখন 'নাগরিকদের' অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশি। কাহারও কাহারও মতে দাস অধিবাসীই বারো আনার বেশি। অথচ এথেন্‌সের 'ডিমোক্রাসির' অর্থ ছিল কি? শাসনে ও সাধারণ কাজে অধিকারী একমাত্র সেই সংখ্যাল্প 'পৌরজন' বা নাগরিকেরা, দাসদের কোনো অধিকার নাই। স্বাধীন বৃত্তিধারী মানুষ অবশ্য এথেন্সে যথেষ্ট ছিল। আবার, দাসদেরও রাজ্যের ছোট ছোট কার্যে নিয়োগের প্রমাণ আছে; দাসেরা 'মুক্তি'ও লাভ করিত; শিল্প ও শিক্ষারও আস্বাদ কেহ কেহ লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এই কথা ভুলিবার নয়—সেই 'গণতান্ত্রিক পুররাষ্ট্রে' সংখ্যাগুরু দাসদের অধিকার নাই, সমাজে তাহাদের কোনো দাবী নাই; গ্রীক সংস্কৃতির ও সভ্যতার তাহারা ভারবাহী মাত্র ছিল।

গ্রীক সংস্কৃতির সামান্য কিছু পরিচয় না জানিলে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার মূলসূত্রই অবশ্য অচেনা থাকিয়া যায়। কিন্তু এখানে তাহার সেইরূপ সামান্য পরিচয় উল্লেখও সম্ভব নয়। সম্ভবত একটি ছোট জাতির পক্ষে এমন কীর্তি ইতিহাসে আর কখনো আয়ত্ত হয় নাই—এবং হইবে না। আজও আমরা গ্রীক সাহিত্য, তাহাদের মহাকাব্য, নাটক, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি অনুবাদ সূত্রে পড়িয়াও আনন্দ পাই। স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতিও আমাদের এতটা আপনার জিনিস বলিয়া আজ বোধ হয় না। গ্রীক শিল্পের, মূর্তির, মন্দিরের, মৃৎপাত্রের, চিত্রের অপরূপ

সৌন্দর্য-সুষমা ও মাত্রাজ্ঞান আমাদের বিমুগ্ধ করে,—আমাদের প্রাচীন শিল্প-কলাও আমরা এতটা আজ উপভোগ করিতে পারি না। গ্রীক অলিম্পিক ক্রীড়া-কলাতে গ্রীক জীবন-দৃষ্টির যে সুন্দর পরিচয় মিলে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের দর্শন লইয়া আমরা গৌরব করি; কিন্তু গ্রীক দর্শন সমস্ত পাশ্চাত্য ও আধুনিক চিন্তা-ভাবনার মূল বনিয়াদ। আর গ্রীক চিন্তার স্বচ্ছতা, স্থির বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য অস্বীকার করা যায় না। ডিমোক্রিটাসের বস্তুবাদ, হেরাক্লাইটাসের পরিবর্তনবাদ, সোফিস্টদের জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, আরিষ্টটল-প্লেটোর ভাববাদ আজ পৃথিবীর সম্পদ। আরিষ্টটলই মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করিয়া যান—জগৎ ও জীবনকে দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ঠিক এমন ব্যাপক ও বাস্তব প্রয়াস তাহার পূর্বে আমরা আর কোথাও পাই না। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের ইতিহাসবোধ প্রায়ই অস্বচ্ছ। ভারতবর্ষে তো উহা দুর্লভ ও দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু গ্রীকেরা প্রকৃত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন। আইওনিয়ার (যবন) পণ্ডিতেরা প্রাকৃতিক সত্য লইয়া যে পরীক্ষা ও গবেষণা করেন, তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্মেষ সূচিত হয়—প্রাচীন বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের দিক হইতে তাঁহাদের কীর্তি অসামান্য। পরবর্তী হেলে-নিষ্টিক যুগে আলেকজেন্দ্রিয়ায় জ্যামিতির গোড়াপত্তন হয়, পূর্তবিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিংএর সূচনা হয়, ভূগোলের জ্ঞান প্রসারিত হইতে থাকে। গ্রীসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে। হয়ত ভারতে আয়ুর্বেদের ততোধিক উন্নতিও ঘটিয়াছিল, কিন্তু যে সহজ মানবীয় দৃষ্টিতে—মানব-জীবনের প্রতি মমতা ও মানুষের মহত্ত্ববোধের দ্বারা গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, সেই মানবতা-বোধ আর কোন্ চিকিৎসক-সমাজের সহজ ধর্ম ছিল? সমস্ত গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে জীবন-ধর্মের ও মানবতাবাদের, অধ্যাত্ম ভাবনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের একটা সমন্বিত প্রকাশের, সুষমাবোধ ও অপ্রমত্ত মাত্রাজ্ঞানের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার তুলনা আর কোনো সংস্কৃতিতে সমাজতন্ত্রের যুগে না পৌছিতে এতদিনেও আর মিলে নাই।

গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে যে আধুনিক মনোবৃত্তির আভাস পাই তাহার একটা কারণ সম্ভবত এই—তাঁহাদের ক্ষুদ্রতর পরিবেশে ও স্বল্পকালের মধ্যে গ্রীক-সমাজ সেই প্রাচীনকালে কতকাংশে আধুনিক সভ্য-সমাজের অনুরূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। গ্রীক বণিকদের বাণিজ্যসূত্রে, সমুদ্রযাত্রায়, কারবার কারখানার বিস্তৃতিতে গ্রীকদের মনের প্রসার ঘটিতেছিল। অন্যান্য

অভিজাত সভ্যদেশেও কৃষক লইয়া গঠিত সমাজ সাধারণত হইত স্থিতিশীল; এমন নানামুখীন্ চেতনা সেরূপ সমাজে তাই দেখা যায় নাই। অন্যদিকে আধুনিক সমাজের মতই শ্রেণীভেদও গ্রীক সমাজে পরিস্ফুট। গ্রীক অভিজাতরা গর্বিত, গ্রীক সমাজে নারীর স্থান নিম্নে, আর দাসেরা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। আরিষ্টটলের মত যুক্তিবাদী মনস্বীরও মতে দাসপ্রথা প্রকৃতির বিধান; প্লেটোর মত অভিজাত আদর্শবাদী প্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্মী শ্রেণী-বিভেদ পাকা করিয়া সেকালের স্থায়ী 'নেতৃরাষ্ট্র' গঠন করিতে চান, তাঁহার চক্ষে দৈহিক পরিশ্রম ও উৎপাদন একটা তুচ্ছ লজ্জাজনক কাজ। দাসপ্রথায় এমনি ধারনা গ্রীকমনে বদ্ধমূল হয়। দাসপ্রথারই ফলে বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়া জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন গ্রীকদের ছিল না; বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রয়োগেও তাহাদের তাগিদ ছিল না—দাসরূপ মনুষ্যযন্ত্রই তো কাজ করিতেছে। তাই গ্রীক বিজ্ঞানের পথ অনেক দিকে অবরুদ্ধ থাকে এবং দাসপ্রথা গ্রীক-সভ্যতার অধোগতি ঘটায় (তুলনীয় ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা)।

রোমের ইতিহাসও দাসসমাজের ইতিহাস। গ্রীক দেশের মত সংস্কৃতিতে শিল্পে রোমকেরা অত পরাকাষ্ঠা দেখায় নাই। তাঁহারা গ্রীক সংস্কৃতির দান আত্মসাৎ করিয়া তাহা লইয়াই প্রধানত কারবার করিয়াছে। কারণ রোম-সমাজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরের প্রতিষ্ঠা ছিল না; প্রধানত রোম অভিজাত ভূস্বামীদের সমাজ। কিন্তু সাম্রাজ্যজয়ে, শাসনে, আইন-কানুন বিধি-বিধানের ধারণায় ও ব্যবস্থায় এবং পথ-নির্মাণ, শহর ও সৌধ-স্থাপত্যে রোমকরা বর্তমান পৃথিবীর গুরুস্থানীয়। তবু সে সভ্যতাও দাসপ্রথারই উপর গঠিত, আর রোমেরও পতনের প্রধানতম কারণ এই দাসপ্রথার ভাঙ্গন, ইহার অচল অবস্থা।

খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতকে রোমের ইতিহাসের আরম্ভ, আর খ্রীষ্টীয় ২৫০ অব্দের পূর্বেই দেখি রোমের ঐশ্বর্য ফুরাইয়া চলিয়াছে। তাহার পরেকার দেড় শত বৎসরে আসল রোম টিউটন জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণে তাহাদের অধিকারে চলিয়া গেল। পূর্বখণ্ডে বাইজান্‌টাইন্ সাম্রাজ্য তারপরেও দাস প্রথা ও এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্র মিশাইয়া অনেক কাল টিকিয়া ছিল—একেবারে তুর্কদের আক্রমণে তাহা ভাঙিয়া গেল। কিন্তু রোমক সভ্যতার ও সমাজের বৈশিষ্ট্য খ্রীষ্টীয় ৩য় ৪র্থ শতকেই প্রায় ফুরাইয়া যায়। এই সুদীর্ঘ

দিনের রোমের ইতিহাসের বহু তথ্যই জানিবার মত। কিন্তু এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা সংক্ষেপে এই, আদিম সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়া রোমেও দেখা দেয় প্যাট্রিসিয়ান্ বা অভিজাত শ্রেণী ও প্লিবিয়ান্ বা আশ্রিত শ্রেণী। জমিজমা, খনি প্রভৃতির মালিক প্যাট্রিসিয়ান্‌রা; অন্য রোমকরা কেহ বা গরীব চাষী, কেহ সাধারণ ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী, কিন্তু অধিকাংশেই প্যাট্রিসিয়ানদের অনুগ্রহজীবী, তাহাদের নিকটে ঋণে বাঁধা, তাহাদের লাঙল-বলদ লইয়া চাষ-বাস করে, মজুর খাটে, প্রভুদের হইয়া কিছু কিছু ব্যবসাও করে। রাজতন্ত্র নাকচ করিয়া প্যাট্রিসিয়ানরা রোমেও রাজ্যভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, তাহাদের রিপাব্লিকের পরিষদের নাম সেনেট, দুইজন অধ্যক্ষ, তাহাদের পদবী কন্‌সাল, এক বৎসরের মত সেনেটে তাহারা নির্বাচিত হয়। এই ছিল গোড়ার দিকের রোম। কিন্তু সেই গোড়ার দিকেও প্যাট্রিসিয়ানে প্লিবিয়ানে শ্রেণী-সংঘাত বাধিয়া যায়। একবার সেই বিবাদের শেষে আপোষ রফা করিয়া অবস্থাপন্ন প্লিবিয়ান্‌রা বেশ কিছু ক্ষমতার ভাগ পাইয়া স্থির হইয়া বসে; কিন্তু দরিদ্র প্লিবিয়ান্‌রা তখনো রহিয়া গেল যে তিমিরে সে তিমিরে। এই দরিদ্রের মধ্যে যাহাদের কোনো সম্পত্তি নাই, বা নিঃস্ব সর্বহারা, তাহাদের নাম হয় প্রোলিটেরিয়ান—'পুত্রদ্রক'। যুদ্ধে অন্যেরা টাকা পয়সা, অনুচর প্রভৃতি দিয়া সৈন্য না হইয়া আইনের হাত হইতে রেহাই পাইত; বিত্তহীনদের সেই সামর্থ্য নাই, তাই যুদ্ধে দিতে হইত নিজ পুত্রদের। আজ 'প্রোলিটেরিয়ান্' বলিতে বুঝায় 'নিঃস্ব' বা 'নির্বিত্ত' 'সর্বহারা' শ্রমিক শ্রেণী।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যজয়ে রোম নামিল সম্ভবত সাধারণের অসন্তোষ চাপা দিবার জন্য; লুণ্ঠনের একটা অংশ ইতর সাধারণকে দেওয়া হইত, আর অধিকাংশ যাইত অভিজাতদের গৃহে। কিন্তু লুণ্ঠনের স্বাদ পাইয়া আর রোম থামিতে পারিল না। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িল, যুদ্ধবল বাড়িল, মধ্য ও দক্ষিণ ইতালি জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল রোমের রাষ্ট্রশাসন রীতি, আইন-কানুনের বুদ্ধি, গৃহে আসিল ধনরত্ন, আর দাস-সম্পদ। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই দাসপ্রথারও বহু প্রচলন হইতে লাগিল।

ইহার পরে রোমের দিগ্বিজয়ের পালা—কার্থেজ ধ্বংস, সিসিলি স্পেনে রাজ্য বিস্তার, গ্রীস বিজয়; তাহার পরে মিশর ও নিকট-প্রাচ্যের গ্রীক রাজ্যগুলি অধিকার। অভিজাতদের অগাধ ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য লুণ্ঠন, রাজস্ব আদায়,

দাস-সংগ্রহ, দাস-ব্যবসায়,—এই সবের সহিত দেখি দাসের পরিশ্রমে তো খনির কাজ চলেই, অস্ত্রশস্ত্রের ছোটখাটো কারখানাও চলে; কেরানির কাজও চলে, এমন কি গ্রীক-শিক্ষকের কাজও করা হয় দাস শিক্ষকের দ্বারা। বৈশিষ্ট্য যাহা দেখি তাহা এই—রোমের অভিজাতরা নানা উপায়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় বড় জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই সব জমিদারীর নাম 'লাটিফাণ্ডিয়া', সময়ে সময়ে এইরূপ এক একটা জমিদারী যেন একটা প্রদেশ। এই জমিদারীরও চাষের কাজ করে দাসগণ, কর্মচারীরা লাঠি ও চাবুক লইয়া দাস চাষী তদারক করে।—এই হইল রোমান্ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক গড়ন। ইহার মধ্যে কৃষক রোমান ও দরিদ্র প্রোলিটেরিয়ানের অসন্তোষ বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যের উদ্বৃত্ত শস্য বিলাইয়া তাহাদের ঠাণ্ডা করিতে হইতেছে; সার্কাস ও মল্লযুদ্ধের 'খেলার' ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ভুলাইতে হয়; আর অন্য দিকে বারে বারে দাস-বিদ্রোহ ঘটিতেছে; (তাহার মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৭৩ অব্দে স্পার্টকাসের নেতৃত্বে যে দাস-বিদ্রোহ হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়); সেনেট ও নির্বাচন অফুরন্ত ঘুষের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; প্রোলিটেরিয়ান ভাড়াটে সৈনিক লইয়া অভিজাত নেতারা পরস্পরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাতিতেছে, সীজারের সঙ্গে সঙ্গে এক-নায়কত্ব দেখা দিতেছে, সীজার বংশই প্রায় সম্রাট হইয়া বসিতেছে; অসহায় দাস ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের অধ্যাত্ম আশ্বাস শেষ ভরসা হইয়া উঠিতেছে; রোমের অধিবাসীদের সাম্রাজ্যের ফসল দিয়া বৎসরের অর্ধেকদিন মল্লক্রীড়া দেখাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। রাজ্যজয়ের ফলে ক্রমে শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি রোম ছাড়িয়া দূর দূর অঞ্চলে গিয়া অধ্যুষিত হইতেছে, সেখানে নূতন জীবন-কেন্দ্র গড়িতেছে; মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্যে তাই মন্দা লাগিতেছে। অন্যদিকে বড় বড় জমিদারীগুলি আর শহরের কারিগরের দিকে না চাহিয়া থাকিয়া নিজেদেরই 'ভিলার' নিকটে তাঁতী, কামার, কুমার, মিস্ত্রী প্রভৃতি আনিয়া বসাইতেছে। ইহার উপর, সাম্রাজ্য হইতে দাস সংগ্রহও আর সুলভ নয়; শস্য রপ্তানীর অভাবে খাওয়াপরা জোগাইয়া দাস দিয়া চাষে লাভ টিঁকে না। জমিদারীর চাষবাসের কাজে তাই কৃষি-মজুর, ভাগ-চাষী, খাজনা-করা-প্রজা প্রভৃতির পত্তন বাড়িয়া চলিয়াছে—সেই এশিয়াটিক সমাজের দিকেই কি পশ্চিম রোম সমাজ চলিয়াছে? অনেকটা

তাহাই। কারণ, এই দাসপ্রথা হইতে ক্রমে ভূমিদাস বা সার্ফ প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইতেছে, ইউরোপের মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের আয়োজন চলিতেছে। শেষের শত দেড়েক বৎসরে (খ্রীঃ ২৫০—৪০০) একবার সম্রাটরা রোম সাম্রাজ্যের এই ঠাট বজায় রাখিবার জন্য সমস্ত শক্তি রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত করিতে চাহিলেন, প্রজাসাধারণের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইতে লাগিলেন; খ্রীষ্টীয় ধর্মও তাঁহাদিগকে যথানিয়মে 'প্রভু ও দেবতা' আখ্যা দিল,—রোম সাম্রাজ্য প্রকৃত পক্ষে এক 'টোটেলিটে-রিয়ান ষ্টেট' বা "সার্বিক রাষ্ট্রে" পরিণত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া রোম সমাজ ও সাম্রাজ্য বাঁচিল না। অর্ধবর্বর আক্রমণে সেই সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল; অবশ্য ইউরোপের ইতিহাসেও অন্ধকার নামিল।

ফিউডাল সামন্ত যুগ

রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চাপিয়া বসিয়াছে তখন একটু একটু করিয়া ইউরোপে গড়িয়া উঠে যে সমাজ তাহাকেই 'ফিউডাল সামন্ত সমাজ' বলে। জার্মাণ জাতির অসভ্যরা ততদিনে আদিম সাম্যতন্ত্র ও শিকারী জীবনতো ছাড়িয়াছেই, খ্রীষ্টান হইয়া এবং রোমের শেষ দিককার রাষ্ট্র-নিয়ম-পদ্ধতি কতকাংশে গ্রহণ করিয়া এই জাতিরা রীতিমত রাজা, প্রধান ও সাধারণ লোক লইয়া রাজ্য গড়িয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের ছোট ছোট রাজ্য লইয়া হইত সাম্রাজ্য। নিজেদের সাম্রাজ্যের তাহারা 'রোম সাম্রাজ্য' বলিয়া পরিচয় দিতেও উৎসুক। ফ্রাংকদের রাজা শার্লমেন সেইরূপ চেষ্টা করেন। পরে জার্মান গোষ্ঠীর অটোও এ পরিচয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিউডাল সমাজের মূল রূপটা কি? দুইটি শ্রেণীতে ফিউডাল সমাজ বিভক্ত—উপরে জমিদার সামন্তরা আর নিচে সাধারণ সার্ফ বা ভূমিদাস কৃষক। কিন্তু সার্ফেরা ঠিক দাস নয়। তাহারা তবু প্রভুর গ্রাম ও জমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। ছোট এক-আধ খণ্ড জমি তাহাদেরও নিজেদের থাকিত, তাহারা উহা চাষ বাস করিত; প্রভুর প্রাপ্য ভাগও দিত, রাজার খাজনাও দিত, নানা আবওয়াবও মিটাইত, নজরানা দিত, নতুন জমির সেলামি দিত। কিন্তু বছরের প্রায় অর্ধেক দিন প্রভুর নির্দেশ মত জমিদারের জমিতে সার্ফদের বেগার খাটিতে হইত, মুনিব বাড়িতে কাজকর্ম করিতে হইত, ফরমায়েস মত

অন্য কাজও করিত। ইহা ছাড়া অবশ্য চর্চ ও পুরোহিতের দাবীরও অন্ত ছিলনা। তাহাও মিটাইতে হইত। তদুপরি, জঙ্গলের কাঠ আহরণ, পশুপাখী শিকার, খালে-নদীতে-পুকুরে মাছ-ধরারও অনেক সময়ে খাজনা না দিলে চাষীদের অধিকার ছিল না। রাস্তার মোড়ে, সাঁকোর মোড়েও কর দিতে হইত। তাহার উপরে জমিদারই ছিলেন শাসক,—রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমিদাসের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কম,—জমিদার কাছারিতে তাহার বিচার হইত, জরিমানা হইত, কয়েদ হইত জমিদারের 'ঠাণ্ডা গারদে।' জমিদার ছিলেন গ্রামের প্রভু। এই গ্রামগুলির নাম 'ম্যানর'। নিজের খানিকটা জমি থাকিত জমিদারের খাশ দখলে, বাকিটায় সার্ফদের পত্তন করিত। ফিউডাল রাষ্ট্রও জমিদারদেরই সৃষ্টি; ছোট জমিদারের উপর বড় জমিদার, তাহার উপর আরও বড় জমিদার, সকলের উপরকার জমিদারই রাজা—ফিউডাল সমাজে এ শ্রেণীর মধ্যে এই স্তরভেদ একটা বড় লক্ষণ। রাজা সামন্তদের সাহায্যে রাজকার্য চালাইবেন, তাহারাই সৈন্য জোগাইত। রাজা দুর্বল হইলে সামন্তরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইয়া লইত, প্রবল সামন্ত রাজা হইয়াও বসিতে চাহিত। তাহা না হইলে সামন্তদের পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না—ইহাও ফিউডাল সমাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য, আর তাহা লইয়াই উহাদের চারণদের গান, নাইটদের স্তুতিকথা। কিন্তু ফিউডাল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য চর্চের প্রভাব। রোমের পুরোহিত যেন পুরানো সাম্রাজ্যের সম্রাট্, তাহার নিচে বিশপ্‌রা, তাহাদের নিচে পাদ্রী পুরোহিত প্রভৃতি। এই চর্চ ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার—ভারতবর্ষের মোহান্তদের মত। তাহারা ভিন্ন ভাবে নিজেদের ধর্মাধিকরণে বিচার করিত, তাহাদের ক্ষমতার অন্ত ছিল না। রাজার সঙ্গে চর্চেরও বিবাদ বাধিত, পোপের সঙ্গে বিবাদ বাধিত সম্রাট্‌দের—ইউরোপের ইতিহাস অনেকটা এই বিবাদের কথা। এই চর্চই ছিল সে দিনের সংস্কৃতির কেন্দ্র।

খ্রীঃ দশম হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে ফিউডাল সমাজের এই রূপ পশ্চিম ইউরোপে ফুটিয়া উঠে; তারপর তাহা সেখানে বিলুপ্ত হইতে থাকে—পূর্ব ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে উহা টিকিয়া ছিল আরও অনেকদিন।

এই ফিউডাল সমাজ প্রধানত গ্রাম্য সমাজ, চাষী ও কারিগরের সমাজ। ইহা এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের বা গ্রীক ও রোমান সমাজের সেই পৌর-সভ্যতা নয়। ছোট খাটো শহর অবশ্য ছিল, তীর্থক্ষেত্র, রাজার রাজধানী,

ব্যবসায়ের কেন্দ্র থাকিবেই। কিন্তু ক্রমে হাট বাজার মেলা অবলম্বন করিয়া নতুন শহর বা 'বুর্গ' বসিতে লাগিল; পুরানো শহরও বাড়িতে লাগিল; ব্যবসাপত্র ঐসব স্থানে বাড়িতে থাকে, কারিগরদেরও পশার বাড়ে। পূর্বে এইসব কারিগর শিল্পীদের কাজের উপর প্রধান দাবী ছিল তাহার জমিদারদের। নিজ নিজ জমিদারের এলাকাতেই উহাদের কেনা-বেচাও হইত, উহাতে জমিদাররা ভাগ বসাইত, শহরের উপরও এইরূপ জমিদার-প্রভুর শোষণ ছিল। কিন্তু ব্যবসাপত্র বাড়িতেই এই কারিগর ব্যবসায়ীদের জমিদারের গণ্ডী ও শোষণের সীমা ছাড়াইবার তাগিদ পড়িল। তাহারা "গিল্‌ডে" সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের শহরে কতকটা ব্যবসাবাণিজ্যের স্বাধীনতা অর্জনও করিয়া বসিল। জার্মান 'হান্‌সিয়াটিক্ লীগের' নাম এই জন্য প্রসিদ্ধ। ক্রুসেড্ প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া ইতালিতে ভেনিস্ প্রভৃতি শহরে বেণে রাজারাও জাঁকিয়া বসিল —কিন্তু তখন সামন্ততন্ত্রের শেষ দিন আসিতেছে। এই শহুরে কারিগর কারবারীরা শহুরে ব্যবসায়ী,—ইহারা 'বুর্গের' আসল অধিবাসী বলিয়াই ইহাদের নাম 'বুর্জোয়া'। বলা বাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই কারিগর রাখিয়া কারখানা গড়িবে, পুঁজিপতি হিসাবে তাহারাই হইবে শিল্পপতি এবং শেষে পত্তন করিবে পুঁজিতন্ত্রের যুগ বা বুর্জোয়া যুগ। কিন্তু মধ্যযুগে শহুরে বণিক কারিগরদের আত্মরক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল নিজ গিল্‌ড—তন্তুবায়, কর্মকার, স্বর্ণকার, শক্যকার প্রভৃতি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র 'গিল্‌ড বা সংঘ' ছিল—অনেকটা আমাদের পঞ্চায়েতের মত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে এইরূপ গিল্‌ডেরই নাম ছিল 'শ্রেণী'। এই গিল্‌ডগুলি প্রভুদের শোষণের বিরুদ্ধে কারিগরদের শক্তিকেন্দ্র। ইহারা নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা কমাইয়া দাম বাঁধিয়া দিত, লাভের পরিমাণ ঠিক রাখিত। ওস্তাদ কারিগর গিল্‌ড চালাইত, সাকরেদদের শিক্ষানবীশীর ব্যবস্থা করিত। কিন্তু ক্রমে এই ওস্তাদরাই গিল্‌ডের জোটের জোরে সাকরেদদেরও শোষক হইয়া উঠিল—তাহাও দেখা গেল। তবু গিল্‌ড মধ্যযুগের কারিগরদের পক্ষে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বড় শক্তিকেন্দ্র—এ-কালে মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের মতই ইহা উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য প্রচুর। তাই এই সামন্ত স্তরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যাহা, এদেশে আমরা প্রধানত তাহাই পাইয়াছি ভারতীয় সংস্কৃতি-রূপে। আর এই দাক্ষিণ্যের জন্য এ-স্তরও এই দেশে স্থায়ী হইয়াছে দীর্ঘদিন।

উৎপাদনশক্তি এখানে বাধা না পাইয়া স্থির রহিয়াছে—একেবারে বিদেশী আসিয়া ও বিদেশী পণ্য আসিয়া তাহার ওলট-পালট না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত। কিন্তু ইউরোপের কঠিন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া সেইখানকার লোকদের নূতন উৎপাদনশক্তির সৃষ্টি অহরহ করিতে হয়। তাই সমস্ত উৎপাদন-প্রথাও তাহারা তাড়াতাড়ি সেইখানে ছাড়াইয়া যায়। সামন্ত যুগও শেষ হইতে লাগিল চতুর্দশ শতকেই।

বণিকতন্ত্র

আমেরিকা আবিষ্কারের পর পেরুর লুঠ-করা সোনায় ইউরোপের বৈশ্যদের ঘর বোঝাই হইল, বাজার ফাঁপিয়া উঠিল। তখন নূতন নূতন শিল্প দেখা দিতেছে। সেই বৈশ্য-স্বভাব বণিক ও শহুরে মধ্যসত্ত্বভোগীর দল তখন আর সামন্তকে মানিতে চায় না; বণিকেরাই ছিল এতদিন সামন্ত ভৌমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত শ্রেণী। একটু অবস্থা ফিরিতেই তাহারা চাহিল রাষ্ট্রে স্বাধিকার ও সমাজে মুক্তি। নূতন ব্যবসাপত্র ও বাণিজ্যের জন্য সমাজ হইতে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ দরকার হইয়া পড়িল;—নূতন উৎপাদন-শক্তি, অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য, পুরাতন উৎপাদন-সম্পর্ককে, অর্থাৎ সামন্ত ও গোলামের সম্পর্ককে, ভাঙিয়া দিতে লাগিল। ইহারই ফলে ইংলণ্ডে হয় ক্রমোয়েলের সমকালীন পঞ্চাশ বৎসরের বিপ্লব; ফ্রান্সে উহার পূর্ণ একশত বৎসর পরে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব (১৭৮৯)। সামন্তযুগের অবসানকল্পে আসিল এই বণিক-তন্ত্র ও বণিক-পুঁজিদারের যুগ। তাহারই পরিণতি হইল বুর্জোয়া বণিকদের যুগ, শিল্পপতি, পুঁজিতন্ত্র বা ক্যাপিটা-লিজম-এর প্রসার। কিন্তু ইহারাও পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্য সস্তায় লইয়া মুনাফা করে, শ্রমিককে তাহার শ্রমমূল্য আসলে ফাঁকি দেয়। তাহাদের এই মুনাফা শ্রমিকেরই উদ্বৃত্ত শ্রম—কারণ, শ্রমিকের যে পরিশ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরী পায় না, তাহারই নাম মুনাফা। এই মূলকথাটা এই সম্পর্কে বারাবর মনে রাখা দরকার। কারণ এই মুনাফার উপরই বুর্জোয়ার ঐশ্বর্য গড়া, বাণিজ্য গড়া, তাহার পুঁজি গড়া—আর গড়া এই বুর্জোয়া সভ্যতা। এই মুনাফার লোভই হইল তাহার সমস্ত প্রয়াসের মূলকথা। তাহার দান-খয়রাতি, আইনকানুন হইতে ধর্মকর্ম, কালচার সবই মুনাফার প্রসাদে; এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে। সেই মুনাফার লোভে সে বাণিজ্যের

নামে সাম্রাজ্য আয়ত্ত করে; মুনাফার লোভে বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়া নিজের মাল চালায়; একচ্ছত্র মুনাফা ভোগের আশায় সে সেখানে একচেটিয়া বাজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাসও ইহাই, এই মুনাফার শিকার।

পুঁজিতন্ত্রের যুগ

ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকের সেই লুঠ-করা ঐশ্বর্যের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ হয়; তাহাতেই আবার পৃথিবীতে শিল্প যুগের গোড়াপত্তন হইল। কারণ, বিজ্ঞানের ক্রম-প্রসারিত জ্ঞান তখন কতকগুলি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। কলে জিনিস তৈরী করা যায় অনেক বেশি, অনেক তাড়াতাড়ি। মানুষের অপেক্ষা কলে কম খরচে বেশি মাল উৎপাদন হয়, এই কথা দাসপ্রথায় গ্রীস-রোম বা ভারতবর্ষ-চীনও বুঝে নাই, বুঝিল এই বুর্জোয়া বণিকেরা। তাই নূতন কলকারখানা বসিতে লাগিল। ব্রিটেনের এই কারখানা বিস্তারের পুঁজিটাই আসিয়াছিল ভারতবর্ষের লুন্ঠিত ঐশ্বর্য হইতে। আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ আর বিলাতের কলের কাজের সম্মুখে তখন টিঁকিতে পারিল না। দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া গিয়া কলের মজুর হইতে লাগিল—তাহারা যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটিতে গেল, নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিল। ইহাই পুঁজিতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (capitalism); এই প্রথায় যন্ত্র রহে মালিকের হাতে তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; যন্ত্রজাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় কারখানার মজুরের সমষ্টিগত পরিশ্রমে (socialized labour)। উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য যাহা সর্বাংশের তাহা মজুরের পরিশ্রমের সমতুল্য। কিন্তু মজুর পায় সেই মূল্য হইতে শুধু নিজের বাঁচিবার মতো অংশটুকু, বাকীটা গ্রহণ করে কলের মালিক মুনাফারূপে; এই মুনাফাটা আসলে তাই উদ্বৃত্ত শ্রমমূল্য (surplus value)। তাই মুনাফার অর্থ হইল মজুরের মেহনতের সেই মজুরী যাহা মজুরকে না দিয়া মালিক আত্মসাৎ করে। এদিকে যত কল বাড়ে, যত বেশি সংখ্যায় মজুর খাটে, যত বেশি সময় মজুর কাজ দেয়—ততই এই মুনাফা কাঁপিয়া উঠে। তাহাতে কলওয়ালার পুঁজি আরও বাড়ে; আবার সেই পুঁজিতেই বসে নূতন নূতন কল, নূতন নূতন কারখানা। এই কারণেই নূতন যন্ত্র

আবিষ্কারের তাগিদ পড়ে; কারণ ভালো যন্ত্র হইলে আরও বেশি পণ্য উৎপন্ন হইবে, মুনাফা আরও বাড়িবে। এই নিয়মে এক শত বছরে আজ ইতিহাসে যন্ত্রযুগের বিবর্তনে অতিকায় কারখানার পর্ব দেখা দিয়াছে। যুগ হিসাবে আজ সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়াছে কৃষিযুগের শেষে শিল্পযুগ—যন্ত্রবলের প্রসারে উৎপাদন-শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে মুনাফাদারীর হাত হইতে মুক্তি—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—সমাজ ও সভ্যতা তাই রূপান্তরিত হইতে চাহিতেছে।

তবু লক্ষ্যণীয় এই পুঁজিদারের যুগের বিশেষ লক্ষণগুলি কি. কি? কি ইহার দান ?

(ক) জাতীয়তাবাদ—যাহা এ যুগেই প্রকট হয়। এই জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম্ আবার বাণিজ্য প্রসারের দায়ে পররাজ্যগ্রাসী হয় (predatory), অধীন জাতির 'জাতীয় বোধে'ও বাধা দেয়। যেমন ওলন্দাজরা চাপ দিতে চাহিয়াছে ইন্দোনেশীয় জাতীয় বোধে, ইংরেজ চাহিয়াছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে চাপা দিতে।

(খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—একটু একটু করিয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। প্রথম দিকে পুঁজিদারের দরকার ছিল মজুরের; নবজাত বুর্জোয়া বলিল, প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিবার অধিকারী হউক—কেহ কাহারও ক্রীতদাস বা ভূমিদাস বা গোলাম যেন না থাকে। কারণ তখন সামন্ত ভৌমিকের দাসই ছিল শিল্পী ও কৃষকেরা; সামন্ত মুনিবের কাজ করে; তাহার চাকরানা ভোগ করে, তাহার অনুমতি না পাইলে অন্যের কলে তাহারা কাজ করিতে পারিত না। সামন্ত যুগের ভূমিদাসদের এইরূপ 'স্বাধীন' মজুরে পরিণত না করিতে পারিলে পুঁজিদার মজুরই তখন পাইত না। তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইল পুঁজিদারেরা। মানুষ যেখানে খুশী থাকিবে, যে ভাবে পারে জীবিকা অর্জন করিবে. এই স্বাধীনতা না থাকিলে সে মানুষ কিসে? এই কথা গ্রাহ্য হইলে এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকের নিজের সম্পত্তিতে অখণ্ড অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল—পুঁজিদারের নিজেরও কাম্য ব্যক্তিগত মুনাফা, কাজেই private profit-এর পক্ষেও এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতিই গ্রাহ্য।

(গ) ডিমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্র—'মানুষের অধিকারের' (Rights of

Man) দাবী লইয়া সামন্তদের ও যাজকদের পুরুষানুক্রমিক privileges বণিক ধনিকেরা উচ্ছেদ করেন ও বণিকরা ক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র চালনায় নিজেরা প্রধান পদ গ্রহণ করেন। এই রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন জনগণের সাহায্য লইয়া। তাই তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল রাষ্ট্র পত্তন করেন, ইহাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়াদের এই গণতন্ত্রের অর্থ —রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। উহার কিন্তু অর্থ ইহা নয় যে, আর্থিক বৈষম্যও বিদূরিত হইবে। বরং ব্যক্তিগত মুনাফা সর্ব-স্বীকৃত হওয়ায় সম্পত্তি ব্যক্তিগতই রহিল; তাহাতে ধনের বৈষম্য কার্যত আরও পাকা হইয়া পড়িল। ধনিক শ্রেণীর ভাগ্যবানেরা জন্ম হইতে টাকাকড়ি, শ্রেণী ও পরিবেশের বলে যে সব সুবিধা পায় তাহা অন্য শ্রেণীর লোকেরা শত চেষ্টায়ও পাইবে না। দরিদ্রশ্রেণী, বঞ্চিতশ্রেণী তাই এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র সত্ত্বেও না পায় খাইতে, না পায় পরিতে, না পারে লেখাপড়া শিখিতে, না পায় রাজ্যচালনায় নিজেদের অধিকার দাবী করিতে। ধনিকের চালিত গণতন্ত্রের ভিতরের অবস্থা এইরূপ। যতক্ষণ ধনিকতন্ত্র আছে ততক্ষণ সত্যকার গণতন্ত্র তাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

তবু এই পুঁজিদারের যুগ পূর্বযুগের তুলনায় অনেক উন্নত, তাহা তাহাদের এই সব দান হইতে প্রমাণিত হয়। নীতি অবশ্য নিজের প্রয়োজনেই পুঁজিদার গ্রহণ করিয়াছে, পরোপকারের ইচ্ছায় নয়। তবু তাহাতে মানুষের অধিকার কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে, সভ্যতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদের সংকট

এই পুঁজিতন্ত্র তাহার শেষ পর্যায়ে আসিয়াছে সাম্রাজ্যবাদে। ইহার রূপ আমাদের পরিচিত। মুনাফার লোভে পরের দেশ পুঁজিতন্ত্র জয় করিল। তারপর সেই দেশের শিল্প বিনষ্ট করিল ধনিকেরা নিজেদের দেশের মাল চালাইতে। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারাইয়া হইল চাষী; বাড়াইল সেই হতভাগ্য দেশের চাষীর সংখ্যা। আবার সাম্রাজ্যের শাসন ও শোষণের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যবাদী সেই দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তৈয়ারী করিল তাহার তল্পিদার এক শ্রেণী—দেশী রাজ্য, জমিদার, তালুকদার, মুচ্ছুদ্দি, বেনিয়ান, আর শেষে—কেরানী। অথচ বিজিত

দেশে প্রথম দিকে বিজেতা ধনিকতন্ত্র কলকারখানা গড়িতেও দিল না—পাছে নিজের দেশের পণ্যজাতের সঙ্গে ঐ সব কলের মাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই ভয়ে। কিন্তু সেখানকার তেল, কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি মাল নিজে একচেটিয়া করিয়া লইল। সেই সব দিয়া নিজের দেশের কারখানায় কাপড় বুনিয়া শাসক দেশের ধনিকেরা সেই পরাজিত দেশেই চালায় একচেটিয়া ব্যবসায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বড় কারখানারও দিন আসিল। তখন ক্রমে নিজের ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি হইয়া পড়িল এই সব ব্যবসায়ের মালিক। এই অবস্থাটাতেই লগ্নী পুঁজি (Finance Capital) হয় শিল্পের মালিক। শোষণের নেশা বাড়িয়া গেল, অথচ শোষিতের রক্তাল্পতা দেখা দিতেছে। সেই দেশের নিজের হাতে শিল্প নাই, আছে শুধু চাষী। সেই চাষের উপর সবাই নির্ভর করে—রাজা-রাজড়া, জমিদার ও তালুকদার, মহাজন তো আছেই, সরকারের সমস্ত পাওনাও আছে, বড় মাহিনার কর্মচারী আছে, বিলাতী পেনশেন, ভাতা প্রভৃতিও আছে,—ইহাদের সকলকার এই লুটের বোঝা পড়িল গিয়া দেশের উৎপাদকের উপরে। কে সেই উৎপাদক? মূলত চাষী, আর জনকয়েক খনির মজুর ও কলকারখানার মজুর। ইহারা এই বোঝা বহন করিতে করিতে শেষে মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়ে,—দেশের রাজস্ব যোগাইতে আর পারে না, সাম্রাজ্যবাদীর চালানো মালও কিনিতে পারে না, পাওনাদারের পাওনাও পারেনা মিটাইতে।

এই যখন সাম্রাজ্যের দশা, অন্যদিকে তখন পুঁজিতন্ত্র নানারূপেই অচল হইয়া পড়িতেছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক জগতে পুঁজিদার জাতিদের মধ্যে রেষারেষি বাড়ে, যুদ্ধ বাধে কিংবা বাধে-বাধে। প্রত্যেক জাতিই নিজের শিল্পকে বাঁচাইতে চায় অন্যের শিল্পের আক্রমণ হইতে, তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রই শুল্ক-প্রাচীরে নিজ নিজ দেশ ঘিরিয়া লয়; ফলে সকলকারই ক্রয়বাণিজ্য বাধা পায়। তাহাই ক্রমে আন্তর্জাতিক শুল্ক-দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, ঘরের মধ্যেও পুঁজিদার মুনাফা জমাইয়া ক্রমেই স্ফীত হয়, অথচ বঞ্চিত মজুর দুর্দশাপন্ন থাকে। ইহাতে দেশের ভিতরেও দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য বাড়ে, বিরোধ ঘনাইয়া উঠে, শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দেয়—মূলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব আবার প্রকট হয়। তৃতীয়ত, ক্রমেই নূতন যন্ত্র আবিষ্কারে মজুরদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়ে; আর মজুরেরাই যখন দেশে-বিদেশে সংখ্যায় বেশি তখন তাহারা বেকার হইলে পণ্যক্রয়কারীর সংখ্যাও আসলে কমে। ফলে,

উন্নততর যন্ত্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয়; কিন্তু পণ্য বিক্রয় হয় কম। বিক্রয় না হইলে মুনাফা নাই; তাই পুঁজিদারও তখন কল বন্ধ রাখে। এইভাবে বাড়ে মজুরের বেকারসংখ্যা—আরও জমে দ্বন্দ্ব; দেখা দেয় আর্থিক সংকট।

এইজন্যই উৎপাদন-শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পাইলেও মুনাফাতন্ত্রের চক্রান্তে তাহার সার্থকতা সমাজ আজ করিতে পারিতেছে না। যদি "ব্যক্তিগত মুনাফার" (private profit) দিন শেষ হইত, তাহা হইলে এই যুগের এই ঐশ্বর্য আয়ত্ত করিতে নাকি প্রত্যেক মানুষের সপ্তাহে মাত্র চার ঘণ্টা পরিশ্রমই হইত যথেষ্ট। অবশ্য ইহাও ছিল ১৯৩০-৩৫এর আমলের হিসাব। তাহার পরে যন্ত্র-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত চলিয়াছে এই উৎপাদনে, বণ্টনে, বিনিময়ে একটা অরাজকতা! তাই অর্থ-সংকট দেখা দিতেছে, যুদ্ধ বাধিতেছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিতন্ত্রের দম ফুরাইয়া আসিতেছে। এইবার এক দমকে ইতিহাস যাইবে এই স্তর পার হইয়া—যেমন বহুবার গিয়াছে।

ভবিষ্যৎ ও সমাজতন্ত্র

সেই নূতন স্তরের বিশেষ রূপ কি হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে এখনো বলা শক্ত—কিন্তু ১৯১৮ হইতে ১৯৪৮ এই ত্রিশ বৎসরের সোভিয়েটতন্ত্রের বিকাশ হইতে তাহার রূপ এখন অনেকাংশেই বুঝা যায়। উহা আর এখন শুধু একটা অস্পষ্ট আনুমানিক বিষয় নাই। বুঝিতে পারি—এখনকার সমষ্টিগত উৎপাদনের মত সমষ্টিগত সম্পত্তিরও দিন আসিতেছে। অর্থাৎ কলকারখানা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিবে না, হইবে সাধারণের সম্পত্তি। জমিও প্রথমটা হয়ত হইবে চাষীর, পরে হইবে সাধারণের; চাষী তাহাতে সমবায় সূত্রে সম্মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবে শস্য। কিন্তু চাষীর কিংবা মজুরের উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকারী হইবে তাহারা নিজেরা—কোন মালিক পক্ষ নয়। উহার খানিকটা থাকিবে নূতন যন্ত্র-পাতি আয়ত্ত করার জন্য; কিন্তু মুনাফা না থাকাতে কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না। আর সমাজে মুনাফাদার না থাকাতে একটা সাম্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। গণতন্ত্রের যাহা আসল লক্ষ্য—রাষ্ট্রে ও জীবনে মানুষের সমান অধিকার লাভ,—তাহাই এইভাবে ক্রমশ আয়ত্ত হইবে। এই স্তরটিই আজ আসিয়াছে সোভিয়েট ভূমিতে; তাহার জীবনযাত্রায় ও

মানস-সম্পদে সেই রূপ দেখা দিয়াছে। অবশ্য সেখানেও এখনো মাত্র উহার প্রথম ধাপ 'সমাজতন্ত্র' চলিয়াছে—এখনো উহার নীতি এই—"From each one according to his ability, to each one according to his work."—অর্থাৎ কাজ অনুসারে বেতন, কাজেই মানুষে মানুষে বেতনের পার্থক্য আছে এই 'সমাজতন্ত্র' বা সোশ্যালিজমের স্তরে। কিন্তু এই স্তরেও উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক সমাজ, উহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফার আয়ু শেষ হওয়াতে সে দেশে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগও পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্য প্রধান প্রধান দেশেও এইরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটিলে তবেই সোভিয়েট দেশ নিষ্কণ্টকে 'সমাজতন্ত্র' হইতে 'সাম্যবাদী সমাজের' দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক শক্তিদের উচ্ছেদ ঘটিলে মানুষও বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারিবে, আপনার সৃষ্টির পরিকল্পনার বা প্ল্যানিংএর সহায়ে কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি পাইবে—"Man will at once leap from the realm of necessity to the realm of freedom." সেইদিন মানুষ ক্রমশ বাধ্যবাধকতার, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ও বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে নিজের ব্যক্তি-স্বরূপকে সত্যই চিনিতে পারিবে। সেই ব্যক্তিসত্তা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব মানিয়া সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে—এখনকার মত খণ্ডিত হইয়া যাইবে না। আর, যখন শোষক ও শোষিতই থাকিবে না, তখন যে পরাধীন জাতিরা মুক্তি পাইবে তাহাতো বলাই বাহুল্য। অবশেষে, ধীরে ধীরে আসিবে সেই দিন যেই দিন এই নীতি গ্রাহ্য— "From each one according to his ability, to each one according to his need,"— উহাই আসল কমিউনিজমের স্তর।

কিন্তু কথা হইল মানুষের এই ভাবী যুগ আসিবে কি করিয়া? সামন্ত যুগ ভাঙিয়া নূতন যুগ আনিয়াছে (সামন্তদের) নিম্নেকার বুর্জোয়ারা। বুর্জোয়া যুগও তেমনি শেষ হইবে এই যুগে যাহারা উৎপাদন শক্তিকে বাড়াইতে পারে তাহাদের হাতে—তাহারাই মজুর ও কিসান। আর হয়ত এই গণশক্তির পিছনে থাকিবে সেই নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দল, যাহারা যুক্তি দিয়া বুঝিতেছে কেন বর্তমান অবস্থা অচল, আর কী হইবে ভবিষ্যৎ। এই যে রূপান্তরের পথ তাহা যতই সুগম হইবে ততই

সমাজের মানুষ বুঝিতে পারিবে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও ইহার অনিবার্যতা। এই জ্ঞানটা সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দেওয়াই তাই প্রকৃত শান্তিকামীর ও প্রগতিকামীর কাজ। এই চেতনা (consciousness) জনসাধারণের মধ্যে, মজুরের মধ্যে, কিসানের মধ্যে প্রাণের দায়েই আসিতেছে; বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের বেকার দশায় তাহা বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু তবুও সচেতন হইতে হইবে বুদ্ধিজীবীদেরই বেশি, চেতনা-সঞ্চারের দায়িত্ব তাহাদেরই হাতে, তাহাদেরই হাতে এখন পর্যন্ত সংস্কৃতির দায়ভাগ।

ইতিহাসের ছন্দ

মানুষের ইতিহাসের এই এক নিঃশ্বাসে দেওয়া অস্পষ্ট আভাস, এই বিশ্ববীক্ষা (Weltanschaung) আমাদের সম্মুখে রাখা দরকার,—জগৎ ও জীবনের দূরপ্রবাহী স্রোতের মধ্যে আমরা কোথায় দাঁড়াইয়াছি দরকার তাহা আমাদের বুঝা। বলা কি প্রয়োজন, কোনো দেশের ইতিহাসেই অন্য কোনো দেশের ইতিহাসের শুধুমাত্র পুনরুক্তি হয় না? ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী নয়, ইতিহাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য। তাহার ছন্দের মিল পংক্তির অভ্যন্তরে: সূক্ষ্মতর নিবিড়তর সেই মিল। মানব-ইতিহাসের সেই বিরাট ছন্দের সঙ্গে স্বদেশের ইতিহাসের ছন্দটিও মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইতিহাসের এই পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটিকেও যাচাই করিতে হইবে এইরূপ বাস্তবদৃষ্টিতে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কোন্ নূতন রূপ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—আমাদেরও সংস্কৃতি সকল জাতির সংস্কৃতির মতো কি করিয়া এক বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

ইতিহাসের ধারা—অমিত সেন
মানব সমাজ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন
মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ—সুশোভন সরকার

বাজে লেখা—লেখক
পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্র—এঙ্গেল্‌স্
Imperialism—Lenin.
On Religion—Lenin.
What Happened in History—Gordon Childe (Pelican).
Man Makes Himself— „ „ (Watts & Co).
A Short History of Culture—Jack Lindsay.
Ancient Society —Morgan.
From Savagery to Civilisation—Graham Clark (Cobbett).
Science of Life—H. G. Wells, Julian Huxley, C. P. Wells.
The Story of Tools—Gordon Childe (Cobbett, London).

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা

আদিরূপ

ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা প্রধানত কৃষিজীবী সমাজের সংস্কৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই অবশ্য ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-উদ্যোগের সূচনা হইতে থাকে। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জীবনে বা মনে শিল্পযুগের রঙ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তখনো ভারতীয় সমাজ প্রধানত কৃষি-নির্ভরই ছিল। কৃষি-সমাজ একান্তভাবেই প্রকৃতির নিয়মে চলে, ঋতুর সঙ্গে তাহার ভাগ্য বিজড়িত। কৃষি-সমাজের সংস্কৃতিতে, তাহার জীবন-যাত্রা ও মানস-সৃষ্টিতেও তাই এই প্রকৃতির প্রভাব প্রবল। কৃষি যুগে তাই বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট মানব প্রকৃতির বশ্যতার, অসহায়তার ও আত্মসমর্পণের চিহ্ন বেশি লক্ষিত হয়।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মানুষেরাও তাই আত্ম-নির্ভরশীল নহে। স্বভাবতই উপরের দেবতার দিকে চাহিয়া থাকে, অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী ও রহস্যবাদী। তাহাদের সাহিত্য, দর্শনেও তাই মানুষের বিজয়ের স্তব অল্প। আত্মনির্ভরশীল স্পর্ধা তাহাতে নাই, আছে অদৃষ্টবাদ, ভাববাদ ও সহজ আত্ম-সমর্পণ। ইহা কৃষি-সংস্কৃতিরই সাধারণ লক্ষণ। এই কারণেই প্রাচীন কৃষি-সমাজে অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্মবাদ স্বাভাবিক। তাহার উপর নানা বার পরাজয়ে ভাববাদ ভারতীয় সংস্কৃতির একটা লক্ষণ হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি অবশ্য আজ ভাঙ্গিতে বসিয়াছে; ইহারই রূপান্তর আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ১৯৪৭-এর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই প্রকাণ্ড সত্য আংশিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজনীয় রূপান্তর এখনো অসমাপ্ত রহিয়াছে। তথাপি এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সামান্য পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে পারি—বুঝিয়া দেখিতে পারি তাহার খাঁটি বৈশিষ্ট্য, ও আসল বৈচিত্র্য। ভারতীয়-সংস্কৃতি মূলত কৃষিগত, ইহাতে ভুল নাই। কিন্তু এখানে শিল্পযুগ আসিয়াছে;—আগামী দিনে ভারতে শিল্প উৎপাদনের শক্তিও ক্রমশ প্রসারিত হইতে বাধ্য, তাহাও ভোলা সম্ভব নয়। তখন শিল্প-প্রধান সভ্যতার

লক্ষণও ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কৃষি-সভ্যতার যে প্রধান দুইটি লক্ষণ বা বিশেষত্ব এই ভূখণ্ডে এতদিন স্পষ্ট দেখা গিয়াছে তাহার পরিচয় লওয়া সমীচীন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ মনে হয় ইহার **ধারাবাহিকতা**। এখানে কৃষি-সভ্যতা খুব দীর্ঘদিন টিঁকিতে পারিয়াছে। ইহা আরম্ভ হইয়াছে অনেক দিন—অন্তত হাজার পাঁচ বৎসর পূর্বে; আর চলিতেছে এখনো। কৃষিকার্য এ দেশে বৃটেনের মত একেবারে নগণ্য-জীবিকাপ্রণালীতে বোধহয় পরিণত হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট ভূমির মত এই দেশেও শিল্প-চালিত কৃষির প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু কৃষি-সভ্যতার এতদিন পর্যন্ত এই দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রসার সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে; সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ও বিস্তৃত সমতলভূমি কৃষি-সমাজের বিকাশের পক্ষে ছিল পরম অনুকূল। আর 'দেবতাত্মা হিমালয়' ভারতীয় সমাজকে অনেকাংশে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই কৃষি-সভ্যতাও দ্বন্দ্ববিরোধ বর্জিত নয়, ইহাতেও নানা বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এই দীর্ঘ জীবনের সম্পদ তবু ভারতবাসী মোটের উপর সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে; নীল-নদের উপকূলস্থ সভ্যতার মত, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার মত উহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখানেও মাঝে মাঝে বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, 'অন্ধকার যুগ' আসিয়াছে, বহুকাল অনেক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সংবাদও বিশেষ পাওয়া যায় না;—এই সব কথা সত্য। কিন্তু তথাপি তখনো সংস্কৃতির ধারা একেবারে মিলাইয়া যায় নাই তাহা বুঝা যায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়াও ইহার ধারাবাহিকতা অনেক জিনিস জিয়াইয়া রাখিয়াছে,—কোথাও নতুনকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে, কোথাও উহাকে রাখিয়াছে টানিয়া-বুনিয়া আপনার সঙ্গে শুধু যুক্ত করিয়া। এইরূপ **সহনশীলতা**ও ভারতীয় সংস্কৃতির ছিল, আর উহাই তাহার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাকে কোন কোন দার্শনিক বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের সমন্বয় শক্তি; কেহ বলিয়াছেন—বহুকে এক করিবার সাধনা; আর কেহ বা বলিয়াছেন—সবল গ্রহণশীলতা; আর অন্য অন্য কেহ—অক্ষম নমনীয়তা। যাহাই তাহা হউক, আমাদের বর্তমান কালের

সংস্কৃতির মধ্যেও এই দুই কারণে বহু বহু দিনের পুরাতন বীজকণা জমা হইয়া আছে, অতীতেরও নানা পর্যায়ের উদ্ভাবনা মিলাইয়া আছে, ইহা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন। আর তাহার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রধান লক্ষণও আমাদের সহজেই চোখে পড়ে—ইহার **বৈচিত্র্য**। পুরাতন কিছুকে আমরা একেবারে বিলুপ্ত হইতে দিই নাই; আদিম জীবন-যাত্রার ছাপ নানাথানে দেখা যায়। আবার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ, দেশও প্রকাণ্ড, প্রায় একটি মহাদেশ। কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা উদ্ভূত ও বিকশিত (evolved) হইয়াছে, আমরা তাহাও নানাভাবে কালধর্ম, লোক-আচার, বা বিশেষ বর্ণের বা বিশেষ অঞ্চলের আচারধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। ইহা ছাড়া বারেবারে বিদেশী শাসক আসিয়াছে; বিদেশী-উদ্ভাবিত জীবিকা-পদ্ধতি ও উহার ধ্যান-ধারণা ভারতবর্ষেও প্রসারিত ('difiused') হইয়াছে—যখনি ভারতবর্ষে তদুপযোগী প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ তাহা লাভ করিয়াছে। সেই সব 'দান' আসিয়া ভারতের নিজস্ব 'অবদানকে' আরও নূতন করিয়া দিয়াছে। তাই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মোটামুটি—অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও—'ঐক্যবদ্ধ' রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে এই ভারতীয় সংস্কৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্য।

বৈশিষ্ট্যের অর্থ

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লইয়া যাঁহারা গর্ব করেন তাঁহারা বলিতে চান —ভারতীয় সংস্কৃতি অনাদি-অতীত, অপরিবর্তনীয়; তাহা এক শাশ্বত সম্পদ। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রমাণ যে, (১) ভারতীয় সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় নয়, তাহার রূপান্তর হইয়াছে বারে বারে। (২) ভারতের একত্ব সাংস্কৃতিক হিসাবে সত্য এই জন্য যে, ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের সমাহার। (৩) এই সংস্কৃতি প্রাচীন হইলেও প্রাচীনতম সভ্যতা নয়। জীবিত সভ্যতার মধ্যে চীনা সভ্যতাও এমনি দীর্ঘায়ুর গর্ব করিতে পারে। (৪) মোটামুটি এই সংস্কৃতি সর্বাংশেই কৃষিযুগের মধ্যেই নিবদ্ধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয়—প্রথমত কৃষি-সভ্যতার পূর্বেও মানুষ জীবিকা-সংগ্রামে ও প্রকৃতি-জয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে—ভারতবর্ষেও সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সংস্কৃতির চিহ্ন রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কৃষি-সভ্যতাও আবার নানা স্তরের মধ্য

দিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—কোনো একটি বিশেষ স্তরে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, থাকিলে তাহারও মৃত্যু ছিল অনিবার্য। মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে কৃষি-সভ্যতার সেই স্তরগুলি দেখিতে পাই। আর স্মরণীয় এই যে, কি প্রাগৈতিহাসিক কালে, কি ঐতিহাসিক কালে—এই কৃষি-সভ্যতার কাঠামোর মধ্যেও—সর্বস্তরে ও সর্বদেশেই যেমন, তেমন ভারতবর্ষেও দেখিতে পাই,—জীবনযাত্রার নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মানুষ পরস্পরের সম্পর্কের নূতন পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে; আর সেই সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার-বিচারকে অবলম্বন করিয়া আবার তাহার মানস-লোক নূতন সৃষ্টিতে (creations) মঞ্জরিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিরও স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার বিভিন্ন যুগের পরিচয় এইরূপ ভাবেই গ্রহণ সম্ভব—তাহার প্রত্যেক যুগের উপকরণগত, সমাজগত এবং মানসগত রূপ—এই তিন অঙ্গ, তিন অবয়ব, উহাদের পরস্পর সম্পর্ক ও সক্রিয় পরিণতি—এই সব প্রত্যেক স্তরেই বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন;—তবেই এই পরিচয় বাস্তব ও সত্য হয়।

কিন্তু দেখিয়াছি, আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব লই অন্য রূপে। হয়ত ধর্ম দ্বারা; যেমন, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি। কিংবা ভৌগোলিক ভাগের দ্বারা—বাংলার কাল্‌চার, "ভগীরথ কাল্‌চার।" কিংবা ভাষাগত জাতি হিসাবে; যেমন, তামিল সংস্কৃতি, অন্ধ্র সংস্কৃতি, বাঙালী সংস্কৃতি, ইত্যাদি। বলিয়াছি, এই সব হিসাব যে একেবারে মিথ্যা তাহা নয়। ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। 'ভগীরথ কালচারের' সঙ্গে নিশ্চয় পদ্মাপারের জীবন-পন্থারও তফাৎ আছে। বাঙালীর ও হিন্দুস্থানীর কাল্‌চারেরও তফাৎ আছে। কিন্তু এই সবই গৌণ তফাৎ। বরং এই বিভিন্ন ধরণের বাহ্য লক্ষণই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। কিন্তু বারেবারেই মনে রাখা দরকার, সংস্কৃতির বিচারক্ষেত্রে মূলসূত্র ধর্ম নয়, দেশ নয়, জাতি নয়; সেই সূত্র জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণ, সামাজিক ব্যবস্থা, এবং তাহারই সহায়তায় সৃষ্ট মানসিক সম্পদ। তাই, এই দিক হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমপরিবর্তিত ধারাও বিচার করিতে হয়।

প্রমাণ-পঞ্জী

কিন্তু কথা এই, জীবনযাত্রার বস্তু-উপকরণ ক্রমশই পরিবর্তিত হয়, তাই সমাজও পরিবর্তিত হয়, মানসিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটে; তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রথম দিককার অধিবাসীদের প্রাথমিক জীবনযাত্রার রূপ আমরা জানিতে পারি কোথা হইতে? ইহার উত্তর অবশ্য আজ সুবিদিত। যে সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ প্রাচীন মিশর, সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছে, সেই সব বৈজ্ঞানিক উপায়েই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসও আমরা জানিতে পারি। এখানে সেই সব উপায়ের কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি এই বিদ্যারই নাম পুরাতত্ত্ব। ভূতত্ত্ব, প্রত্নজীববিদ্যা ও নৃতত্ত্ব লইয়া ইহা শুরু। প্রথমত ভূতত্ত্ব বলিয়া দেয় কোন্ যুগে, কোন্ ভূখণ্ডে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল কিরূপ। সেই নানা ভূস্তরে লুপ্ত জীবের হাড়গোড়, খুলি লইয়া গবেষণা করে প্রত্নজীববিদ্যা। তারপর নৃতত্ত্বের বিবিধ শাখা বলিয়া দেয়, কোন্ দিকে মানুষ দেহ-মন-জীবিকায় কোন্ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পুরাতত্ত্ব প্রাচীনকালের মানুষের ধ্বংসস্তূপের, ভূগর্ভের ও গুহা-গহ্বরের লুপ্ত ও লুক্কায়িত সাক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করে। এদিকে জাতিতত্ত্ব একদিকে বর্তমানের মানব-দেহের মাথা, চোখ, নাক, চুল, চোয়াল, নানা অবয়বের মাপ-জোঁক লইয়া তাহার মৌলিক বিবিধ গঠন বিশ্লেষণ করিয়া দেয়; আবার সেই দেহ-পরিমাপ-বিদ্যার দিক হইতেই তারপর পুরাতত্ত্বের প্রমাণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে প্রাচীন মানুষের অনুরূপ দেহাবশেষের প্রমাণগুলি। সমাজ-তত্ত্বও আধুনিক অনগ্রসর ও অগ্রসর মানব-গোষ্ঠীর রীতিনীতি আচারবিচারকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আদিম মূলকে বাহির করে। এমন কি, এইভাবে ভাষাতত্ত্ব পর্যন্ত মানুষের প্রাচীন সংস্কৃতির উপর এক একবার এইরূপ অভিনব আলোকপাত করিতে পারে যে তাহা সাধারণত আমরা ভাবিতেই পারি না। এইসব বিবিধ বিজ্ঞানই সংস্কৃতির পথে আমাদের দিগ্‌দর্শনের পক্ষে নির্ভরযোগ্য যন্ত্র। মানব-সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পরিচয়ে ইহাদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য—কল্পনাকুশল ভাবুকদলের ও ধর্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞদের তাহাতে যতই আপত্তি থাকুক। অবশ্য এই বিবিধ শাখার প্রমাণসমূহ সব ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপোষক নয়। তথাপি ইহাদের সকল

সাক্ষ্য মিলাইয়া পাঠ করিলে প্রাচীনের একটা যুক্তিসহ ও বোধগম্য চিত্র লাভ করা যায়।—এইভাবেই পুরাতনের প্রমাণ-পঞ্জী সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধ হয়।

ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগের সভ্যতা

প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলির কাল নিরূপণ ভূতাত্ত্বিকদের সহায়তাতেই করিতে হয়—এইরূপ প্রস্তর নিদর্শন ভারতবর্ষেও মিলে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম দিক্‌কার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার কথা, এমন কি তাহাদের বাস্তব অবলম্বনের কথাও বেশি বলিতে পারেন না। ভূমিপৃষ্ঠের নানা স্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের (পাকিস্তানে, শিবালিক অঞ্চলে ও হিমালয়ে), মধ্য ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক নদীতলে বা পর্বতকন্দরে অবশ্য প্রস্তরোপ-করণ প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ও নবীন, দুই প্রস্তর যুগের উপকরণই তাহাতে আছে—তাহার নানা স্তরের প্রমাণও রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত উধ্বর্-শিবালিক শৈলস্তরের মনুষ্য নির্মিত প্রাচীন প্রস্তর হাতিয়ারসমূহ—ইহাকে 'প্রাক্-সোয়ান্ প্রস্তরশিল্প'ও বলা হয়। ইহার পরে মোটামুটি দুইটি বিশিষ্ট ধারা দেখা যায় উত্তরে সিন্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়, দক্ষিণে নর্মদা ও দাক্ষিণাত্যের শৈলস্তরে। একটি 'সোয়ান উপকরণ' নামে অন্যটি 'কাবৃত্রাস উপকরণ' নামে অভিহিত হইতে পারে। উভয়েই প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রমাণ। দক্ষিণাপথে এইরূপ প্রাচীন প্রস্তর যুগের নিদর্শন চিঙ্গলিপুটের, এবং নবীন প্রস্তর যুগের নিদর্শন দক্ষিণে বেরিলি জিলার ও ইউ-পি বা সংযুক্তপ্রদেশের মির্জাপুরের প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারমালায় দেখা যায়। এইরূপ এক একটি স্তরের মধ্যে কত সুদীর্ঘ বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রের মত এই সব কোনো কোনো নিদর্শনও (যেমন, নিজাম রাজ্যের মস্‌কিতে) স্বর্ণখনির সন্নিকটেই লাভ করা যায়। খনির অভ্যন্তরে যে সে যুগের মানুষ নামিয়া সোনা কুড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'অসভ্য' জাতিরাও স্বর্ণের সমাদর জানিত। তবে, এই স্বর্ণ ব্যবহার অবশ্য নূতন প্রস্তর যুগেরও কাল সূচনা করে। কারণ, ইহাতে বুঝা যায়, তখন ধাতুর মর্যাদা মানুষ বুঝিয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া 'বৃহৎ'-প্রস্তর আচ্ছাদন (megalithic) হইতে

তাহাদের জালায়-নিহিত শব-সংকার-পদ্ধতিও দেখিতে পাই। মৃতের সেই প্রকোষ্ঠে দেখি, তাহাদের জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি আছে,—মৃত্যুর পরেও মৃত মানুষের যেন ঐ সব ব্যবহার্য চাই! আর সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারি—মৃত্যু সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা কিরূপ। প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিক হইতে নূতন প্রস্তর যুগের শেষ দিক পর্যন্ত 'হস্ত-কুঠার সভ্যতার' ('Hand-Axe Culture') নিদর্শন কাশ্মীরে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতেও যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার একটা স্তরবিভাগও করিতে পারিয়াছেন। তাহা হইতেও সে যুগের মানুষের জীবিকা ও জীবনের একটা অস্পষ্ট আভাস আমরা পাই। কিন্তু তাহার সামাজিক রূপ উহার বেশি জানিতে পারি না। আর তাহার মানসিক রূপেরও চিত্র পাই মাত্র ততটুকু যতটুকু আছে তাহার ঐ উপকরণ সমূহে। ইহার পরবর্তীকালের নিদর্শন পাটোয়ার বা রাওলপিণ্ডির নিকটস্থ সোয়ান নদীর উপত্যকার তথাকথিত "সোয়ান-সভ্যতা" ('Soan Culture')—পাথরের ছিল্‌কে ("flake industry") তাহাতে অপর্যাপ্ত। কিন্তু এই যুগের কোনো কোনো পর্বের, যেমন সোল্যুট্রিয়ান ও ম্যাগ্‌ডালেনিয়ান্ পর্বের, নিদর্শন ভারতবর্ষে এখনো পাওয়া যায় নাই। এবং শেষ দিনকার পাঞ্জাব, মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতের ক্ষুদ্র নিদর্শনের (মাইক্রোলিথিক) সঙ্গে আফ্রিকা ও সিরিয়ার অনুরূপ (মেসোলিথিক্) নিদর্শনের মিল আছে। নূতন প্রস্তর যুগের প্রাক্‌ক্ষণ (Proto Neolithic) ও তাহার শেষ স্তর (Late Neolithic) পর্যন্ত সেই সব উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল ক্ষেত্রেই এই মাইক্রোলিথিক্ প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীনগরের সন্নিকটস্থ বুর্জাহোম নামক স্থানের "বৃহৎ-প্রস্তর"-নিদর্শন-স্থলীতে পাওয়া গিয়াছে ইহারও পরেকার কালো বার্ণিশ করা পোড়ামাটির জিনিস (ceramic ware)—ঠিক যেমনটি মোহেন-জো-দড়োতে আসিয়া পুরাতাত্ত্বিকের মিলিয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে প্রস্তর-যুগের মধ্যে আমরা কৃষিযুগে আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছি। নূতন প্রস্তর যুগের সভ্যতা ভারতবর্ষে যে তাম্রপ্রস্তর chalcolithic যুগে উত্তীর্ণ হইতেছে, ইহা কাশ্মীর ও সিন্ধু উপত্যকার সেই নিদর্শন-সমূহ হইতে বুঝিতে পারি। তেমনি ঐ নিদর্শনগুলি হইতেই বুঝিতে পারি যে, নব্য প্রস্তর যুগেরও মানবগণ প্রথম উত্তর-পশ্চিম ও সিন্ধু-উপত্যকা এবং ক্রমে তাহারও দক্ষিণস্থ নর্মদা উপত্যকার ও দক্ষিণাপথের উপর দিয়া ভারতবর্ষে ছড়াইয়া

পড়িয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য *An Outline of Racial Ethnology in India*—B. S. Guha, Royal Asiatic Society of Bengal, 1937, এবং '*Stone Age in India*—Krishnaswamy, *Ancient India*, NO. 3)। গঙ্গার উত্তরে ও পূর্বে কিন্তু প্রস্তর যুগের নিদর্শনের প্রকাণ্ড অভাব, তাহা লক্ষণীয়। ১

ভারতের আদিবাসী

হয়ত এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীদের কথা বলিতে পারে জাতিতত্ত্ব। জাতিতত্ত্ব ভারতীয়দের দেহের গঠন বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে চাহে—বর্তমান ভারতবাসীরও মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি জাতির চিহ্ন এখনো লাভ কর যায় (*An Outline of Racial Ethnology in India*—ঐ): যেমন, এক, নিগ্রোবটু মানুষ :—আন্দামানে, মাদ্রাজ প্রদেশের আন্নাই-

১ 'ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগ' বিষয়ক আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বে একটি মোটামুটি প্রামাণিক বিবরণ সম্প্রতি সংক্ষেপে দান করিয়াছেন সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের বুলেটিন 'Ancient India'র ৩য় সংখ্যায় (পৃঃ ১১-৫৭) শ্রী ভি, ডি, কৃষ্ণস্বামী। সাধারণ পাঠকের নিকট সহজপাঠ্য না হইলেও প্রবন্ধটি তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে ;—এবং 'সোয়ান-প্রস্তর-শিল্প,' ও 'মাদ্রাজ প্রস্তর শিল্পের' চিত্রাবলী ও 'প্রস্তর যুগের নিদর্শন সূচক ভারতবর্ষের মানচিত্র' প্রবন্ধের চিত্রসমূহ ও পরিভাষার নির্ঘণ্ট নানা তথ্য বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা করে। ঐ প্রবন্ধের সারাংশ এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিককার নিদর্শন মিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে (অর্থাৎ পাকিস্তানের) প্রাক্-সোয়ান পাথরের ফ্লেক্ নিদর্শনে (শিবালিক পর্বতের উচ্চস্তরে উহা দেখা যায়)। ইহার পরে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে মোটামুটি দুইটি শিল্পধারা দেখা দেয়,—একটিকে 'সোয়ান-শিল্পধারা' (ফ্লেক্ধারা) বলা যায়, প্রধানত উহার চিত্র উত্তরে, সিন্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়, অন্যটিকে 'মাদ্রাজ শিল্পধারা' ("হস্ত-কুঠার" ধারা) বলা হয়, প্রধানত দক্ষিণাত্য ইহার কেন্দ্র, ইউরোপ-আফ্রিকার অনুরূপ ধারা ইহার সহিত তুলনীয়। 'ক্ষুদ্র প্রস্তর' নিদর্শনগুলি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের 'মেসোলিথিক' সন্ধিস্তরের সমতুল্য —প্রাচীন হইতে নব্য প্রস্তর যুগের সন্ধিকালের সৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়—পাঞ্জাব, মধ্যভারত, গুজরাট, দক্ষিণ ভারতে এই ক্ষুদ্রপ্রস্তর নিদর্শনকেন্দ্র যথেষ্ট, কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের বীজক্ষেত্র ("প্রোটোলিথিক') উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ—সেখান হইতেই তাহা নব্য প্রস্তর যুগে দক্ষিণে প্রসারিত হয়, ইহা অনুমান করা চলে। বলা বাহুল্য, ভারতে আবিষ্কৃত এই সব বিবিধ স্তরের ও বিবিধ ধারার নিদর্শনের সহিত আফ্রিকার ও ইউরোপের, ও পশ্চিম এশিয়ার (নিকট প্রাচ্যের) অনুরূপ স্তরেরও ধারা নিঃসম্পর্কিত নয়। কিন্তু জাভার "হস্ত-কুঠার" প্রস্তর শিল্পের কোনো ধারা ব্রহ্মে মালয়ে পাওয়া যায় নাই ; এবং জাভা ও ব্রহ্মের (এশিয়ায় চীনের প্রান্ত পর্যন্ত) অনুরূপ নিদর্শনের সহিত সোয়ান উপত্যকার ঐ জাতীয় নিদর্শনের পার্থক্য যথেষ্ট—বিশেষত গঙ্গারও পূর্বে কোনো কিছুই ভারতবর্ষে এ যুগের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তাই পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার সহিত কোনো সম্পর্ক অনুমান সহজ সাধ্য নয়। জাতিতত্ত্ব সে সন্ধান দেয়।

মালাই পর্বতের কাদর ও পুলয়ন, আসামের আঙ্গামী নাগা, আর রাজমহলের বাগ্দীদের মধ্যে নাকি এই জাতির প্রমাণ রহিয়াছে। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অবশ্য কেহ কেহ গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও স্মরণীয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিলে মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক বৃহৎ-প্রস্তর-নিদর্শনগুলির সঙ্গে এই জাতীয় লোকেরই সংযোগ থাকিবার কথা। "শিকারলব্ধ মাংস ও বন্য কন্দ মূল ইহাদের আহার ছিল, কৃষিকার্য ইহারা জানিত না এবং ইহাদের সভ্যতার কোনো বালাই ছিল না।" এক সময়ে আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে ও ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির বসবাস ও গতায়াত ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত প্রস্তরযুগ জুড়িয়া ইহারাই ছিল ভারতের অধিবাসী। দুই, আদি অস্ট্রলয়েড্ বা অস্ট্রিক, অর্থাৎ 'পূরবীয়া' মানুষ :—ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতের মুণ্ডা, কোল, ভীল, বাদাগা, কেরিয়, খরবার ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আজিকার 'আদিবাসী' (অবশ্য তাহাদেরও আদিতে নিগ্রোবটুরা হয়ত এই দেশে বাস করিত। তাহা সত্য হইলে সেই নিগ্রোবটুদের সহিত ইহাদেরও রক্তের সংমিশ্রণ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল), আর দাক্ষিণাত্যের চেঞ্চু, কুড়ম্ব, মালয়ন, য়েড়ুব প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে সেই 'পূরবীয়া' বংশধরদেরই পাওয়া যায় (দক্ষিণেই নাকি ইহাদের মধ্যে নিগ্রোবটু সংমিশ্রণের চিহ্ন স্পষ্টতর)। আমাদের সুপরিচিত খাসিয়া জাতি এই আদি-অস্ট্রলয়েড্ বা অস্ট্রিক জাতির খাঁটি নিদর্শন—ভাষা হিসাবেও বটে, জাতি হিসাবেও বটে। দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলি জিলার বৃহৎ-প্রস্তরের (মেগালিথিক্) নিদর্শনগুলির মধ্যে দেহাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা এই অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরই দেখিতে পাই, মৃতের উপযোগী জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি সেখানে রহিয়াছে ও মাটীর জালায় ইহাদের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে; সেই শব ও উপকরণ সুবৃহৎ প্রস্তরের দ্বারা চিহ্নিত। ইহাতে বুঝিতে পারি, মৃতকে ইহারাও একেবারে নিষ্প্রাণ মনে করিত না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, তাহাদের বিস্তারের পথ ছিল এইরূপ: 'মনে হয়, ইন্দোচীনের কোথাও হয়ত এই জাতির প্রথম উদ্ভব; তাহার পর দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া ইহাদেরই কোনো শাখা মালয় জাতিতে, পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পলেনিসীয় ও মেলেনসীয় জাতিতে, দক্ষিণ বর্মা ও শ্যামে মোন্ ও খ্মের প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের বিভিন্ন শাখা আসামের

উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে।......উত্তর ভারতে ও বাঙ্গলাদেশে বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না।" ('জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ এবং *Ancient India*—Massoon-Oursel, Grabowska & Stein)। আবার, ঠিক ইহার উল্টা পথও অনুমিত হইয়াছে—ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের উপর দিয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও উহার দ্বীপপুঞ্জে এই জাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব ভারতের কৃষি-সভ্যতার প্রারম্ভ

এই অস্ট্রিক বা আদি-অস্ট্রলয়েডদের সভ্যতার প্রমাণ অবশ্য ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের মারফৎই আমরা পাই (দ্রষ্টব্য: ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জাতিতত্ত্বের দিক হইতে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করা কর্তব্য)। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আমাদের ভাষায় যেই-সব মূল শব্দ সম্ভবত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দান, মনে করিতে পারি, সেই সব দ্রব্যের সঙ্গে অস্ট্রিকদেরই পরিচয় হয় সর্বাগ্রে। এই সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা-বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের সভ্যতার যে আভাস দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে সে সভ্যতার বস্তু-উপকরণ ছিল এইরূপ: "অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে (পূর্ব ও মধ্য ভারতে?) প্রথম কৃষিকার্য ও তদবলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা ও নারিকেলের চাষ করিত (দ্রষ্টব্য এই যে, বাংলাদেশে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে ইহাদের কোনো-কোনোটি না হইলে আজও চলে না।—বর্তমান লেখক); পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের ক্ষেত প্রস্তুত করিত। প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত; লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্মমুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিত (ধাতুর ব্যবহার তখনো জানা ছিল না বলিয়া)। ধনুর্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একখণ্ড গুঁড়িকাঠে তৈয়ারী ডোঙ্গায় (দ্রষ্টব্য, আজও পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে তেমনি 'কোন্দ' বা খোঁদা নৌকা খালে-বিলে প্রধান বাহন।—বর্তমান লেখক) এবং কতকগুলি গুঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের বড় বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত।" মোটামুটি এই চিত্র হয়ত গ্রহণযোগ্য। আসলে ইহা নব্য প্রস্তর যুগের 'বর্বর-জীবনে'র চিত্র, তাহা

আমরা পূর্ব পরিচ্ছদে দেখিয়াছি, ভারতবর্ষের সেই সময়কার মানুষদের যে জাতীয় বা যে গোষ্ঠীর বলিয়াই এখন আমরা নাম দিই। কৃষি-যুগের প্রথম সামাজিক রূপ ও গঠন এই সব দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই এই দেশে গড়িয়া উঠে—ধান, পান, কলা, নারিকেল ইত্যাদি। ইহাদের সভ্য ও আদিবাসী বংশধরদের মধ্যে আজও অনেকাংশে তাহারই মূল রূপ হয়ত রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু তাহাদের মানসিক রূপ ছিল কিরূপ? শব-সৎকার ও অন্যান্য পদ্ধতি হইতে তাহার যে আভাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তী, এমন কি বর্তমান ভারতীয় অনুরূপ প্রথা ও ধারণার তুলনা চলে। এইরূপ তুলনায় দেখি যে, যেমন সেই আদি অস্ট্রলয়েড্‌দের বা ঐরূপ প্রাচীন মানুষের উপকরণ ও আচার-ধারা এখনো আমরা গোপনে কিছু কিছু বহন করিতেছি, তেমনি তাহাদের প্রাথমিক ভীতি, বিস্ময় ও পূজা ও ধর্মকর্মও নানা সূত্রে আমাদের 'অধ্যাত্ম-সম্পদের' মধ্যে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। "ইহারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত—মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে, অথবা অন্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণাই ইহাদের ছিল। এই ধারণাই পরবর্তীকালে ইহাদের লইয়া হিন্দুজাতি সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য দান—ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহারা হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড়ে বা বল্কলে জড়াইয়া বৃক্ষস্কন্ধে মৃতদেহ রাখিয়া দিত; অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তরখণ্ড খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দিত।...উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমত এই অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে; সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। 'গঙ্গা' এই নামটি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি।"

যে কথাটি এইখানে প্রণিধানযোগ্য তাহা এই:—ভারতীয় সংস্কৃতি কৃষিগত তখন হইতেই; তাহার সেই কৃষিরূপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও সর্বাংশে পরিবর্তিত হয় নাই। তাই সেই আদিম ভিত্তি বা কৃষি যুগের প্রাথমিক দানের এত বিশদভাবে আমরা পরিচয় গ্রহণ করিতে চাই—

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে সেই জাতির বা গোষ্ঠীর নাম যাহাই স্থির হউক, তাহাতে আসে যায় না। এইটুকু পরিচয় না লইলে ভারতীয় সভ্যতার এই দিককার রূপও আমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে, স্তরের পরে স্তরে ইহার যে ক্রমবিবর্তন ঘটিয়াছে তাহারও মূল্য অপরিজ্ঞাত রহিবে—বিশেষত যখন পূর্ব ও মধ্য ভারতের প্রাগৈতিহাসিক তথ্য এখনো প্রায় অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অস্ট্রিক জাতির মানসিক প্রণবতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইতে পারে। কিন্তু কোনো বাস্তব প্রাচীন প্রমাণের উপর তাহা গঠিত, না আধুনিক অস্ট্রিক বংশীয়দের মতিগতি ও অবস্থা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন :—'অস্ট্রিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন এবং সংহতিশক্তিতে হীন ছিল; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।...ইহা বেশ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে—ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অস্ট্রিক প্রভাবের ফল। অস্ট্রিকেরা গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধহয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল।" এক একটা মানবযূথের মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে মনের এক-একটা বিশেষ বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহা, প্রথমত "রক্তের গুণ" নয়; দ্বিতীয়ত, তাহাও আবার অপরিবর্তনীয় নয়; আর তৃতীয়ত, বর্তমানকালে কোন জাতিরই রক্ত অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ নাই—সম্ভবত পূর্বেও বিশেষ ছিল না; এই সব মনে রাখিয়া উপরকার উক্তিটি যথাভাবে গ্রহণ করা দরকার। উহা একটা অনুমান মাত্রই বলা চলে—সাধারণ অনুমান, বৈজ্ঞানিক অনুমান নয়।[১]

১ অমুক 'জাতির' (race) মানসিক ধর্ম এইরূপ—এই মর্মের কথা বলার অর্থ—মানুষের চিন্তায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন-প্রথার প্রাধান্যকে অস্বীকার করা। স্বভাবতই শাসক-গোষ্ঠীর, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবযুক্ত বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ 'জাতির ধর্মের' উপর জোর দেন;—সাম্রাজ্যবাদীরা 'প্রভুজাতি' (আর্য?) আর

মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতির খানিকটা প্রারম্ভ প্রায় আমরা এই সব বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি। বিশেষত পূর্বভারতের জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণ, ইহার কৃষিমূলক সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা, এবং ইহার মানসিক ধারণা এই তিনেরই একটি আভাস পাই।

বহুশত বৎসর ধরিয়া এই যে কৃষি-সভ্যতা ভারতের নানা খণ্ডে এইরূপে ইতিহাসের অজ্ঞাতে কোনো স্থায়ী কীর্তি না রাখিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা একই ভাবে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে নাই, তাহাও দিনের পর দিন বিকশিত হইয়া চলিয়াছে,—জীবিকার নূতন উপকরণ সন্ধান করিয়াছে, নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রস্তর যুগ ছাড়াইয়া তাম্রযুগে তাহারা পৌঁছাইল কিনা, ব্রোঞ্জ ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার আয়ত্ত করিল কিনা, তাহার কোনো নিদর্শন নাই। এমন কি, পূর্ব ভারতে প্রস্তর যুগেরও নিদর্শন নাই। তাহা ছাড়া, প্রাচীন 'অস্ট্রিক' জাতিরও সব শাখাই যে কৃষিকর্ম করিত তাহাও নয়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত 'নিষাদ' 'ভিল্ল-কোল্ল' প্রভৃতি আদিবাসী শাখাগুলি হয়ত আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষরূপে অরণ্য-পর্বতে শিকার করিয়াই বেড়াইত, কৃষি-সমাজের জীবনযাত্রা বা চিন্তা-ভাবনা তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই—অন্য সমাজ হইতে পরোক্ষে তাহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে। অনুমান করা যায়—এই অঞ্চলে কৃষি সেই প্রস্তর যুগের দ্বারা পুষ্ট হয় নাই।

ভারতবর্ষে ধাতব যুগের প্রারম্ভ

অন্যদিকে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, হয়ত পূর্বাঞ্চলে অস্ট্রিকদের এই বর্বর জীবন যখন চলিতেছে, আর এক উন্নততর কৃষি-সভ্যতা আবির্ভূত হইতেছিল। সেখানেই ভারতের ধাতব যুগের সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কৃষি চলে ক্ষেত্রে, কৃষক সাধারণত গঠন করে গ্রাম, বাস করে গ্রামে। কৃষি-সভ্যতা তাই পল্লী-প্রধান। তবু এই সভ্যতা

শোষিতরা 'দাসজাতি', সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতদের ইহা নানাভাবে প্রমাণ করা একটা নিয়ম। হিটলারী 'রক্তের মাহাত্ম্যবাদ' বা ব্লাড থিওরি উহারই চরম রূপ মাত্র—আর এই কথাটা যে কত অবৈজ্ঞানিক তাহাও এখন অন্তত স্পষ্ট। (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী।)

বাড়িয়া উঠিলে উৎপাদকের নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন খাদ্যাদি উৎপন্ন হয়, তখন বৃত্তিজীবী কারিগরেরা উদ্ভূত হয়, শ্রমবিভাগ দেখা দেয়, এবং খাদ্য ও এই সব পণ্যের আদান-প্রদানের (exchange) প্রয়োজনে এক একটি পৌরকেন্দ্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এই সব কেন্দ্রের খাদ্য জোগায় চতুর্দিকের কৃষি-অঞ্চল; তাই কৃষি-সমাজের জীবন-যাত্রা কতকটা অগ্রসর হইলেই এইরূপ নগর পত্তন সম্ভব। সুমের, মিশরে যেমন, ভারতবর্ষে তেমনি এইরূপে দেখি এক পৌর সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বতন কৃষিজীবীরা ছিল একান্ত ভাবে পল্লীবাসী। কিন্তু এই নূতন কৃষিজীবীদের মধ্যে ক্রমে তখন নগরেরও পত্তন হইতে শুরু করে। জাতি হিসাবে তাহারা কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়; খুব সম্ভব তাহারা আসলে সেই সুমের-আক্কাদদেরও আত্মীয়, এমন কি হয়ত বা বর্তমান দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদেরও সমগোত্রের,—ভূমধ্য জাতিদের বংশধর বা জ্ঞাতি। ইহাদের বংশধারা লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক আছে তাহা শেষ হয় নাই। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে পারি—প্রাচীন এশিয়াটিক সভ্যতার শাখারূপে উহার কৃষ্টিধারা তাহারা হয়ত বহিয়া আনিয়াছিল বা গ্রহণ করিয়াছিল। মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পা সভ্যতা অর্থাৎ আরব সমুদ্র হইতে সিমলা শৈল অবধি তাহাদেরই হয়ত কীর্তি-চিহ্ন। প্রস্তর যুগের জীবন শেষ হইয়া অধিবাসীরা তখন ধাতুর ব্যবহার আয়ত্ত করিয়াছে, তাম্রের উপকরণ লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছে, লৌহ-যুগে পৌছিতেছে,—কিন্তু মধ্যবর্তী ব্রোঞ্জযুগের কোনো নিদর্শন সেখানেও নাই। তথাপি তখন মানুষের সভ্যতায় এবং ভারতের কৃষি-সভ্যতায় দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হইতেছে! ইহাই তাম্র-প্রস্তর (chalcolithic) যুগ। অস্ট্রিকদের সভ্যতার সন্ধান দেয় আমাদের জাতি-বিজ্ঞান[১] ও ভাষা-বিজ্ঞান[২] আর এই ভারতীয় প্রাচীনতম পৌর-সংস্কৃতি আবিষ্কার করিয়াছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব।

---

১ প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন জাতি-বিজ্ঞানের চক্ষে বর্তমান ভারতবাসী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃতির এক-একটি যুগ হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও অতীতের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত—যেমন নিগ্রোবটুদের সহিত প্রস্তর যুগ এবং আদি-অষ্ট্রলয়েডদের

২ বিভিন্ন সংস্কৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে এই ভাষা বিজ্ঞানের হিসাবও জানা প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে নানা জাতির দান আসিয়া মিশে; তাহা দিয়া সংস্কৃতির জন্ম বা বিকাশ নির্ণীত হয় না, শুধু বাহ্যরূপ কতকটা প্রভাবিত হয়।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কারে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন কালের লুপ্ত অধ্যায় আমাদের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে ;—ইহার প্রথম কৃতিত্ব প্রাপ্য শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনির ও পরলোকগত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরাতত্ত্বের এই আবিষ্কৃত তথ্য সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা

(৯০ পৃষ্ঠা হইতে) সহিত প্রস্তরের শেষ যুগ ও ধাতব যুগের প্রারম্ভকাল সংযুক্ত, —ইত্যাদি। কিন্তু জাতিবিজ্ঞানের চক্ষে সেই যন্ত্র ও উপকরণ বড় কথা নয়; বড় কথা মানুষের দেহের মাপজোঁক। সেই হিসাবে ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের মতে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) বর্তমান ভারতবর্ষে এই সব জাতীয় লোক বসবাস করে, যথা :— (১) নিগ্রো বটু ; পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে ; (২) আদি অষ্ট্রলয়েড : ইহাদের পরিচয়ও আমরা লইয়াছি ; (৩) 'মূল লম্বা-মাথাওয়ালা জাতি' : দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যায় ; (৪) 'বৃহৎ মস্তিষ্ক তাম্রযুগীয়' এবং তাহাদেরই একটু দুর্বল রূপ, সিন্ধু সৈকতের জাতি : হরপ্পা, মোহেন-জো-দড়ো হইতে আধুনিক পাঞ্জাবীদের মধ্যে পর্যন্ত ইহাদের নিদর্শন মিলে—যদিও একথাও স্মরণীয় যে হরপ্পা মোহেন-জা-দড়োর দেহাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেখানে নানাজাতির মানুষই ছিল। ইহারাই ডাক্তার গুহের মতে মূল ভারতীয় জাতি। ইহার উপর চাপিয়াছে—(৫) 'গোল মাথাওয়ালা আল্পো-দিনারিক জাতি' : গুজরাট, কন্নড় ও বাংলায় যাহাদের পাওয়া যায় ; (৬) 'লম্বা মাথাওয়ালা আদি-নর্ডিক' : উত্তর-পশ্চিমে, কাফির উপজাতির মধ্যে এবং ভারতের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহাদের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায় ; (৭) 'পূরবীয় (Orientals)' : পাঠান, পাঞ্জাবী ও সংযুক্ত প্রদেশে যে দীর্ঘাকৃতি মানুষদের দেখা যায় ; (৮) 'ভোটগোষ্ঠীয় জাতি' : হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং বঙ্গ-ব্রহ্ম সীমান্তে ইহা সুপরিচিত ; (৯) 'লম্বা মাথাওয়ালা মঙ্গোলী' : আসামের নাগা প্রভৃতি জাতের মধ্যে ইহাদের প্রমাণ মিলে ; (১০) 'গোল-মাথাওয়ালা মঙ্গোলী' : টিপরাই, চাকমা প্রভৃতি, ইহাদের 'মগ' বলা হয় ; (১১) 'সামুদ্রিক (Oceanic)' : ইহারা সমুদ্রযোগে আগত ; তামিলনাড়ু ও মালাবারে মঙ্গোল ধাঁজের এইরূপ লোক দেখা যায়। জাতিতত্ত্ব বিষয়ে নানা মত আছে, তাহা অবশ্য স্মরণীয়।

(৯০ পৃষ্ঠা হইতে) মানসগত সংস্কৃতির পক্ষে বরং অন্যতম প্রধান বাহন ভাষা। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের চক্ষে ভারতের বিভাগ অন্যরূপ, তাহা জাতি-বিজ্ঞানের মত নয়। কারণ এক এক জাতির ভাষা হয়ত আজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যেমন নিগ্রোবটুদের ভাষা। তাহার এক আধটি শব্দও খুঁজিলে আর পাওয়া যায় না। তাই ভারতে নিগ্রোবটু ভাষা নাই। ভাষা-বিজ্ঞানের হিসাবও তাই স্বতন্ত্র রাখা হয়। মোটামুটি তাহা এইরূপ :—(১) অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা : খাসিয়া, শবর, কোল প্রভৃতি ; (২) দ্রাবিড় গোষ্ঠীর : তামিলা, তেলেগু, মালায়ালাম, কানাড়ী প্রভৃতি ; (৩) আর্য গোষ্ঠীর : বৈদিক, পরবর্তী প্রাকৃত (সংস্কৃত) ও বর্তমান কালীন বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি ; (৪) ভোট চীনা গোষ্ঠীর : ভুটানী, আসামী, নাগা প্রভৃতি ভাষাসমূহ। বিশেষ স্মরণীয় এই যে, 'দ্রাবিড়' বা 'আর্য' এইগুলি বৈজ্ঞানিকদের মতে জাতি পরিচায়ক কথা নয়, মূলত উহা ভাষা-গোষ্ঠীর পরিচয় সূচক নাম। সাধারণ কথাবার্তায় এইগুলি দিয়া আমরা মানব-গোষ্ঠী বুঝাই ; তাহা একটা মারাত্মক ভুল। তাহাতেই এই দেশীয় 'আর্যামির' জন্ম ও প্রশ্রয়লাভ ঘটিয়াছে ; অন্য দেশেও হিটলারী 'আর্যামি'র প্রসারও সহজে সম্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাধারণের ভুলে বর্বরে বর্বরতার সুযোগ পাইয়াছে।

করেন পরে মার্শ্যাল, ম্যাক্‌কে প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিত ও অধ্যক্ষগণ। তাহাদের সেই কাহিনী আজ সকলকারই প্রায় পরিজ্ঞাত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাক্ মুহূর্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাক্-ক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাই উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র হইতে। প্রধানত এই ক্ষেত্রসমূহ যে অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত মোটামুটি ভাবে সেই সমুদায় অঞ্চলটিকে এখন 'পশ্চিম পাকিস্তান' বলা হয়।

এই সূত্রে স্মরণীয় এই যে এই রাষ্ট্রীয় ভাগ-বিভাগ দিয়া সেকালের সভ্যতার ভাগ-বিভাগ বা গোষ্ঠী নির্ণয় করার প্রশ্নই উঠে না। এমন কি, যখনকার সভ্যতার আমরা সন্ধান করিতেছি, 'পাকিস্তান' 'হিন্দুস্থান' ডোমিনিয়ন তো দূরের কথা, তখনো ভারতবর্ষ বলিয়া আমাদের এই সুপরিচিত বিশিষ্ট দেশও চিহ্নিত হয় নাই, তাহার নামকরণও হয় নাই। তখনো পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত—এমন কি, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের সহিতও—বালুচিস্তানের মারফৎ প্রাগৈতিহাসিক ইরাণ ও ইরাকের সম্পর্ক ছিল নিকটতর; এবং যে মানব-গোষ্ঠী ও মানব-সভ্যতা এই অঞ্চলে বর্তমান ছিল তাহারাও ছিল মোটামুটি পরস্পরের নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ভূগোলের ও ইতিহাসের এই আদি সত্যকে পরবর্তী কালের 'দেশ', 'জাতি', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি সামাজিক বিকাশের সূত্র ধরিয়া ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্ন রূপে দেখা, এখন প্রায় আমাদের একটা সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে; এবং সভ্যতার ইতিহাসের অনুসন্ধানে, উহার স্বরূপ বুঝিতে, এই সংস্কার তাই বাধাও হইয়া উঠিতে পারে। যেমন, এই বাঙলা দেশ হইতে আমরা যদি বলিয়া বসি ভারতবাসী হিসাবে আমরা মোহেন-জো-দড়োর উত্তরাধিকারী, তাহা হইলে স্মরণে রাখা প্রয়োজন—সেই হিসাবে এইরূপ দাবী আরও বেশি করিতে পারে বালুচিস্তানের, ইরানের, ইরাকের মেসোপটোমিয়ার অধিবাসীরা। কারণ, সেই প্রাচীন ও অতি প্রাচীনকালে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল পরস্পরের আত্মীয়—গঙ্গার উত্তরে-পূর্বে তাহাদের কোনো সমসাময়িক যোগসূত্র এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। আবার ঠিক এই ধরণের হাস্যকর ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে 'পাকিস্তানীরা' বলিয়া বসিতে পারে, তাহারা শুধু মোহেন-জো-দড়ো হরপ্পার

উত্তরাধিকারী নয়, তাহারা চিরদিনই সুমের-আক্কাদের জ্ঞাতি, ভারতের এই "হিন্দুস্থানী"দের হইতে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন হইবে—কি হিসাবে তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা এই প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের আদি পর্বকে ভারতীয় সংস্কৃতির ও ইতিহাসেরই প্রথম পর্ব বা প্রাক্‌কক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে এই সব কেন্দ্র অবস্থিত ছিল, দ্বিতীয়ত—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে এই সব অঞ্চলের সেই সব প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের মানুষদের দান পৌঁছিয়াছে,—অর্থাৎ সত্যই আমরা তাহাদের সংস্কৃতির কিছু-না-কিছু উত্তরাধিকারী। ইহাই আসল কারণ। কতটা আমরা তাঁহাদের দান গ্রহণ করিয়াছি, কতটা বা করি নাই, তাহা সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই, কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের আবিষ্কৃত সেই বিলুপ্ত জীবন-চিহ্ন হইতে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারেরও সন্ধান লাভ করি; এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের প্রদর্শিত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বিস্মৃত আদি রূপেরও কতটা ধারণা লাভ করিতে পারি।

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কার করিতেছেন পুরাতাত্ত্বিকেরা। এই দিকে পুরাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর হইতে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হয়। স্যর অরেল ষ্টাইন্ উত্তর-পশ্চিম ভারত, বালুচিস্তান ও গোড্রেসিয়ায় (১৯২৯-৩৪) এই উদ্দেশ্যে বারে বারে পর্যটন করেন। ম্যাক্‌কে ও স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদারও এই অঞ্চলে নূতন কেন্দ্র ও নূতন তথ্যের সন্ধান দেন। গর্ডন চাইল্‌ড্ এই সব আবিষ্কারের অর্থ, এশিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাসে উহার স্থান, পূর্ব-ইরানের আবিষ্কারমালার সহিত তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি প্রামাণিকতার সহিত বিচার ও বিশ্লেষণ করেন (১৯৩৩-৩৪)। তাহা হইতে বুঝিতে পারি—সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' (পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত) প্রাচীনতম একটি শাখাই ভারতের এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাও। গর্ডন চাইল্‌ড্-এর আলোচনা অবলম্বন করিয়া ম্যাক্‌কোয়ান্ ও ষ্টুয়ার্ট পিগোট প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাচীনতম ইরাক (উবাইদ্, উরুক্, জেম্‌দেত নস্‌র্, 'আদি বংশ,' আক্কাদ, উর-এর তৃতীয় বংশ, লর্‌সা ইসিন্ ক্রমিক ধারার) ও ইরান-এর সুসা, সিয়াল্‌ক্, গিয়ান্, হিস্‌সার ও আনাউ প্রভৃতি বিভিন্ন

কেন্দ্রের সভ্যতা-ধারার সহিত ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম সভ্যতা-কেন্দ্রের একটা কালানুক্রমিক কাঠামোও গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য *Ancient India*, Vol. 'The Chronology of Pre-historic North-West India' by Stuart Piggott, 1946)। বলা বাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে কালের হিসাব খুবই মোটামুটি ভাবে করা সম্ভব, আর তাহাতেও ভুল ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইরাক, ইরান, ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রাচীনতম কৃষ্টির এই মোটামুটি সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বিচার, এবং তাহার পারম্পর্য নির্ণয় গ্রহণযোগ্য। অবশ্য, এই কালানুক্রমিক পারম্পর্যের মতই আমাদের নিকট বেশি কৌতূহলোদ্দীপক সভ্যতার এই বিস্মৃত ক্ষেত্রের বিবরণ ও বিশেষ রূপটি। এখানে সংক্ষেপে তাহাই আমরা স্মরণ করিতেছি।

সেই হিসাবে এই সব কেন্দ্র ও উহার নিদর্শন চোখে দেখিলেই এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন হয়—অন্তত চিত্রাদি হইতে উহা খানিকটা সংগ্রহ করা বিশেষই বাঞ্ছনীয়। ভূতাত্ত্বিকের হিসাবে না হউক ভূগোলের হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলটি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বালুচিস্তানের উষর পার্বত্য প্রদেশ আর ভাগ সিন্ধু-নদ-পরিপুষ্ট পাঞ্জাব-সিন্ধুর সমতল ভূমি। স্বভাবতই বালুচিস্তানের কেন্দ্রগুলি অনেকাংশে পর্বত-বেষ্টিত, দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন; দরিদ্র কৃষিজীবীর পল্লীসংস্কৃতি রূপেই তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে নদীমাতৃক উর্বর সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রগুলি পরস্পর শেষ পর্যন্ত 'সিন্ধু সভ্যতা' সম্পর্কিত, অধিকতর সম্পদশালী; একটি বিরাট পৌর-সভ্যতায় তাহা বিকশিত হইয়াছিল—হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োয় আমরা তাহারই সন্ধান পাই। ভূতাত্ত্বিকের হিসাব পূর্ববর্তী প্রস্তর যুগের আলোচনাকালে আমাদের যতটা সহায়ক হয়, এ ক্ষেত্রে আর ততটা সহায়তা করিতে পারে না। পুরাতাত্ত্বিকের এখানে মুখ্য অবলম্বন আবিষ্কৃত জিনিসপত্র,—বলিতে গেলে, মৃৎপাত্র ও মাটির ছোট ছোট মূর্তি, আর জীবিকার উপকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি। ইহার মধ্যে মৃৎপাত্রই প্রধান—উহার গঠন-পদ্ধতি, অলঙ্করণ-রীতি প্রভৃতি এবং আবিষ্কৃত অন্য উপকরণ দিয়াই এই সব "কৃষ্টির" গোষ্ঠী বিচার ও কোষ্ঠী বিচার চলে; অবশ্য ভূতাত্ত্বিকের বিদ্যা ও অন্যান্য প্রাচীনতম পুরাতাত্ত্বিক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়া আবার তাহা যাচাই করিয়া লওয়া হয়।

প্রাগৈতিহাসিক ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র

গোষ্ঠী-বিচারের দিক হইতে একটা বড় ভাগ অবশ্য পল্লী সংস্কৃতির ও পৌর সংস্কৃতির ; মৃৎপাত্রের সাক্ষ্যানুযায়ী তেমনি আর একটা ভাগ এই দক্ষিণ বালুচিস্তান মোটামুটি "পীতাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র—উহার যোগ নিকটস্থ দক্ষিণ ইরানের কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে ; এবং উত্তর বালুচিস্তান "রক্তাভ সামগ্রীর" কেন্দ্র—উহার যোগ উত্তর ইরানের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে। এই দুই রকমের সামগ্রীর কেন্দ্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কয়েকটি বিশেষ স্তরে আবার ভাগ করা চলে (*Ancient India*, No 1, Stuart Piggott এর মতানুযায়ী) সেই ভাগ ও তাহার স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য নিম্ন রূপ :

"রক্তাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র : প্রধানত তিনটি। যথা—

(১) "ঝোব্ কৃষ্টি" (The Zhob Culture) : উত্তর বালুচিস্তানের ঝোব্ উপত্যকায় সুর জংগল (ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন), রাণা ঘুণ্ডাই, মোগল ঘুণ্ডাই, পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই (মধ্যবর্তী কালের নিদর্শন) প্রভৃতি গ্রামে ছিল ইহার কেন্দ্র। এই সব স্থানে মৃৎপাত্রের গায়ে কালোর সঙ্গে লাল রেখাঙ্কন দেখা যায়। মাটির তৈয়ারী ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তি, গোরু ও লিঙ্গ-প্রতীক, মাটির ইটের বাড়িঘর, প্রস্তরের তীরের ফলা পাওয়া গিয়াছে। দেহভস্ম সমাধি দেওয়া হইত। তাম্রের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক একটি ছোট কৃষিজীবীর বসতিমাত্র এই সব এক একটি গ্রাম। কাল হিসাবে ইহারা হরপ্পার অপেক্ষা বহু প্রাচীন—ইরাকের উরুকের সময় হইতে "আদি বংশের" মধ্যে।

(২) "হরপ্পা কৃষ্টি" (The Harappa Culture) : হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো ছিল ইহার দুই প্রধান পৌর-কেন্দ্র, তাহা ছাড়াও চানহু-দড়ো প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র নগর ছিল ; আর দক্ষিণ-সিন্ধু প্রদেশে অনেক পল্লীকেন্দ্রও ছিল। এক পাত্রের রক্তাভ অঙ্কনরেখায় ছাড়া ইহার সহিত ঝোব্ কৃষ্টির আর কোনো মিল নাই। সাধারণ ব্যবহার্য পাত্রাদি, নানা অলঙ্কৃত পাত্র, সীল, মূর্তি, পোড়া ইটের বাড়িঘর, কূপ, স্নানাগার, পয়ঃ-প্রণালী ইত্যাদি এই কৃষ্টিকেন্দ্রের বিপুল উপাদানের কথা পরে পৃথক ভাবে আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এখানে শুধু উল্লেখযোগ্য যে, "হরপ্পার কৃষ্টি ক্ষেত্রে" তাম্র ও ব্রোঞ্জের নির্মিত হাতিয়ারের অভাব নাই। খ্রীঃ পূঃ

৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এর মধ্যে এ সভ্যতার কাল অনুমিত হইয়াছে।

(৩) হরপ্পার "এচ্" সমাধিশালার উক্তরূপ রক্তাভ সামগ্রী। ইহাতে হরপ্পার শেষ দিককার অবস্থার নিদর্শনই পাওয়া যায়।

"পীতাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্রগুলি সবই কৃষিজীবীদের বাসভূমি। ইহাই প্রথম স্মরণীয়। বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্ষেত্র ছিল এই সাতটি—

(৪) "কোয়েটা সামগ্রী": কোয়েটার সন্নিহিত গ্রামের আবিষ্কৃত ঐরূপ পাত্রালঙ্করণ—রক্তাভ রেখা এইসবে নাই। হরপ্পারও পূর্বকার বলিয়া মনে হয়; ইহা যথেষ্ট প্রাচীন—হয়ত বা ইরাকের উরুকের সমকালীন।

(৫) 'আমরী কৃষ্টি': সিন্ধুর এই দক্ষিণ অঞ্চলের কেন্দ্রে। তাম্র গুটির ব্যবহার ছিল দেখা যায়। কোয়েটার পরবর্তী, হয়ত ইরাকের "আদিবংশের" সমসাময়িক, হরপ্পারও পূর্বেকার।

(৬) "নাল কৃষ্টি": দক্ষিণ বালুচিস্তানে ও সিন্ধুদেশে ইহার নিদর্শন মিলে। তাম্রনির্মিত কুঠারের ছবির প্রচলন দেখি। সম্ভবত আমরীর পরবর্তী ইরাকের আক্কাদের সমসাময়িক।

(৭) "কুল্লি কৃষ্টি": প্রস্তরের, মাটির ইটের বাড়িঘর, সীল, ক্ষুদ্র মূর্তি প্রভৃতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য তাম্রের পিন্, আরশী, প্রভৃতি। সম্ভবত দেহভস্ম সমাধি দেওয়া হইত। হয়ত নাল ও আমরীর মধ্যকালে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল —মোহেন-জো-দড়োর নবস্তরের প্রথম দিক তখন চলিতেছে।

(৮) "শাহী-টুম্প কৃষ্টি": দক্ষিণ বালুচিস্থানে অবস্থিত; শবসমাধি, ও তাম্রের কুঠার, বল্লম, শীলমোহর ইহার বৈশিষ্ট্য। কাল গণনায় উহা কুল্লির পরবর্তী, হয়ত হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োর শেষ পাদের সম-সাময়িক।

(৯) "ঝুকর কৃষ্টি": শুধু সিন্ধু প্রদেশে ইহার নিদর্শন মিলে, তাম্রের কুঠার, পিন্, ও ইটের বাড়িঘর পাওয়া যায়।

(১০) "ঝংগর কৃষ্টি": ইহাও সিন্ধু প্রদেশেই অবস্থিত। ঝুকর ও ঝংগর, দুইটি কৃষ্টির আবির্ভাব দেখা যায় চন্হু-দড়োর চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরে, (উহার প্রথম তিন স্তর হরপ্পার অন্তর্গত ও সমকালীন)—অর্থাৎ হরপ্পার যুগ তখন শেষ হইতেছে।

এই পুরা বস্তু ও কৃষ্টি পীঠিকা হইতে যাহা বুঝা যায় তাহা এই যে, (১)

উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অতি প্রাচীন কৃষ্টি আসলে ইরান-ইরাকের এই ধরনের প্রাচীন কৃষ্টির মতই, ছিল প্রাথমিক কৃষিজীবী সমাজের কৃষ্টি। তাহাদের গ্রামগুলি ছিল একর দুয়েকের ক্ষুদ্র গ্রাম। জীবন মোটামুটি যুদ্ধ-বিগ্রহ-শূন্য শান্তির জীবন, কারণ গ্রাম রক্ষা করিবার মত ব্যবস্থা দেখা যায় না। বৃষ এই কৃষিজীবীদের সুপরিচিত; পার্বত্য ছাগ ও হরিণ শিকারও চলিত; বিচ্ছিন্ন গ্রামে স্বয়ংসচ্ছল পল্লীসমাজ ধীরে সুস্থে চলিত; গতায়াত, বিনিময়, ব্যবসা বড় নাই। বাড়িঘর কখনো মাটির ইটের গাঁথুনির, কখনো পাথরের ইটের। ধাতুর মধ্যে তাম্রের প্রচলন আরম্ভ হইতেছে (ঝোব্ কৃষ্টিতে অবশ্য তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই); পল্লীর কারুবৃত্তিও কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। নানা কেন্দ্রের মৃৎপাত্রের অঙ্কনরীতি বিচার করিলে এখানে অন্তত গুটি ছয়েক বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির ('স্কুলস্ অব্ পেন্টিং') পরিচয় পাওয়া যায়,—সবলতা ও উদ্ভাবন-কুশলতা সহজেই চক্ষে পড়ে। রেখার ও রঙের সবল সুনিশ্চিত প্রয়োগ ও ভারসাম্য, প্রকল্পনীয় ('ডিজাইন্')—এসব হইতেই বুঝিতে পারি, এই বর্বর-জীবনেও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। (২) এই কৃষ্টি মূলত প্রাচীন ইরানের কৃষ্টিকেন্দ্রের শাখা—ইরাকের কেন্দ্রের সহিতও স্বভাবতই সমুদ্র পথে সম্পর্কিত। মূল বা কাণ্ডের কোনো একটি বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি শাখায় পৌঁছিতে বিলম্ব হয়, তাই সমপর্যায়ের সামগ্রীও কালানুসারে ভারতীয় শাখায় আবির্ভূত হয় (ইরাকী-ইরানী) মূলের অপেক্ষা অনেক পরে, এইরূপ অনুমান করা চলে। (৩) কালানুক্রমে ইহার কাল খ্রীঃ পূঃ ৩,২০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এর মত বলিতে পারা যায়। "হরপ্পার কৃষ্টি ধারার" (খ্রীঃ পূঃ ২,৩০০ ? = "ইরাকের আদিবংশ" হইতে খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০,= ইরাকের "উরের তৃতীয় বংশ" কিংবা তৎপরবর্তী—'ইসিন্ লর্সা'র সমকাল পর্যন্ত) তুলনায় কোয়েটার সামগ্রী ও আমরীর কৃষ্টি প্রাচীনতর (খ্রীঃ পূঃ ৪,০০০; ৩,৫০০); কুল্লির কৃষ্টি হয়ত আংশিক ভাবে হরপ্পার সমসাময়িক; নালের কৃষ্টি কতকটা সমসাময়িক কতকটা পরবর্তী, ঝুকর, শাহীটুম্প, ঝংগর প্রভৃতি হরপ্পার পরবর্তী। উহার 'এচ্'-সমাধি-শালার সমকালীন (১, ৫০০-১০০০)। হয়ত কুল্লি কৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা হরপ্পার কৃষ্টিধারার ও সূচনার আভাস পাই—যদিও হরপ্পার কোনো সুনিশ্চিত উদ্ভবক্ষেত্র অজ্ঞাত।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা-ক্ষেত্র

মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার নামই আমাদের নিকট সুপরিচিত। 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা' বলিলে আমরা বুঝি প্রথমত মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কারাবলীকে, দ্বিতীয়ত হরপ্পার লুপ্তাবশেষকে। কিন্তু গত বিশ বছরে (১৯৪৬-এর মধ্যে) আরব সমুদ্রের তীর হইতে প্রায় সিমলা শৈলের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে—পূর্বে যাহার কাঠিয়াবাড় রাজপুতানার মরুভূমি, পশ্চিমে ওয়াজিরস্তান-বালুচিস্তানের সীমানা, উত্তরে হিমালয়—ইহার মধ্যে এই এক হাজার মাইল দীর্ঘ ভূ-ভাগে—সুমের সভ্যতার তুলনায় এই সভ্যতার ক্ষেত্র উহার অপেক্ষাও তিনগুণ বড়—সিন্ধু ও পাঞ্জাবের (ও বাহাভালপুরের) এই সমতল ক্ষেত্রে সেই 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার' ৩৭টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত উহার ১টি ছাড়া [কোট্‌লা নিহান্ খাঁ ?] বাকী সবগুলিই বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অবশ্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হরপ্পা মোহেন-জো-দড়ো, এই দুইটি নগর এবং পরে আবিষ্কৃত সিন্ধুপ্রদেশের চান্‌হু-দড়ো ও লোহুম-জো-দড়ো ; অন্যগুলি শহর নয়, গ্রাম মাত্রের ধ্বংসাবশেষ। পুরাতাত্ত্বিকের খাতায় ইতিমধ্যে সমগ্র 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার' নামকরণ হইয়াছে 'হরপ্পা সভ্যতা' বলিয়া ;—কারণ, আবিষ্কারাবলীর দিক হইতে হরপ্পাই নাকি এই সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি স্থানীয়, যথার্থ পরিচায়ক।

এই প্রধান কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে দুই একটি তথ্য না জানিলে চলে না। পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টেগুমারি জেলায় হরপ্পা অবস্থিত। সেখান হইতে মণ্টেগুমারি শহর ষোল মাইল ; গ্রামটির দক্ষিণ পশ্চিমে ভগ্নস্তূপ। দুইটি মোট প্রায় সাড়ে তিন মাইল চক্ররেখার মধ্যে এই ধ্বংসক্ষেত্র। উত্তরে মাইল ছয় দূরে রাবি নদী ; এক কালে উহার দুইটি শাখার সঙ্গমস্থল নগরের পার্শ্বে ছিল—হয়ত সেই বন্যার ভয়েই নগরের বাঁধ বা প্রাকারও বর্তমানের প্রধান ধ্বংসস্তূপের (এ, বি) চারিদিকে প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—পরে তাহার উপর রচিত হয় পুরপ্রাচীর। উনবিংশ শতকের পুরাতাত্ত্বিকেরা (ক্যানিংহাম্) এইরূপ প্রাচীরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ এতই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইতে নিকটের

পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বহুকাল ধরিয়া এত ইট বহিয়া লইয়া গিয়াছে, নিকটস্থ লাহোর-মুলতানের একশত মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের কালেও এখান হইতে পাথরের টুকরা এত বেশি পরিমাণে গৃহীত হয় যে, হরপ্পার এই প্রাচীর-প্রাকার (এ, বি চিহ্নিত) বা মূল নগরের রূপ চিনিবার উপায় আর সহজ রহে নাই। সে তুলনায় মোহেন-জো-দড়ো রক্ষা পাইয়াছে বেশি, যদিও সিন্ধুর বন্যায় পুরাকালেও দুই নগরই বারেবারে বিনষ্ট হইত। পুরাতাত্ত্বিকেরা হাত দিতেই (১৯২২-৪৪) মোহেন-জো-দড়োর অভাবনীয় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। হরপ্পায় দয়ারাম পাহনির (১৯২১এর জানুয়ারীতে খনন আরম্ভ করেন) পরে হরপ্পার বিশদ পরিচয় প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন (১৯২৬-৩৪) এম্-এস্-ভাট; আর উহা এখন আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে মর্টিমার হুইলার (*Ancient India*, No 3., 'Harappa, 1946' by R. E. M. Wheeler) প্রভৃতির স্তূপ খননে (Mound AB) ও সমাধিক্ষেত্র (Cemetery R 37) খননে।

মোহেন-জো-দড়ো ('মৃতের ঢিবি') হরপ্পা হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে সিন্ধু প্রদেশের লাড়কানা জেলায় অবস্থিত (রেল ষ্টেশন ডোকৃরি, ৮ মাইল দূরে)। অনেক কাল হইতে এই ধ্বংসাবলী পড়িয়া আছে—এখনো তাহা প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তৃত। বিস্তৃত ধ্বংসক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয় এক অদ্ভুত নগর, সেই মূল ধ্বংসমালার পশ্চিমে এখানেও ৭০|৮০ ফিট একটি বিচ্ছিন্ন ঢিবি দেখা যায় (নাম 'Stupa Mound'); তাহাতে কুশান আমলের একটি ইটের বৌদ্ধ স্তূপ আছে, উহার আভাস দেখিয়াই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২২-২১এ) প্রথম আকৃষ্ট হন।—ঐক্ষেত্রেই খননের পরে সুপ্রসিদ্ধ স্নানাগার, বিদ্যালয়, স্তম্ভগৃহ প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী শাসন-পদ্ধতির উপাদান মিলে—হরপ্পার পশ্চিম স্তূপের উত্তর দিকেই যেমন মিলে (শ্রীযুক্ত ভাটের খননে) মজদুর-বস্তি, শস্যাগার প্রভৃতি। অবশ্য এই বৌদ্ধস্তূপের তলায় এখানে প্রাচীনতর বস্তু কী আছে তাহা না খুঁড়িতে মোহেন-জো-দড়োর পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। এতদিন পর্যন্ত বলা হইত —মোহেন-জো-দড়োতে এমন অপূর্ব পৌর-জীবন-যাত্রার সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেলেও কোনো একটা বড় প্রাসাদ, বড় মন্দির, সমসাময়িক সুমের-আক্কাদ বা মিশরের মত কোনো এক প্রবল ক্ষাত্রশক্তির বা ব্রাহ্মণ্যশক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; অস্ত্রশস্ত্রও

বিশেষ পাওয়া যায় নাই, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বরং বণিকব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতিতে বিভক্ত একটা অধিকতর অগ্রসর পৌর সভ্যতার অর্থাৎ এই সভ্যতা যেন এক শান্ত নিরুপদ্রব পুরাতন বণিকতন্ত্রের ('বুর্জোয়া ইকোনোমির') প্রমাণ, পুরাকালীন পুরাধিপতিদের শাসনের ('citadel rule' এর) প্রমাণ নয়। কিন্তু মোহেন-জো-দড়োর এই স্তূপস্থলের মতই হরপ্পারও পশ্চিম দিককার সেই ঢিবি (এ, বি)। মর্টিমার হুইলার তাহা খনন করিয়া (১৯৪৪-৪৬) প্রাকার-প্রাচীর-বেষ্টিত এক সুরক্ষিত পুরেরই প্রমাণ পাইয়াছেন। আর তাই তাঁহার বিশ্বাস মোহেন-জো-দড়োর এই স্তূপতলও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন—'ঢিবি' দুইটির মিল নিতান্ত তুচ্ছ নয়, মোহেন-জো-দড়োর স্তূপের ঠিক পার্শ্বেই তেমনি ভাগ-করা মজদুর ব্যারাক্ রহিয়াছে, তেমনি শস্যাগার ও ধান-ভাণ্ডার উচ্চ চাতাল পাওয়া গিয়াছে;—এই সবে এক সুশৃংখল কেন্দ্রীয় পুরাধিপত্যের (citadel rule) ইঙ্গিত এখনো যথেষ্টই মিলে।

সমস্ত 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার' ধারণাই এইভাবে এখন পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এই সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করেন প্রধানত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড্। সুমের-আক্কাদের 'এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ ও সভ্যতার'ই সগোত্র এই পৌর-সভ্যতা, সম্ভবত তিনিই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ইহাদের জীবন-যাত্রার সম্বন্ধ প্রকাশ করেন। তখনো ইহার রাষ্ট্রশক্তির তবু স্বরূপ জানা যায় নাই, মর্টিমার হুইলারের আবিষ্কার-ফলে কোনরূপ পুরাধিষ্ঠিত পরাক্রান্ত শাসকশক্তির তখনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

হরপ্পার কৃষ্টি পরিচয়

হরপ্পা সমস্ত সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় বলিয়া এখন গ্রাহ্য হইয়াছে। মোহেন-জো-দড়োর কথা পূর্বেও বহুল প্রচারিত হইয়াছে; তাহার দান গুরুত্বে ও পরিমাণে অতুলনীয়। হরপ্পার আবিষ্কারমালার যথাযথ বিবরণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের কৃপায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে পরে, তাহার মূল্য এখনো সুস্পষ্ট হয় নাই (*Excavations of Harappa*—M. S. Vats; Archaeological Survey of India, 1940, 2 Vols)। কিন্তু সেই দান যে কত গুরুতর তাহা পূর্বে শ্রীযুত ভাটের আবিষ্কৃত এই কয়টি তথ্য হইতেই অনুমিত হইয়াছিল। প্রথমত, মোহেন-জো-দড়োরও পূর্বে হরপ্পার জন্ম—

এখন হইতে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে,—তাহার জীবনও হইয়াছিল দীর্ঘতর। অলংকৃত মৃৎপাত্র, পোড়া মাটির, পাথরের, পসিলেন জাতীয় শীল বা মুদ্রাই হরপ্পার প্রাচীনতম যুগের চিহ্ন; আর উহার সমাধিক্ষেত্রে (Cemetery H) আছে উহার সর্বশেষ যুগের নিদর্শন। দ্বিতীয়ত, হরপ্পার মুদ্রাগুলির আকার বহুবিধ, কিন্তু একমাত্র ঘড়িয়াল ছাড়া অন্য প্রাণীর চিত্র সেই মুদ্রাসমূহে নাই। অন্য দিকে সমাধিক্ষেত্রের (Cemetery H) পাত্রচয়ে কিন্তু হরিণ, ছাগ, বৃষ, ময়ুর, চিল, মাছ ছাড়াও গাছ, পাতা, এমন কি নক্ষত্র পর্যন্ত সুদক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অথচ হরপ্পার গার্হস্থ্য জীবনের পাত্রাদিতে শুধুই সরল জ্যামিতিক রেখার অঙ্কনমালা দেখা যায়। শব-রক্ষার পাত্রের চিত্রগুলি তাই তাহাদের শব-সৎকারের আচার ও ধর্ম-বিষয়ক ধারণার প্রমাণ। তৃতীয়ত, শবাবশেষ পরীক্ষা করিয়া জাতি-বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন—ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধান প্রধান জাতিদের সকলেরই পূর্বজদের দেহাবশেষ এখানে রহিয়াছে; কোনো একটি বিশেষ জাতি, অবিমিশ্র খাঁটি জাতি, এখানে বাস করিত তাহা বলা চলে না। চতুর্থ কথা, সমাধিভবনের উপরিতলে পাওয়া যায় জালায় নিহিত শব, আর নীচেকার তলায় তাহার ব্যবহারার্থ তৈজসপত্র। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, এই কৃষি সভ্যতার পৌর-পর্বের পক্ষে যাহা উল্লেখযোগ্য—নগরের উত্তরে অবস্থিত প্রকাণ্ড ধর্মগোলা; উহা প্রকোষ্ঠে, বারান্দায় বিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুবিশাল। উহার দক্ষিণে রহিয়াছে শস্য ভানার উচ্চ চাতাল—কাশ্মীরে, বাঙলায় এখনো যাহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। ষষ্ঠ, অধিকতর বিস্ময়োৎপাদক: এই পৌর-কৃষি-সংস্কৃতি তাহার কারুশালার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, মূল স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে শস্যের চাতালের দক্ষিণে, সুবিন্যস্ত মজদুর বস্তি (workmen's quarters)-কথিত ১৪টি ক্ষুদ্র সুপরিকল্পিত গৃহে। সপ্তম,—ইহার তাম্ররথ এবং তাম্র জালায় আবিষ্কৃত ৭০টি অস্ত্র ও উপকরণও হরপ্পার এই স্তরের জীবনযাত্রার এক মূল ভিত্তির সন্ধান দেয়। অষ্টমও তাহাই—মাটি ও তামা গালাইবার উপযোগী ১৬টি চুল্লী। হরপ্পায় ইহা ছাড়াও শ্রীযুক্ত ভাট আবিষ্কার করেন ইহার সামাজিক মানসিক অগ্রগতির পরিচায়ক সুদক্ষ নগ্ন মূর্তি, এবং সোনা, রূপা, নানা পাথর ও কড়ির নানা অলঙ্কার, বলয়, মালা প্রভৃতি।

হরপ্পার সেই আবিষ্কারমালা হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাই,

অন্যান্য পৌর-সভ্যতার মত এই সভ্যতাও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কৃষি-সভ্যতার মধ্যে কারু শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে। সামান্য উন্নতিও নয়, শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বৈষম্য বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

শব-সংকার-প্রথা হইতে মনে হয়, হয়ত পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং প্রেতলোক ও পরলোকে বিশ্বাস বেশ প্রবল ও প্রচলিত ছিল। নানা বিলাসোপকরণ হইতে যেমন হরপ্পার অধিবাসীদের রুচির সন্ধান পাই, তেমনি নগ্নমূর্তি, শিল্প ও শবাধারের চিত্র হইতে তাহাদের ধর্মবিষয়ক ধারণা ও শিল্প-প্রয়াসেরও একটা পরিচয় লাভ করি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় এই কথা যে, অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়াতে মনে হয়—যুদ্ধ, আক্রমণ, আত্মরক্ষার কথাও ইহাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছে, হয়ত আক্রমণেই বিধ্বস্তও হইতে হইয়াছে। মোহেন-জো-দড়ো বা হরপ্পার সুমের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক পৌর-সভ্যতার মত কোনো সামরিক শক্তির চিহ্ন উদ্ধত রাজপ্রসাদ বা বিরাট মন্দির তৎপূর্বে খুঁজিয়া না পাইয়া ইহাদিগকে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়া কল্পনা করিত।

মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা-সম্পদ

মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কার-মালা অপ্রতুল। কিন্তু তাহার খুঁটিনাটির বিশেষ পরিচয় আর না লইয়া এখানে শুধু এই কয়টি জিনিস উল্লেখ করিলেই চলে: (*Mohen-jo-daro and the Indus Civilisation*, Sir J. Marshall, ও *The Indus Civilisation*, Mackay, দ্রষ্টব্য) —মোহেন-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি নগর-বিন্যাসের সুষ্ঠু চিহ্ন। সেখানকার পৌর-জীবনযাত্রার তাহা এক স্মরণীয় মাপকাঠি। যথা— নগরের সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত রূপ, উহার পোড়া ইট ও কাদার গাঁথুনির বহুতল বাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে সরলগামী রাজপথ, নগরের জলনিষ্কাশনের প্রণালী; গৃহস্থের ও সাধারণের স্নানাগার—যাহার চিহ্ন ভারতে পরবর্তী কালে আর পাওয়া যায় না। বাস্তুশিল্প ছাড়া অন্য শিল্পে দেখিতে পাই কার্পাস বয়ন, সেই পোড়ামাটির পাত্রাদি, পাথরের, সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতব তৈজসপত্র, দ্রব্যাদি। ব্যবসায় যানবাহন নৌকা, আস্ত কাঠের গো-শকটের চক্র (এখনো সিন্ধু দেশে চলিতেছে), প্রভৃতি আছে। তাহা ছাড়া আছে আবার লিপি ও লেখা—আজও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

কিন্তু এই সভ্যতারও মূল বনিয়াদ—প্রধানত ধান্য নয়, গম ও যব,—তাহা ভুলিবার নয়। তবে এই পৌরসভ্যতা সেই কৃষি সংস্কৃতিরই এতদঞ্চলে এক অদ্ভুত উন্নতির নিদর্শন। কৃষিগত উপকরণের মধ্যে মোহেন-জো-দড়োতে উল্লেখযোগ্য সেখানে প্রাপ্ত গম ও যব, আর সেখানকার মুদ্রায় আঁকা সুস্পষ্ট ভারতীয় বৃষ। (এই বৃষই কি পরে শিবের নন্দীতে পরিণত হইবে না?)। ইহা ছাড়া সেখানকার আরশি, চিরুণী, পুঁতির মালা ও অন্যান্য অলঙ্কার আরও উন্নত জীবনধারার চিহ্ন বহন করিতেছে। আর মোহেন-জো-দড়োর মুদ্রায় ও পাত্রে খোদাই অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রাণীচিত্র হরপ্পার (সমাধিশালার পাত্র ছাড়া) সাধারণ পাত্রের জ্যামিতিক শিল্পধারা হইতে উহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে এবং জানাইতেছে, মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীদের শিল্পে প্রকৃতি-পরিচয়, প্রকৃতি-অনুরাগ, ও প্রকৃতি-অনুকৃতি। এইরূপ চিত্রাবলীর মধ্যেও আবার বিশেষ লক্ষণীয় বৃক্ষ (অশ্বত্থের ?)-চিত্র যোগী-মূর্তি (যোগের প্রক্রিয়া তখনি কি চলিতেছে ?), আদি দেবীমূর্তি (Magnum Mater), লিঙ্গমূর্তি, ইত্যাদি।—অধিবাসীদের মানসরূপের আভাস এই সবে আমরা লাভ করি। এইসব অনেক নিদর্শনই আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রেও পাই। তাই এই সব সামগ্রী মেসোপটোমিয়ার প্রাচীন সুমের সভ্যতা, এমন কি ভূমধ্যসাগর ও এশিয়ান্ (Asianic) সভ্যতার সহিত এই সিন্ধু সভ্যতার যোগ্যতার সূচিত করে। অথচ কুঠার, ছুরি, করাৎ, বর্শার ফলা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট, সুমের বা উরের সভ্যতা হইতে ইহা স্বতন্ত্রও (*Ancient India*, Masson Oursel, Grabowska & Stein, দ্রষ্টব্য)।

ইহার পরে হরপ্পার এই জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও আমাদের তথ্য জোগাইলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মর্টিমার হুইলার সাহেব। ১৯৪৬-এ তিনি হরপ্পার সেই পশ্চিমস্থ 'ঢিবি' (মাউণ্ড এ-বি) খনন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহা সংক্ষেপে এই (দ্রষ্টব্য *Ancient India*, No 3, পৃ ৬৪) :—আবিষ্কৃত সর্বপ্রাচীন মৃৎপাত্রাদি ঠিক হরপ্পার পরিচিত রীতির নয়। তখনকার দিনে পুনঃ পুনঃ বন্যার প্রকোপও দেখা যায়। হরপ্পার নিজস্ব কৃষ্টি যখন পরিণত হইতেছে, বুঝা যায়, তখন এই স্থলটিও বাঁধ ও প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। সেই রক্ষাপ্রাচীর মোটামুটি চতুষ্কোণ—দীর্ঘে প্রায় ৪০০ গজ, পরিধি ২০০

গজ। প্রাচীরের পশ্চিমে একটি প্রবেশদ্বার—উহার প্রবেশপথ ঘুরানো, সম্ভবত আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই উহার ভিতরের দিকে বেদী বাঁধানো (terraces); উত্তরের দ্বার কিন্তু তাহা নয়। সম্ভবত উহাই প্রধান প্রবেশদ্বার। এই প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল মাটির ও মাটির ইটের এক ১০।২০ ফিট উচ্চ বাঁধ বা প্রাকারের উপর। বন্যার জন্যই বাঁধ, তাহা বুঝা যায়। আর, কাজেই মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন উর নগরের অনুরূপ বাঁধের কথা মনে পড়িবে। বাঁধের উপরকার প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল মাটির ইট দিয়া, তাহার বেধ গোড়ার দিকে প্রায় ৪০ ফিট; উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফিট, বাহিরের দিকে রৌদ্রপক্ক ইট দিয়া প্রাচীরের গোড়া ঢালু করিয়া বাঁধানো। চতুষ্কোণ বুরুজ বা প্রহরী-প্রকোষ্ঠ প্রাচীরের বহির্গাত্রে ছিল তাহাও বুঝা যায়। অভ্যন্তরের দিকে দেখা যায়—এই প্রাচীর নির্মাণের সময়ে মূল দুর্গাদির ভিত্তিতল হিসাবে প্রায় ৩৩ ফিট উচ্চ করিয়া মাটি ও মাটির ইটের মঞ্চ বাঁধানো হয়। সমগ্র রক্ষা-ব্যবস্থায় অন্তত তিনটি প্রধান যুগের আভাস রহিয়াছে—যেমন, উত্তর-পশ্চিম কোণ দেখিয়া মনে হয় প্রথম যুগের অনেককাল পরে যখন প্রাচীরের সংস্কার করা হইল তখন প্রাচীরের বেধ আরও চওড়া করা হয়, আর প্রাচীর শক্ত করা হয় পূর্বের মত ইটের টুক্‌রা দিয়া নয়, আস্ত ইট দিয়া। এই মধ্য যুগই "হরপ্পা সভ্যতার" ঐশ্বর্যের যুগ। ইহার পরে দেখি—সেই উত্তর পশ্চিম দিকে আর একটি প্রহরী কোণ নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমের প্রবেশদ্বার প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। বুঝি হরপ্পা আত্মরক্ষার চেষ্টাকল্পে উৎকণ্ঠিত। ইহার পরে হয়ত ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে—পশ্চিমের বেদীর উপরে যে (চতুর্থ যুগের) নিকৃষ্ট ধরণের বাসগৃহের ধ্বংসাদি পাওয়া যায় উহা পরবর্তী যুগের—সমাধিশালা এচ্‌-এর মৃৎপাত্রাদিতে যাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সব আবিষ্কারের ফলে হরপ্পা সভ্যতার যে সামাজিক বিন্যাসের ধারণা আমরা লাভ করি তাহা পরে দেখিব। কিন্তু হরপ্পার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এই আবিষ্কৃত বস্তু মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কৃত তথ্যের সহিত মিলাইয়া মর্টিমার হুইলার নিঃসংশয় হন যে, সুমের ও আক্কাদের সমসাময়িক সভ্যতার মত হরপ্পাও বণিকতন্ত্রের নয়, ক্ষাত্র শক্তিরই কেন্দ্র ছিল; বল চালনায় ইহার রাষ্ট্র অভ্যস্ত, সবল হস্তেই তাহারা শাসন

করিতেন। তবে এখনো এই কেন্দ্রে উর প্রভৃতির মত কোনো মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কেন্দ্রে পুরোহিত রাজের শাসন ছিল, এই কথা বলা চলেনা। হরপ্পার নানা প্রমাণ মিশাইয়া তিনি হরপ্পা সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কালকে মনে করেন—মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ কাল পর্যন্ত—আর হরপ্পার ছয়টি বিভিন্ন নির্মাণপর্বের (মোহেন-জো-দড়োতে পাওয়া যায় দশটি পর্ব) বিকাশ-ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে করেন—মোটামুটি সিন্ধুসভ্যতার গতিবেগ তীব্র তো নহেই, বরং ধীর ভাবে পরিণতি লাভ করে, সুস্থির ভাবে চলে। আর, এই প্রমাণাবলীর আদি অন্ত লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করেন—এই সভ্যতাস্রষ্টাদের পূর্বে যাহারা এই কেন্দ্রে বাস করিত তাহারা পল্লী বা ক্ষুদ্রনগরবাসী ছিল, তাহাদের পাত্রাদি হইতে এই পরিণত হরপ্পা সভ্যতার তুলনায় তাহারা ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন গোত্রের বলিয়া মনে হয়। আর হরপ্পার 'এচ' সমাধিস্থলী ও 'আর-৩৭' সমাধিস্থলীতে প্রাপ্ত পাত্রাদি ও পশ্চিমস্থ পুরবেদীর উপরকার নিকৃষ্ট ধরণের গৃহাদি হইতে বুঝা যায়—ইহাও সেই হরপ্পার পরিণত সভ্যতার অধিকারীদের নহে—কোনো আগন্তুক গোষ্ঠীর। এই আগন্তুকরা "আর্য আক্রমণকারীও হইতে পারে"—গর্ডন্ চাইল্ড্ ১৯৩৪ সালেই এই অনুমান করিয়াছিলেন।—মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ (বিশেষত মৃতদেহের অবস্থা) হইতেও সেইরূপ আকস্মিক আক্রমণ ও বিপর্যয়ের আভাস পাওয়া যায়।

সমগ্রভাবে 'হরপ্পা সভ্যতার' নামেই 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার' এখন নামকরণ হইলেও পৌর-সভ্যতার সাক্ষ্য মিলিয়াছে মাত্র দুইটি কেন্দ্রে। ইহাও বলা দুঃসাধ্য—এই দুই শহর কি একই বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, না এই দুই কেন্দ্রে ছিল দুইটি শক্তিশালী দুর্গাধিষ্ঠিত রাষ্ট্র। ইহার মধ্যেও মোহেন-জো-দড়োই ধ্বংসলীলায় কম ক্ষতিগ্রস্ত।

হরপ্পার সভ্যতা নৃতত্ত্বের বিবেচনায় কোনো একটি বিশেষ 'জাতির' সৃষ্টি বলিয়া স্থির হয় নাই। নানা জাতির সংমিশ্রণ পূর্বেই ঘটিয়া থাকিবে; আর সেই মিশ্রিত জাতিরই এই সভ্যতা। সমাধিশালার মৃতদেহের পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত প্রাচীন দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদের সংস্কৃতিতে সভ্যতায় যোগাযোগ থাকিবার কথা। প্রাচীন দ্রাবিড়েরা উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিল, পৌর সভ্যতারও স্তরে

পৌঁছিয়াছিল। জলপথে পশ্চিম উপকূল দিয়া বহুদূর পর্যন্ত নানা কেন্দ্রে এক সময়ে তাহাদের বিস্তার ছিল। বর্তমান-কালেও বালুচিস্তানের সেই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী মুসলমানধর্মাবলম্বী ব্রাহুই জাতি রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব এই দ্রাবিড়-ব্যাপ্তি এবং হরপ্পা সভ্যতার সহিত দ্রাবিড়-ভাষীদের নৈকট্যের আরও প্রমাণ। কিন্তু জাতি হিসাবে কিংবা সভ্যতা হিসাবে তাই বলিয়া সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতা অভিন্ন, এমন প্রমাণ নাই। বরং হরপ্পা সভ্যতার সহিত পশ্চিমের সুমের-আক্কাদ সভ্যতার যোগাযোগের প্রমাণ বেশি সুস্পষ্ট।

হরপ্পা-সভ্যতার লিপিমালা পঠিত না হইতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম সভ্যতার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমাদের জানিবার উপায় নাই। আবিষ্কারাবলী হইতে তবু আমরা যাহা জানিয়াছি তাহাও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পক্ষে যুগান্তকারী। সম্প্রতি আমাদের সে জ্ঞান আরও স্থিরতর হইয়াছে; আমরা হরপ্পা-সভ্যতার মোটামুটি সামাজিক রূপও এখন অনুমান করিতে পারি (দ্রষ্টব্য গর্ডন চাইল্ড্, *What Happened in History*, Pelican, P 111 ff; M. Wheeler, *Ancient India*; ও Piggott, *Some Ancient Cities of India*)। হরপ্পা-সভ্যতার শাসকেরা কোনো পুরোহিত-রাজা ছিলেন কিনা তাহা এখনো বলা যায় না। কিন্তু তাহারা যে সুমের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক সামন্তশক্তির মত সামরিক শক্তির অধিকারী পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন, দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে ক্ষমতা কেন্দ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট (হুইলার ও পিগট্)। এই রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়েই অবশ্য বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীও মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে—তাই বলিয়া "বণিকতন্ত্র" প্রচলিত হইয়াছে, এরূপ বলা চলে না। তখন তাম্র ও ব্রোঞ্জের (টিন ও তাম্র মিশ্রিত দস্তা) যুগ। তাম্র আসিত রাজপুতানা ও বালুচিস্থান হইতে, টিন ও নানা মূল্যবান প্রস্তর আসিত ভারতের বাহির হইতে, শিল্পের জন্য দেবদারু কাঠ আসিত হিমালয় প্রদেশ হইতে; বাণিজ্যের সুপ্রচলন না হইলে এইসব সংগ্রহ সম্ভব হইত না; আক্কাদ-সুমেরের প্রাচীন ধ্বংসাবলীর মধ্যেও হরপ্পার উপকরণ লাভ করা যাইত না। এমন কি আরব সমুদ্র হইতে মোহন-জো-দড়োর মৎস্য চালানও আসিত (গর্ডন চাইল্ড)। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যও যে উৎপাদন

বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম কি, সোনা, রূপা, তাম্রমুদ্রা, না অন্য কিছু তাহা জানা যায় না। অনেক গৃহের সঙ্গেই শস্ত্রাগার রহিয়াছে; বুঝিতে পারি গৃহস্বামী বণিক। ইহাদের সংখ্যার ও সম্পদের তুলনায় সাধারণ ঘরগুলি সামান্য এবং মজুরপাড়ার মাটির ইটের দো-খুপরীর ঘর অধিকারীদের দুরবস্থার পরিচায়ক (গর্ডন চাইল্ড); সমাজে আয়-বৈষম্যের, শ্রেণীভেদেরও উহা পরিচায়ক (চাইল্ড, হুইলার, পিগট), মেসোপটেমিয়ার মন্দির-সংলগ্ন কারিগরদের বস্তির কথা উহা মনে করাইয়া দেয়। জানিবার উপায় নাই ইহারা ক্রীতদাস ছিল, না ছিল অর্থদাস কারিগর। এইকথা বলা যায়—সমাজে ক্রীতদাস নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথাই উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, এমন কোনো প্রমাণ এই সভ্যতায় নাই। এ সভ্যতাকে এশিয়াটিক সামন্ত সমাজেরই সগোত্র বা অন্তর্ভুক্ত ভাবা বোধ হয় এই সব কারণে অযৌক্তিক নয়। পথঘাট, জলপ্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারি পৌরকর্তৃত্বও অপরিণত নয়; কর্মক্ষম ও শাসনক্ষম। যে চিত্রাক্ষর এখনো পড়া যায় নাই, তাহাও সমস্ত সিন্ধু উপত্যকায় সুপ্রচলিত হইয়াছে, ইহাও কম সমাজ-সংহতির কথা নয়। পাত্রাদির গায়ে সুস্থির জ্যামিতিক অঙ্কনরীতি শুধু শিল্পবোধের সাক্ষ্য নয়, হয়ত জ্যামিতিক জ্ঞান ও সুমের-আক্কাদের সমতুল্য বিজ্ঞান-চর্চারও প্রমাণ। টোটেম ও ফলন-কামী যাদুর (fertility magic) ঐতিহ্য-প্রভাবে যে ক্রমশ লিঙ্গাদি বস্তু দেবপূজার রূপ লইয়াছে, তাহাও দেখি। এইরূপ কুম্ভকারের চাকা, গো-শকটের চাকা, শস্য ভানার উপকরণ, বৃষ, যোগী, বৃক্ষাদি ও মোহেন-জো-দড়োর দোকানের সার হইতে ভারতবর্ষের এখনকার জীবনযাত্রার কথাই অনিবার্যরূপে মনে পড়ে। "সিন্ধু উপত্যকার শহরের সেই বসনরীতি এখনো এই অঞ্চলে অচল হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের এই সব চিত্রিত অনুষ্ঠানে বর্তমান হিন্দু দেবদেবীর মূল রহিয়াছে। হিন্দু বিজ্ঞানের ও তাহার মারফত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও অপ্রত্যাশিত ঋণ রহিয়াছে ইহার নিকট। ভারতের ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা একেবারে লুপ্ত হয় নাই।—আমাদের না জানা থাকিলেও তাহার কাজ চলিয়াছে এখনো।" (চাইল্ড)।

হরপ্পার সভ্যতা তাই সত্যই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম রূপ—নানা রূপান্তরেও যাহার উদ্দেশ আমরা এখনো পাই—কারণ, একেবারে সার্বিক

রূপান্তরও ভারতীয় সংস্কৃতির এতদিন পর্যন্ত ঘটে নাই। কিন্তু কি করিয়া সেই সভ্যতা ধ্বংস হইল তাহা অবশ্য এখন বলা যায়—হরপ্পার দুর্গাধিষ্ঠিত শক্তি যে আক্রান্ত হইয়াছিল, মোহেন-জো-দড়োর কোন কোন মৃতদেহ যে আক্রান্ত ও অকস্মাৎ নিহত নরনারীর মৃতদেহ, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কে এই আক্রমণকারী? পূর্বে আমরা গর্ডন চাইল্ডের অনুমানের উল্লেখ করিয়াছি। মনে হয় হরপ্পার দুর্গাদি আবিষ্কারে তাহার পরিপোষক প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে (দ্রষ্টব্য *Ancient India*, No 3, Mortimer Wheeler-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮২)। ঋক্‌বেদের সূক্তাদি হইতে দেখা যায়, "সপ্তসিন্ধু" প্রদেশে (পাঞ্জাব) আর্যদের প্রাচীর-বেষ্টিত শত্রু-নগরীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে। ঋক্‌বেদ এই নগরকেন্দ্রকেই বলিত 'পুর'। কখনো সেই পুরপ্রাচীর 'অশ্মময়ী'; কখনো তাহা বহু বেষ্টিত বা 'শতভুজি'; আবার কখনো 'আমা' অর্থাৎ কাঁচা মাটির। এইজন্যই ইন্দ্রের নাম 'পুরন্দর', তিনি দিবোদাসের জন্য নব্বুইটি 'পুর' চূর্ণ করেন। শত্রু শম্বরের নিরনব্বুই বা একশতটি দুর্গ তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছেন।

সপ্তসিন্ধু দেশে এইরূপ সুরক্ষিত পুর কাহাদের ছিল? এতদিন পর্যন্ত অনুমান করা হইত, উহাতে তৎকালীন ভারতীয় দ্রাবিড় সভ্যতারই কথা উল্লেখিত হইয়াছে; ধারণা ছিল, তখনো পাঞ্জাবে তাহার বিস্তৃতি ছিল। কিন্তু হরপ্পার পুরকেন্দ্র খনিত হওয়ার পরে আর সন্দেহ থাকে না যে—ইহা সিন্ধু উপত্যকার সেই রাষ্ট্রশাসিত পৌর সভ্যতারই ধ্বংসের কাহিনী। হাজার খানেক বৎসরের জীবনযাত্রার পরে খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০'র দিকে উহার অবসান হইল।

একটা প্রশ্ন হইবে—এই সিন্ধু সভ্যতার সহিত দ্রাবিড়দের তবে কিরূপ সম্পর্ক ছিল? মোহেন-জো-দড়ো আবিষ্কারের পরেই যে পণ্ডিতগণ দ্রাবিড় ও সুমের সভ্যতার সহিত ইহার সগোত্রতা দেখিয়াছিলেন (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে একজন) তাঁহাদের অনুমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। সুমের সভ্যতার সহিত, এমন কি, সেই এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের সহিত তাহার জ্ঞাতি-সম্পর্ক প্রায় এখন সর্বস্বীকৃত; অবশ্য হরপ্পা সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যও সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্রাবিড়দের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠনের সমসাময়িক রূপ এখনো বিচার সাপেক্ষ। তবে বালুচিস্থানে এখনো দ্রাবিড়ভাষী (মুসলমান ধর্মাবলম্বী) ব্রাহুই জাতির

অস্তিত্ব রহিয়াছে—সন্দেহ নাই একদিন সমস্ত পশ্চিম উপকূলেই দ্রাবিড় ভাষীদের সভ্যতাকেন্দ্র ছিল। অভিন্ন না হোক—দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে তাই হরপ্পা সভ্যতারও যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য ছিল।

ভারতের যে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এইরূপে তাহার প্রাচীনতম চিহ্নগুলির হিসাব লইলে দেখিব—পান, সুপারী, ধান, কলা ও নারিকেল, আর মোটামুটি পল্লীপ্রাণ অস্ট্রিক-জাতির সে জীবন-যাত্রার বস্তু আজও আমাদের পূর্বাঞ্চলের ভারতবাসীর উৎসবে, ক্রিয়াকলাপে অপরিহার্য; আর আমাদের দেবদেবী, পূজা-পার্বণ, অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যেও রহিয়াছে ভারতের অন্য অধিবাসীদের দান;—মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্পার (আদি-দ্রাবিড়ভাষী ? বা ভূমধ্য জাতীয় ?) অধিবাসীদের ধর্মগোলা, যব ও বৃষ এবং শিব-উমা, অশ্বত্থ ও যোগ-প্রক্রিয়া প্রভৃতি তো ভারত-সভ্যতার একেবারে মূল বনিয়াদ। ভারতীয় সভ্যতার আদিরূপ ইহাই। ইহারই মানসিক রূপ পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে নূতন রঙ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। ভারতের কৃষিসভ্যতার অস্ট্রিক (?) পল্লীরূপ বিশেষ করিয়া দেখা যায় পূর্বাঞ্চলে; এবং পৌর সভ্যতার (দ্রাবিড়? ভূমধ্যজাতীয়?) বিশেষ রূপ দেখা যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও দুই-ই এতদিন টিঁকিয়া রহিয়াছে; পরবর্তী কালের নানা তরঙ্গে সেই কৃষি-সভ্যতাই নূতনতর ও সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে; সমাজের গতিনিয়মে উহার অভ্যন্তরস্থ শক্তির দ্বন্দ্বে এই কৃষি-সভ্যতারই নব নব স্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে—তাই চার-পাঁচ হাজার বৎসরের রূপান্তরের মধ্যেও সেই প্রাচীনতম রূপকে এখনো চিনিয়া ফেলা অসম্ভব হয়না।

গ্রন্থপঞ্জী

Cambridge History of India—Vol. 1.
An Outline of Racial Ethnology in India—B. S. Guha.
Racial Elements in the Population—B. S. Guha.
Languages and the Linguistic Problem—S. K. Chatterji.
The Indus Civilisation—Mackay.
Ancient India—No 3, 1947, (Arch. Survey of India.)
What Happened in History—Gordon Childe.
Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India—Sylvan Levi & Bagchi.

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা

মধ্যরূপ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল কাটিয়া গিয়া ঐতিহাসিক কালের সূচনা হয় বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে। মোটামুটি তখন হইতে আমরা ভারতীয় সমাজের ও জীবনযাত্রার একটা ধারাবাহিক পরিচয় লাভ করিতে পারি। এই সমাজ ও জীবনযাত্রা সেই সময় (আনু-মানিক খ্রীঃ পূঃ প্রায় ১,৫০০ অব্দ) হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্ত (খ্রীঃ ১৭৫৭) প্রায় একই খাতে বহিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যেই পড়ে 'প্রাচীন ভারত' বা 'হিন্দু শাসনকাল' (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০।১,০০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ১,২০৩ পর্যন্ত দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর), এবং 'মধ্যযুগের ভারত' বা 'মুসলমান শাসনকাল' (খ্রীঃ ১,২০৩ হইতে মোটামুটি খ্রীঃ ১,৭৫৭ পর্যন্ত মোট পাঁচ শ' সাড়ে পাঁচশ' বৎসরের ইতিহাস)। কিন্তু এই দুই যুগের মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক, মূলত ভারতীয় জীবনধারা ইহার মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে খাত বদলায় নাই, রাজা বদলাইয়াছে, রাজ্য বদলাইয়াছে; ভিতরের ও বাহিরের আঘাতে আলোড়নে ধর্মের ও আচার-নিয়মের বহু ওলট-পালট ঘটিয়াছে; সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক পরিবর্তনও জীবনে, সমাজে ও ভাবনায়ও আসিয়াছে—কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই এত বড় সুদীর্ঘ কাল জীবনের মূলত একই রূপ অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাকেই বলিতে পারি—ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যরূপ।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই মধ্যরূপের মোট পরিচয় গ্রহণ করিবার পূর্বে একটা জানা সত্য আর একবার স্মরণ করা প্রয়োজন। তাহা এই: 'প্রাচীন ভারত' বা হিন্দু যুগের ভারতের ইতিহাস এখনো অনেকাংশেই অনিশ্চিত। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ সেই ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই একশত বৎসরের সমবেত গবেষণার ফলে এখন বলা চলে—প্রাচীন ভারতের একটা কালানুক্রমিক পীঠিকা বা chronology মোটের উপর স্থির হইয়াছে; এবং প্রধান প্রধান

রাজবংশগুলির (তাহাও প্রধানত উত্তর ভারতের) উত্থান-পতনের কাল ও কথা অনেকাংশে জানা গিয়াছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মিলাইয়াই ভারতীয় জীবনযাত্রার ও ভাবনাধারার,—বিশেষত শিল্প ও দর্শনের কিছু কিছু বিচার-আলোচনা করা হয়। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা ঐতিহাসিক নামে চলিলেও "ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে", বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক বিচার-নিয়মে বা ইতিহাসের আর্থিক-বিচার অনুযায়ী চলে না। ‡ কারণ, বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক পদ্ধতি তো দূরের কথা, প্রচলিত (বুর্জোয়া) ঐতিহাসিক পদ্ধতিতেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এখনো রচিত হয় নাই। * সাধারণভাবে যেটুকু স্থির হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটা মোটামুটি রাজনৈতিক কাঠামো লাভ করা গিয়াছে। প্রায় ৬।৭টি পর্বে এই ইতিহাসকে ভাগ করা চলে। + যেমন, (১) বৈদিক যুগ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১,০০০, কিম্বা ৭০০ অব্দ পর্যন্ত)। (২) প্রথম ভারতীয় সংগঠনের যুগ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৮৫তে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত। ইহা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠার যুগ। দক্ষিণে তখন অন্ধ্র সম্রাটদের রাজত্ব। (৩) আদি হিন্দু সংগঠনের যুগ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৮৫তে পুষ্যমিত্রের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ : যবন, শক প্রভৃতির রাজত্ব, ভারতে অধিষ্ঠান এই কালের মধ্যে; খ্রীষ্টীয় ৭৮ বা ১২০ অব্দে কনিষ্কের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিস্তৃত)। (৪) বৌদ্ধ প্রাধান্যের (দ্বিতীয়) যুগ (খ্রীষ্টীয় ৭৮ বা ১২০তে কুশান রাজত্ব হইতে আরম্ভ; ১৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাসুদেবের মৃত্যুকাল হইতে প্রায় খ্রীঃ ৩০০ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এক অনালোকিত যুগ ইহার মধ্যে পড়ে।) (৫) হিন্দু অভ্যুদয়ের যুগ বা ভারতীয় সংগঠনের মধ্য কাল (খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব হইতে খ্রীষ্টীয় ৬৪৭ এ

---

‡ তথাপি এই দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

* বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ও স্যর যদুনাথ সরকারের পরিকল্পনানুযায়ী (১৯৩৭) এইরূপ "ভারতের জাতীয় ইতিহাস" রচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৩৬এ প্রকাশিত হইয়াছে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও এ, এস, আলটেকার সম্পাদিত গুপ্ত ও বাকুটৈয়দের কালের কথা।

+ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ-এর অনুমোদিত; এবং ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', প্রথম ভাগ পৃঃ ৯৮।

হর্ষের মৃত্যু পর্যন্ত। ইহা বাকাটক সাম্রাজ্যেরও কাল। খ্রীঃ ৪৫০ হইতে ৬০০ এর মধ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস ; হুন, পারশিক, গুর্জর প্রভৃতি জাতিদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষ ভগ্ন, খণ্ডিত ; শ্রীহর্ষ ও দ্বিতীয় পুলিকেশীর সঙ্গে শেষ সংগঠন প্রয়াস শেষ হয়)। (৬) ভারতীয় মাৎস্য ন্যায়ের যুগ (খ্রীষ্টীয় ৬৪৭ হইতে খ্রীঃ ১,২০৩এ মুসলমান বিজয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল। ইহার মধ্যেই বাংলার পাল সাম্রাজ্য ও সেন রাজ্যের কাল, গুজরাটে গুর্জর সম্রাট ভোজের রাজ্যকাল, ভিন্‌মালে ও কনৌজে গুর্জর প্রতিহারদের কাল, বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল ও বুন্দেল, দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট, রাজপুতানার রাঠোর, চৌহান, প্রমার, সোলাঙ্ক, চালুক্য—এক কথায় রাজপুত জাতির রাজত্ব)।

লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই যে, ইহার মধ্যে এক বারের মত অন্ধ্রদের উল্লেখ থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রায় কোনো উল্লেখই ইহাতে নাই। নর্মদা ও কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার মধ্যস্থিত দক্ষিণোপত্যকার ('ডেকান প্লেটোর') কানাড়ার ব্রাহ্মণ কদম্ব রাজগণ (৩—৬ অব্দ), জৈনদের পৃষ্ঠপোষক গাঙ্গরাজগণ (২য় হইতে ১০ম শতাব্দ পর্যন্ত—শ্রাবণ বেলগোলার গোমত মূর্তির নির্মাতা) বা 'মহারাষ্ট্র' দেশের বাদামির (বিজাপুর জিলা) চালুক্য (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হর্ষের কাল পর্যন্ত, তামিল পল্লবগণ ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী) সম্রাটগণ, রাষ্ট্রকূটবংশ (খ্রীঃ ৭৬০ এর সময়ে—ইলোরার কৈলাশ মন্দির ইঁহারা নির্মাণ করেন; ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে জৈনদের সমর্থক সম্রাট অমোঘবর্ষের সময়ে আরব ভ্রমণকারীরা ইঁহাদের প্রধান রাজশক্তি বলিয়া জানিত), কল্যাণীর চালুক্য বংশ (চোলদের ইঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী; মহারাজ বিক্রমাংকের সময়ে স্মৃতিকার বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার 'মিতাক্ষরা' রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ৯৭৩ হইতে ১১৯০ পর্যন্ত ইঁহাদের কাল), মৈশুরের হৈসলরাজগণ (খ্রীঃ ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে হালেবিদ্ ও অন্যস্থানকার হৈসল ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তাঁহাদের কীর্তি; রামানুজাচার্য ইঁহাদেরই আশ্রয়ে 'শ্রীভাষ্য' লেখেন), দেবগিরির (ঔরঙ্গবাদ) যাদব রাজগণ (১৩০৯তে মালিক কাফুর ইঁহাদের নিঃশেষ করেন), এমন কি, বিজয়নগরের সম্রাটগণ (মুসলমান আমলে ১৩৩৬-১৫৬৫ পর্যন্ত; সায়ন ইঁহাদের কালে বেদের ব্যাখ্যা লেখেন) এই দক্ষিণ-মধ্য-ভূখণ্ডের সম্রাটদের কথাই কি আমরা বিশেষ শুনিতে পাই?

ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণস্থ তামিল জাতির প্রাচীনতম রাষ্ট্রত্রয় চের, চোলি, পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখও এখানে নাই। চোল রাজ্যের মাদুরাতে খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীতেই প্রাচীন তামিল সাহিত্য উন্নতিলাভ করে। কাঞ্চীর অদ্ভুতকর্মা পল্লব সম্রাটগণ (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উহাদের গৌরবকাল—চালুক্যদের হাতে ৭৪০এর পরাজয়ে তাঁহাদের অবসান আরম্ভ হয়। ইহারা কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব; কাঞ্চী ও মহাবলীপুরম্ ইঁহাদেরই ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে অতুলনীয়); রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সম্রাটগণ (খ্রীঃ ৯০৭ হইতে ১০৭৪ পর্যন্ত ইঁহাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, চোল শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ কুর্রম্—পল্লী-মণ্ডল—ও 'সভার' উপর গঠিত; রাজেন্দ্র চোলের রাজ্য ছুঁইয়াছিল গঙ্গা নদী পর্যন্ত; ইঁহাদের সময়ে যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপে ঔপনিবেশ ও বাণিজ্যিক প্রসার অব্যাহত রহে; তাঞ্জুর, গঙাই কোণ্ড চোলপুরম্, চিদাম্বরম্-এ চোল শিল্পের অজস্র প্রকাশ চলিত থাকে);—ইঁহাদের কথাও ভারতীয় রাজ-নৈতিক ইতিহাসের এই কাঠামোর বাহিরেই প্রায় থাকিয়া যায়। অথচ বুঝিবার মত কথা এই—ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক প্রাচীন কীর্তিই দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, শিল্পকর্ম দক্ষিণাপথের এই সব রাজ্যে সৃষ্টি হয়; অন্ততঃ এই সব দক্ষিণী কেন্দ্রেই পুঁথিপত্র, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি আত্মরক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে দক্ষিণাপথের স্থান গৌণ। এই কথা সহজেই বুঝিতে পারি—যে স্মৃতিকার বা দর্শনকার চালুক্য বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যে বসিয়া বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, তাঁহার চিন্তায়, ব্যবস্থায় সেই রাষ্ট্রের ও সেই কালের কথাই বেশি মিলিবে—বাঙলা বা কান্যকুব্জের অনুরূপ প্রথা বা নিয়মের সন্ধান হয়ত পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া কোনো একটি রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত থাকিবার মত অবস্থা (মৌর্য বা গুপ্ত যুগ ছাড়া ছিল না,) কোনো একটি রাষ্ট্রে ও কোনো সামাজিক বা আর্থিক ব্যবস্থা সর্বকালে অপরিবর্তিত থাকে নাই। আবার ইহাও সত্য, রাষ্ট্রীয় ঐক্য না থাকিলেও মৌর্য যুগের পর হইতে ভারতবর্ষে মোটামুটি একটা **সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঐক্য** ও আচার-বিচারের জ্ঞান প্রচলিত ছিল; পরে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বই পৌরাণিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাই ভাবনার ও বিচারের জগতে আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও কালগত প্রভাব

কাটাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবুকেরা চিন্তা ও বিচার করিতে পারিতেন কাশী বা কাঞ্চীতে—যে-ই হোক যখন রাজা তাহাতে দার্শনিকদের ঐতিহ্য, বিচার, খণ্ডন, মণ্ডন বিশেষ বাধা পাইবে কেন? কিন্তু চিন্তা-ভাবনাও সংস্কৃতির একটা অংশ মাত্র; আর ভাব-জগতও একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, আর্থিক নিয়মকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের এই আর্থিক বিবর্তনের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। সত্য বটে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে বেদের নির্ঘণ্ট (ম্যাক-ডোনাল্ড ও কীথের বেদিক ইনডেক্স্) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও বিচার বিশ্লেষণ লাভ করায় এবং দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট জাতকের অনুবাদ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উদ্ধার ও অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় এখন প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো পর্বের আর্থিক বিবরণ রচনা করা গবেষকদের পক্ষে একটু সহজ হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বহু পর্ব এখনো অনালোকিত। আর, আর্থিক বিবরণকেও সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বুঝিবার চেষ্টা এখনো সুপ্রচলিত নয়। তাহা না বুঝিলে প্রাচীন ভারতীয় আর্থিক জীবন, তাহার রাষ্ট্রীয় রূপ, তাহার সামাজিক কীর্তি,—বনিয়াদ হইতে শিখরচূড়া কোনো কিছুকে সত্যরূপে বুঝাও সম্ভব নয়। অবশ্য এইদিকে বাধাও অসামান্য;—ভারতীয় প্রাচীন জীবনযাত্রার বাস্তব প্রমাণ বিশেষ নাই, সামাজিক অবস্থার বিবরণ আরও জটিল। উহার অভাবে উল্টা পথে চেষ্টা করিতে হয়। সাংস্কৃতিক উপাদান হইতে সমাজ ও আর্থিক উপযোগ অনুমান করায় এই পথে যথেষ্ট ফাঁক এবং ভুলেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

মোটামুটি তবু সামাজিক পদ্ধতির দিক হইতে এই ভারতীয় ইতিহাসকে বিচার করিতে গেলে তাহাতে পৃথিবীর পরিচিত ইতিহাসের অনুরূপ প্রত্যাশা করিব—নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে (১) 'জন' যুগের সমাজ বা ট্রাইব্ল সমাজ, ও মাতৃ-প্রাধান্য হইতে পিতৃ-প্রাধান্যের উদ্ভব। পরে ক্রমোদ্ভাবিত (২) দাসতা প্রথার সমাজ; (৩) এশিয়াটিক (প্রাচীন) সামন্ত সমাজ, উহারই সমতুল্য (৪) মধ্যযুগের সামন্ত (ফিউডাল) সমাজ; এবং (৫) ধনিকতন্ত্রী সমাজ ও (৬) সমাজতন্ত্রী সমাজ। কিন্তু প্রত্যাশা যাহাই করি, সব দেশে এই যুগগুলি এমন ধরা-বাঁধা নিয়মে আসে না, যেমন ফিউডাল সমাজ হইতেই (১৯০৫-১৯১৭-এর মধ্যে) ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাকে পাকা হইতে না দিয়া সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় সমুত্তীর্ণ হইল (১৯১৭-

১৯৩৪এর মধ্যে) সোভিয়েট ভূমি, বিশেষত তাহার মধ্য এশিয়ার জাতি সমূহ। আবার, অনেকখানেই যুগগুলি বিমিশ্র হইয়া আসে, এত পরিষ্কার সুচিহ্নিত কাঁটাছাঁটা রূপে দেখা দেয় না। এই কথা মনে রাখিয়া হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়ো হইতে (মুসলমানকালের শেষ পর্যন্ত) ভারতের সামাজিক ইতিহাসকে কিভাবে বিভাগ করা সমুচিত ? সম্ভবত এই কয়টি যুগে তাহা ভাগ করা চলে :

(১) এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ (হরপ্পা সভ্যতার ইহার নিদর্শন)।

(২) জনযুগের আর্য সমাজ (বৈদিক যুগের আর্যদের প্রথম দিককার সমাজ এইরূপই ছিল—পিতৃ-প্রধান, পশু-পালক ও কৃষি-'জন' বা ট্রাইব-এ নিবদ্ধ; সম্পত্তি ট্রাইব-গত নয়, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত; শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে। এই 'জনযুগে'র আর্যেরা তুলনায় 'হরপ্পা' সভ্যতার মত উচ্চতর ও অগ্রসর সভ্যতার অধিকারী ছিল না। অবশ্য বৈদিক যুগ শেষ হইতে না হইতেই সেই সব অনেক উপকরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আর্যসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লয়। ফলে 'জনযুগের' পরিসমাপ্তি অচিরেই ঘটে—'বৈদিকযুগ' সম্পূর্ণ শেষ (৭০০ খ্রীঃ) না হইতেই। অবশ্য 'জনপদ' বা ট্রাইব ও টাইব্‌ল্ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ আমরা পরে বহুদিন পর্যন্ত পাই। এমন কি, এখনো ভারতে ট্রাইব্‌স্ বা 'জন'-সমূহ টিকিয়া আছে, কিন্তু টিকিয়া আছে তাহারাই যাহারা সভ্যতার প্রবাহ হইতে দূরে ছিল ; ভারতীয় সমাজের তাহা মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়।

(৩) সামন্ত যুগ বা 'ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের সমাজ' (মার্কস, ক্যাপিটেল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩) সামন্ততন্ত্রের মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থা বলিয়া গণনা করা হয়। সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতের সামন্ততন্ত্রের। ইহা আরম্ভ হয় বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই—যোদ্ধশাসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পার্শ্বে তখন দেখি বণিকশ্রেণীকে, ভূমিজ ও অন্ত্যজদের নানা স্তরের মধ্য দিয়া এই সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিতে থাকে ইংরেজ (বুর্জোয়া) সাম্রাজ্যের পত্তনে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ইহারই শেষ বিঘোষিত হইয়াছে, বিদেশী বুর্জোয়ার অংশীদাররূপে দেশী বুর্জোয়া যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

প্রথমেই যাহা তাই লক্ষণীয় তাহা এই—গ্রীস-রোমের মত দাস-উৎপাদন-ব্যবস্থা ও 'দাসতার যুগ' আমরা পাই না; অবশ্য গৃহদাস দাসকৃষিক নিশ্চয়ই ছিল। দ্বিতীয়ত, সামন্ত যুগেরও নানা রকমফের এই দেশে দেখা

যায়—যেমন, মৌর্যদের কেন্দ্রিত সামন্ত রাষ্ট্র ; ব্রাহ্মণানুশাসিত সামন্ত শাসন; রাজপুত (অভারতীয় ?) সামন্ততন্ত্র ; জায়গীরদারী ; 'দেশীরাজা' ও জমিদারী, ইত্যাদি। তৃতীয়ত, বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব যতই প্রাচীন হউক (বুদ্ধদেবের সমকালীন) তাহারা বিনিময় ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উৎপাদন ক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হয় নাই—উৎপাদন-বিপ্লব ঘটে নাই।

এই সুদীর্ঘ সামন্ত যুগ হুবহু অন্য কোনো দেশের সামন্ততন্ত্রের মত নয়, ইউরোপীয় ফিউডালিজম্ হইতে ইহা পৃথক। এমন কি, 'এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্র' হইতেও স্বতন্ত্র। কিন্তু মূলত সামন্ততন্ত্রের প্রধান গুণসমূহ উহাতে দেখা যায়। এই কারণে ইহাকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বলিয়াও পরিচয় দেওয়া চলে। ইহার প্রধানতম লক্ষণ বা কাঠামো কি ? প্রথমত, এই সমাজের আর্থিক বনিয়াদ ছিল কৃষি এবং কৃষি-সম্পর্কিত শিল্প। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের এই কৃষিসভ্যতা পৌরসভ্যতা হয় নাই। সামুদ্রিক বন্দর (ভারকুচ্ছ, তাম্রলিপ্ত, প্রভৃতি) ছাড়া শহরগুলি প্রধানত ছিল রাজধানী বা তীর্থক্ষেত্র। তৃতীয়ত, ভারতীয় সমাজের আসল শাসন-কাঠামো স্বয়ংনির্ভর পল্লী-পঞ্চায়েৎ বা 'ভিলেজ কমিউনিটি'। পল্লীর জীবনযাত্রা তাহারাই পূর্বাপর সাধারণ ভাবে নির্বাহ করিত। রাজা রাজ্যের পরিবর্তনে এই পল্লী-সমাজ ভাঙে নাই। এইরূপ পল্লী-কেন্দ্রিত কৃষি-সমাজ হয়ত প্রাচীন যুগে এশিয়ার বহু দেশেই দেখা দিয়াছিল। অন্তত চীনের ব্যবস্থা ইহার সহিত তুলনীয়। অবশ্য চীনা পল্লী-জীবনেরও প্রধান কথা পিতৃ-চালিত পরিবার ; ভারতবর্ষের জীবনের প্রধান একটি কথা তাহা বটে ; কিন্তু আবার পল্লী-পঞ্চায়েৎও বটে ; আর ক্রমে এখানে প্রধান হইয়া উঠে উহার সহিত জাত-পঞ্চায়েৎ : 'ফ্যামিলি', 'ভিলেজ কমিউনিটি' ও 'কাষ্ট' এই ত্রিপাদের উপর ভারতীয় সমাজ পূর্বাপর নির্ভর করিয়াছে। কোন আর্থিক বিপ্লব—উৎপাদন-শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, উৎপাদন-সম্পর্ক বা সামাজিক ব্যবস্থার অচল দৃঢ়তা এমন হয় নাই—যাহাতে সামাজিক বিপ্লব ঘটে—পরিবার, পল্লীসমাজ বা 'জাতি'ভেদও উড়িয়া যায়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের যে আর্থিক বনিয়াদ প্রধানত কৃষি ও কৃষি-সমাজের কুটির-শিল্প। কেন তাহার কোনো বিপ্লবী বিপর্যয় ঘটে নাই—কী রূপে সেই উৎপাদন-শক্তির প্রসার বাস্তব ব্যবস্থা দ্বারা ও ভাবগত ধারণা-ভাবনার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখানে

স্মরণীয় এই—এই কৃষি সমাজের যে একেবারে প্রসার এই দীর্ঘকালে ঘটে নাই তাহা নহে। ভিতরের ও বাহিরের তাড়নায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছে; শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্বও নানা ধর্ম-সংঘাতে (দেবদেবীর নামের আড়ালে), রাষ্ট্র-সংঘাতে, বর্ণ-সংঘাতে নানা স্মৃতি ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া ফাটিয়া বাহির হইয়াছে, হয়ত আপনার অজ্ঞাতেই নানা সৃষ্টিতে, ভাবনায়, দর্শনেও আপনার ছাপ রাখিয়াছে— ইহাও জানিবার মত, বুঝিবার মত।

বনিয়াদের বিস্তার

ইহার একটি বিশেষ কারণও আছে। সমাজ-বিকাশের যে নব যুগে আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা বিদায় লয়, তাহার পরবর্তী ইতিহাস সেই যুগেরই জের টানিয়া প্রায় এই সাড়ে তিন হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়াছে।

এই সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস তাই বলিয়া কেবল সেই প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিও নয়। বরং বলিতে পারি উহার স্বাভাবিক বিকাশ—নানা স্তরের ক্রমপরিণতি, নানা বৈচিত্র্যের ক্রমোদ্ভব। মূলত তবু সেই একটি প্রধান যুগেরই তাহা কাহিনী যে-যুগে মানুষ কৃষিকেই জীবনযাত্রার অবলম্বন করিয়া লইয়াছে, মূলত যে সমাজ পল্লীকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রীয় শাস্তির নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও যাহার পল্লীপ্রাণ কৃষি-সমাজ মোটামুটি টিকিয়া রহিয়াছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কালও এই কৃষি-সমাজের বিচিত্র এবং বিপুল বিকাশের সাক্ষ্যই বহন করে। হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োর পরেই দেখি—সমাজে শাসক ও শাসিতভেদ ও বাণিজ্য প্রচলন যথেষ্ট দৃঢ়; পল্লীগত সেই কৃষিসমাজ নগরপত্তনও করিতে শুরু করিয়াছে; আর তাহাদের পৌর-জীবন গৃহশিল্পে, দ্রব্য বণ্টনে ও বিনিময় পদ্ধতিতে যথেষ্ট অগ্রসর ও উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে ভারতবর্ষে নূতন জাতি আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তী প্রাচীন জাতিদের জীবিকার পন্থাকে তাহারা মুছিয়া ফেলে নাই। কিন্তু গ্রীস বারোসের মত পৌরসভ্যতার বিকাশ এখানে আর সম্ভব হয় নাই। নগর, বন্দর ছিল; কিন্তু জীবন ছিল পল্লীতে বিস্তৃত। কৃষিসভ্যতার সেই সুদীর্ঘ যুগই চলিয়াছে। ভারতীয় সমাজ "এশিয়াটিক সমাজের" একটি বিশিষ্ট বিকাশরূপে একটা মন্থর তৃপ্ত

গতিতে যেন এই ভূমিগত বনিয়াদের উপর বিবর্তিত হইতে লাগিল শ্রেণীবিপ্লবের দ্বারা রূপান্তরিত হইল না, শ্রেণীবিদ্রোহের ফলে মাঝে মাঝে শুধু আপোস রফা করিয়া টিকিয়া রহিল।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ তাই থামিয়া থাকে নাই; তাহার সংস্কৃতির ইতিহাসও নিশ্চল হয় নাই। বরং যাহাকে আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতি বলি—আমাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও নানা ধর্মচিন্তা, ধর্মানুষ্ঠান, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্ম ও আচার-বিচার—এই সবই এই সময়ের মধ্যে উদ্ভূত ও নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবন-যাত্রার বাস্তব বনিয়াদ রহিয়াছে কৃষি ও কৃষিগত সমাজের গৃহশিল্প, এবং তাহারই বিনিময় ও বণ্টন পদ্ধতি; লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের বনিয়াদও কতকটা সেই প্রথমকার যুগের জন্মকালীন ক্রিয়াকলাপ, শব-সৎকার পদ্ধতি, সেই প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও উপকরণের উপাসনা, সেই পত্র-পুষ্প, ফল-জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু দিয়াই আবার দেবতার পূজা;—আর লৌকিক মনও এখনো পর্যন্ত ইহাদের প্রভাবেই পরিচালিত। কিন্তু জীবিকার স্বাভাবিক তাগিদেই এই প্রাগৈতিহাসিক বনিয়াদ ঐতিহাসিক কালে আরো প্রসারিত, আরো প্রবল আকার ধারণ করে। এবং শ্রেণীভেদের স্বাভাবিক নিয়মেই শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শ্রেণী সংঘর্ষও বাধে; নানা ভাবে শাসক শ্রেণী তাহা দাবাইয়া দেয় বা মানাইয়া লয়, সেই উদ্দেশ্যে স্মৃতি প্রণয়ন করে, আচার-নিয়ম, দর্শন, ধর্মকর্ম উদ্ভাবনও করে।

প্রসারের ধারা

ভারতীয় সমাজের এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমপ্রসারের নিয়মগুলি বারে-বারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি সেইগুলি স্মরণে রাখিলে ভারতীয় সংস্কৃতির নানাদিকের বৈচিত্র্যে বা আপাতবিরোধিতায় চমকিত হইতে হয় না। ভারতীয় ইতিহাস ও তাহারই ক্রমবিকাশের ধারাও আমরা যুক্তিযুক্তভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। পশুচারিক সমাজ অপেক্ষা কৃষিসমাজ বেশি স্থায়ী সমাজ; কৃষি ও পশু উৎপাদন এই যুগে বাড়িয়া যায়; তাই তাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন পরিমাণ ও লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে সমাজ তাহার প্রসারেরও কতকটা বন্দোবস্ত করিতে পারিত। দেশ বিরাট, স্বভাবতই নূতন বনভূমির আবাদ বাড়ে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন গ্রামের

পত্তন হয়; দেহের জীবকোষের মত আরও একটির পর একটি নূতন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়; সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের ও বিনিময়ের নূতন তাগিদ আসে, গতায়াতের জন্য পথঘাট, যানবাহন দেখা দেয়। বংশ বা কূল (clan) ছাড়াইয়া জীবন-যাত্রার কেন্দ্র হইয়া উঠে এক এক 'জন' বা কৌম (tribe), আর তাহাদের আশ্রয়ও এক এক পল্লীকেন্দ্র (village) ছাড়াইয়া উঠে এক এক অঞ্চল (zone)।

মানুষের সভ্যতার গোড়ায় তার উৎপাদন শক্তি। কিন্তু ক্রমে সভ্যতার উপর উৎপাদনের মত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এই বিচ্ছিন্ন মনুষ্য গোষ্ঠীর পরস্পরের সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা, অর্থাৎ বণ্টন ও বিনিময়। এ ব্যাপারটি আজ এমনি সত্য যে, কেহ কেহ বলিয়া বসেন সভ্যতার মূল তথ্য ইহাই :—"diastole and systole of population" এবং "scope, pace and precision of human intercommunication"—অর্থাৎ লোক-প্রবাহ ও মানব-গোষ্ঠীর পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ, তীব্রতা ও সুনিশ্চয়তা। কথাটা মিথ্যা নয়—কারণ, সভ্যতা অগ্রসর হয় লোক-বৃদ্ধিতে এবং সেই লোক-সমাজের পরস্পরের পরিচয়সূত্রে। কিন্তু সভ্যতার প্রারম্ভ জীবিকার প্রয়াসে, জীবিকা উৎপাদন চেষ্টায়। উৎপাদনের বণ্টন ও বিনিময় সেই জীবিকা-প্রয়াসেরই একটা আনুষঙ্গিক দিক, এই উৎপাদন-প্রথারই একটা বিশিষ্ট বিকাশ। সমাজ একটু অগ্রসর হইলে বিনিময় ও বণ্টনের কথা ওঠে। লোক-বৃদ্ধিরও গোড়ায় চাই আহার্য বৃদ্ধি, না হইলে লোক সমাজে বংশবৃদ্ধি কাজের হয় না। আর আহার্য বৃদ্ধির অর্থই আবার জীবিকার উৎপাদন-বৃদ্ধি, উৎপাদন শক্তির উৎকর্ষ। তাই সকলের মূল উৎপাদন, তাহার পর আসে বণ্টন ও বিনিময়। মানুষের নানা গোষ্ঠীর পরিচয়ের সূত্রও ইহাদেরই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে,—এই তিন লইয়া আর্থিক জীবনের বনিয়াদ। তাই সামাজিক অনুধাবনে নানা জাতির পরিচয়ের উপর তত জোর দেওয়া মূলত ঠিক নয়—সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিপুঞ্জের দ্বন্দ্বই সমাজের বিকাশের কারণ, এমন কি নূতন জাতির সহিত সংস্পর্শে আসিবারও কারণ হয়।

কিন্তু নূতন শক্তির সহিত সংস্পর্শও দুই রকমের হইতে পারে—মিত্রতার কিংবা বিরোধের। জীবিকার তাগিদে যে গোষ্ঠী ছড়াইয়া পড়িয়া নূতন নূতন কেন্দ্র গড়ে তাহারা আবার পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীর সহিত সেই জীবিকা লইয়াই

কলহে ব্যাপৃত হয়। সে কলহ পশুচারী সমাজে পশু লইয়া বা পশুচারণ ভূমি লইয়া বাধে ; কৃষিসমাজে তদুপরি বাধে ক্ষেত্র লইয়া, গোধন লইয়া আর গৃহের সঞ্চিত উপকরণ লইয়া। এই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বের ফলেই সমাজে যোদ্ধশ্রেণীর প্রয়োজন হয় সর্বাধিক ; তাহাতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রভুত্ব স্থায়ী হইতে থাকে, আর নারী জাতির প্রভাব ক্রমশ গৌণ হইয়া উঠে। এই বিরোধ দুই দশ বৎসরে শেষ হয় না, চলে পুরুষের পর পুরুষ। তারপর একদিন এইরূপ বিরোধেরও একটা সমাধান হয়। ততদিনে আবার পরস্পরের জীবনযাত্রা, আচার-বিচার, চিন্তা-ভাবনা পরস্পরের জানা হইয়া যায় ; এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহার প্রভাবও খানিকটা পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় হইয়া উঠে। এইরূপেই পরিচয়ের সূত্র মানুষের সভ্যতায় নূতন ভঙ্গিমা, নূতন রঙ, নূতন রস জোগাইয়া দেয়। শুধুমাত্র উৎপাদনের পদ্ধতি দিয়া আক্ষরিকরূপে হিসাব করিলে হয়ত ইহার সঠিক কারণ সব সময়ে বুঝিয়া উঠা যায় না। তবু সংস্কৃতির সেই নূতন নূতন ভঙ্গিমার কারণ নূতন আর্থিক ভঙ্গিমা। মানে, ভঙ্গিমার কারণ থাকে উৎপাদন প্রথায়, উপকরণে কিংবা উৎপাদনের বণ্টনে বিনিময়ে ; কিংবা একেবারে নূতন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ে, মিলনে-বিরোধে—এই শেষ কারণেও সংস্কৃতির আর্থিক বনিয়াদও বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। যেমন ইংরেজের আমলে আমাদের আর্থিক জীবন পরিবর্তিত হইতেছে, আর তাই সংস্কৃতি রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু নতুন জাতির সহিত পরিচয়ে সব সময়ে আর্থিক জীবনের অত মূলগত পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে, শুধু একটা নূতন স্তর বা নূতন ভঙ্গিমার বিকাশ সম্ভবত হইতে পারে, প্রচলিত সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য জুটিতে পারে,—মুসলমান জাতিদের আগমনে ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে তাকাইলেই এই সত্যটির আরও বিশেষ প্রমাণ মিলে—অন্যান্য দেশের কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে উহার ভঙ্গীর ও রঙের পার্থক্য কতকাংশে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সে পার্থক্যের কারণ (১) কতকটা ভৌগলিক : যেমন এই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সুবিধা, এই নদীমাতৃক দেশের সুবিধা ; (২) মূলত এই সুযোগে উৎপাদন প্রথার বিশেষ বিস্তার ও সামাজিক বিন্যাস ; (৩) কতকটা আবার পৌরাণিক ও লৌকিক : নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে উদ্ভাবিত আদিম আচার-বিচার, চিন্তা-কল্পনা ; আর (৪) খানিকটা আর্য, ইরানী, য়ুনানী প্রভৃতি নূতন নূতন

জাতির আনীত তেমনি আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি, শিল্প-বিজ্ঞান; (৫) এই সব নানা প্রভাবের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় ও বিচিত্র বিকাশ।

ঐতিহাসিক কালেও তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু তাহার প্রাগৈতিহাসিক কৃষি-সভ্যতাকে বনিয়াদ করিয়াই একই রূপ রহিয়া গিয়াছে, এই কথা আক্ষরিক হিসাবে পুরা সত্য নয়। এই তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষ প্রথমত সেই বনিয়াদের বিস্তার সাধন করিয়াছে—তাহার উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া, তাহার গৃহ-শিল্পকে ক্রমবিকশিত করিয়া, তাহার বণ্টন-বিনিময়ের পদ্ধতিকেও ক্রমপরিণত করিয়া। দ্বিতীয়ত, আবার সেই নূতন ও পুরাতন বনিয়াদেরও উপর একদিকে পুরাতন আচার অনুষ্ঠানকে টিকিয়া থাকিতে দিয়াছে, অন্যদিকে পুরাতনকেও আবার নবায়িত করিয়া লইয়াছে—কোথাও নূতনের প্রলেপে, কোথাও নূতন মাল মসলায়—নূতনের সহিত পুরাতনের সমন্বয় করিয়া, কিংবা কোথাও নূতনে-পুরাতনে শুধুমাত্র বিমিশ্র করিয়া। তৃতীয়ত, ইহা ছাড়া আবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বনিয়াদের উপর নূতন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়িতেও ক্রটী করে নাই—কোথাও সেই অনুষ্ঠান সেই কৃষি-জীবনের স্বাভাবিক নূতন পরিণতি, কোথাও হয়ত তাহা অন্য মানব-গোষ্ঠীর সহিত পরিচয় সূত্রে আহরিত, এবং হয়ত বা তাহাও কতকাংশে আবার ভারতীয় সমাজের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া-সাজা। চতুর্থত, ভারতবাসীর মানস-জীবনেও ঠিক এই প্রকারই পরিণতি যুগে যুগে ঘটিল, ইহারই প্রতিলিপি বহন করিল। চিন্তায় সেই আদিম ভূত-ভীতি ও পূজা, সেই আচার-বিচার, সেই 'টোটেম-তাবু'র সংস্কার, যোগ-প্রক্রিয়া, সেই ভাব-প্রাবল্য প্রভৃতি রহিয়া গেল, স্বাভাবিক বিকাশধর্মেই তাহা নূতনও হইল। অন্যদিকে নূতন অনুষ্ঠান, নূতন জাতি ও তাহাদের নূতন চিন্তা আসিয়া জুটিল, এবং তাহার খানিকটা গৃহীত, খানিকটা পরিবর্জিত হইল। ক্রমে এই নূতন পুরাতনের বিবিধ সংমিশ্রণে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতীয় অনুষ্ঠান ও আচার অকল্পিত নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য লাভ করিল। সেই নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য মনে হয় আজ এমনি মৌলিক যে আজ আমরা তাহার মূলকেও খুঁজিয়া দেখি না। ভুলিয়া যাই: সেই মূল কৃষি-সভ্যতা আর তাহার বৈশিষ্ট্যের কারণ এই ভৌগলিক পরিবেশ; তাহার বৈচিত্র্যের গোড়া—এই দেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশে মানুষের সচ্ছন্দ স্বতন্ত্র আর্থিক জীবনযাত্রা; এই দুইএর মোটামুটি সমন্বয়, আর সেই

জীবন-প্রথার সহিত দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে সংযুক্ত নব নব জাতিদের জীবন ও চিন্তাধারা।—এইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি, বহু বিমিশ্র অনুষ্ঠান ও মানসসম্পদ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি।

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া সংক্ষেপে তাহার পর্বগুলিকে একবার বুঝিয়া লইলেও দেখিব—এই বৈচিত্র্য কিরূপ, উহার কারণই বা কি। মোটের উপর এই দিকে আমাদের উপাদানও আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই ইতিহাসে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি কুলপতি হইল, গ্রামণী রাজন্য হইল; বৃত্তির তাগিদে শ্রমভেদ ও শ্রেণীভেদ জাতিভেদ রূপে দেখা দিল। (দ্রষ্টব্য—'পরিচয়ে' প্রকাশিত ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা।) প্রায় দুই হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়া এখন যন্ত্রযুগের সম্মুখে সেই কৃষি-সংস্কৃতি ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য দুর্লভ—তবু মোট বিভাগগুলি দুর্লক্ষ্য নয়।

আর্য-বিস্তার

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক কাল শুরু হয় আর্যভাষী গোষ্ঠীদের আগমনে ও আর্যদের দানে। কালটাকে মোটামুটি এখন খ্রীষ্টপূর্ব ১,৫০০ অব্দ বলা হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি। আজও ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির লৌকিক পরিচয়—যদিও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, আর বৈজ্ঞানিক পরিচয়ও ইহা নয়। ভুলিলে চলিবে না—প্রথম কথা নবাগত আর্যসভ্যতাও শুধু আর্যেরই নিজস্ব সম্পদ নয়—আসিবার পথে সেই আর্যভাষী গোষ্ঠীগুলি মেসোপোতামিয়া ও আসুরীয় জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রাচীন ঈরানীয়দের সহিতও জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে ও জ্ঞাতি-শত্রুতায় তাহারা সম্পর্কিত ছিল। ভারতের পথে তাই ইহারা কুড়াইয়া আনিয়াছিল সেই প্রাচীনতর জাতিদের অনুষ্ঠান ও চিন্তা, বৈদিকধর্ম ও দেবতাবাদ, বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে উহার চিহ্ন হয়ত সামান্য আছে, কিন্তু আর্যদের লৌকিক জীবন-প্রণালীতে যাহার চিহ্ন ছিল তখনো হয়ত ব্যাপক। আর পরবর্তী কালের পরিবর্তনের মধ্যেও হয়ত তাহার পূর্বরূপ পরিবর্তিত হইয়াও কিছু না কিছু রহিয়া গিয়াছিল—হয়ত এখন আর তাহা চিনিয়া উঠাও সুসাধ্য নয়। যেমন,

অথর্ববেদের মন্ত্র-তন্ত্র হয়ত একদিকে পূর্বকালীন ইরানী অবৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের স্মারক এবং দেশীয় অবৈদিক ঝাড়-ফুঁকের বাহক।

আর্যের নিজস্বতার স্বরূপটি অবশ্য এইরূপ—কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই নিজস্বতা বহুলাংশে এমনি পরস্ব। দ্বিতীয় কথা, আর্যরাও সকলে এক গোষ্ঠীর নয়, আর সবাই সভ্যতার সমস্তরেও ছিল না। তাহাদের মধ্যে জীবিকার উপাদান রূপে হয়ত তখনও সকলে কৃষি গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ ছিল পশুচারী; অধিকাংশই কৃষি ও পশুচারণা দুইই অবলম্বন করিয়াছে। মোটের উপর যাযাবর-বৃত্তি তাহারা কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঠিক। তবে সকলেই এক ধর্ম ও সংস্কৃতি মানিত। 'আর্য' কথার অর্থ সম্ভবত ইহাই—"স্বজন"। তৃতীয় কথা, যেমন আর্যরা সকলে সমস্তরে ছিল না, তেমনি সকলে এককালেও আসে নাই—আসিয়াছিল বহু শতাব্দী জুড়িয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গে। হয়ত তাহার প্রারম্ভ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে আর তাহার অবসান খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০, ৭০০ অব্দের দিকে। চতুর্থ কথা, ততদিনে আর্যদের যাহা নিজস্ব রূপ তাহারা বহিয়া আনিতেছিল—বেদমন্ত্রে যাহার হয়ত অনেকটা অবিকৃত প্রমাণ রহিয়াছে—তাহা ভারতের অনার্যদের, অর্থাৎ সেই মিশ্র ও অমিশ্র কোল-সাঁওতাল, অস্ট্রিকদের এবং দ্রাবিড়ভাষীদের দানকেও স্বীকার করিয়া নূতন ও বিস্তারিত বনিয়াদ গড়িয়া ফেলিতেছে—ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বনিয়াদ সৃষ্টি করিতেছে। ইহার অর্থ পরিষ্কার—হিন্দু সভ্যতা নিছক আর্য সভ্যতা নয়। পঞ্চম কথা কিন্তু যতই আর্যধর্ম ও আর্যভাষার প্রলেপে এবং আর্যের বিপুল শক্তির নিকট এই ভূমির প্রাচীন ধর্ম ও ভাষা পরাজিত হউক, ইহাও স্বীকার্য যে, নবাগত আর্যদল এইখানকার অধিবাসীদের, যেমন হরপ্পা-কৃষ্টির অধিকারীদের, কাহারও কাহারও তুলনায় ছিল সভ্যতার হিসাবে অসভ্য ও বর্বর। (হরপ্পার লোকদের urn-burial হইতে অ-বৈদিক আর্য ভাবিবার কারণ নাই; কারণ উহার সহিত সুমেরের সম্পর্ক প্রাচীন ও পরিষ্কার)।

মোহন-জো-দড়োর সভ্য জীবনকে এই বিজেতারা ভাঙিতেই পারিল। অর্ধ-সভ্যের হাতে গৃহস্থের অনেক সময়ে এমনি পরাজয় ঘটে। ইহার দুইটি বাস্তব কারণও সম্ভবত ছিল: প্রথমত আর্যেরা সেই যুগের ব্লিটজ্‌-ক্রিগের আবিষ্কর্তা। তাহাদের নূতন যুদ্ধযন্ত্র অবশ্য ট্যাঙ্ক নয়, তাহার নাম অশ্ব। যদিও বেদে 'অশ্বের' উল্লেখ পরিষ্কার নাই। কিন্তু ভারতের বাহিরেই

এই জীবটির সহিত আর্যদের পরিচয় ঘটিয়াছিল (দ্রষ্টব্য রাহুল, মানবসমাজ)। তুরগবাহী আর্যের দলগত বিন্যাসও ছিল দুর্ধর্ষ; ইহাই তাহাদের জয়লাভের দ্বিতীয় কারণ। বিশেষত একালের বিত্তহীনদের মতো সেদিনকার আর্যদলেরও had nothing to lose. তাই, সেই গৃহস্থ সমাজকেও পরাজিত করিয়া যখন এই বলিষ্ঠ বর্বরের দল তাহাদের জীবন-যাত্রার উপকরণ অধিকার করিয়া বসিল তখন প্রাচীন সমাজেও এক প্রবলতর, নূতনতর প্রেরণাই তাহারা দান করিতে পারিল। কৃষি-সংস্কৃতি স্বভাবত ঐক্য-বিধায়িনী নয়, খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রায় তাহা অভ্যস্ত। কিন্তু এই বিজেতার দল শত্রুর সহিত সংঘর্ষের ও দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে এই সমাজকে খানিকটা কেন্দ্রাভিমুখী না করিয়া পারিল না। মনে হয়—সেই শক্তিও তাহাদের ছিল: "সম্ভবতঃ তাহারা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্ম-সমাহিত।" (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃষ্ঠা ১৯।) বলা বাহুল্য বিভিন্ন দেশে প্রাচীন আর্যভাষীদের কর্মক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের এইরূপ ভাবা চলে। রক্ত বহিয়া গুণগ্রাম বিশুদ্ধ আসে না, আসিলেও তাহা বহু রক্তে মিশিয়া এখন আর ভারতীয় রক্তে তেমন প্রবল নাই। আজ ভারতীয় জীবনযাত্রার মধ্যে ঐসব আর্য-মানসিকগুণের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? বরং এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে পারি তৎপরিবর্তে টিকিয়া আছে (সুনীতিবাবুর উল্লেখিত) তথাকথিত 'দ্রাবিড়-ভাষীদের ভাব-প্রাবল্য' এবং 'অস্ট্রিক জাতীয় অলস নমনীয়তা'। অবশ্য এইরূপ উক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অচল; জাতিগত ও রক্তগত ভাবে কোনো ভাব-প্রবাহ বহিয়া চলে, বিজ্ঞান ইহা মানে না। যাহাই হউক, সংঘর্ষের উপযোগী মনোভাব ও শক্তি ভারতভূমির অপর্যাপ্ত দাক্ষিণ্যে সমাগত আর্য কৃষি-সমাজ হারাইয়া ফেলিতে দেরী করে নাই। তেমনি ভাবে য়ুনানী, শক, হুন প্রভৃতি অন্যান্য পরবর্তী আগন্তুকরাও তাহা অচিরেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের গৃহস্থ কৃষি-সভ্যতাকে তথাপি তাহারাও সকলেই নানাভাবে প্রসারিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছে।

বৈদিক সমাজ *

বৈদিক আর্যদের সমাজের কথাই বেদে ও প্রথমদিককার বৈদিক সাহিত্যে আমরা লাভ করিতে পারি—অ-বৈদিক আর্যদের কথা বা অ-বৈদিক অন্‌-আর্যদের কথা তাহাতে পরোক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষসূত্রে নাই। 'আর্য'রা তখনো বিভিন্ন 'জন' বা 'কুলে' বিভক্ত। 'জনে'র অধিনেতা 'রাজন্‌'। তখন যুদ্ধ ও বিজয়ের যুগ। 'আর্য' জনগুলি পরস্পরেরও ভূমি, গোধন প্রভৃতি লুণ্ঠন করে, আবার বিভিন্ন আর্যগণ একত্রিত হইয়া 'পরে'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। যাহারা 'আর্য' নয় তাহারাই পর, শত্রু, অর্থাৎ বৈদিক দেবদেবী, যাগ-যজ্ঞ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মানে না। সচরাচর তাহাদেরই নাম 'দাস', 'দস্যু,' অর্থাৎ শত্রু। জনের সংগঠনটা এইরূপ—কতকগুলি 'বিশ' লইয়া একটি 'জন' বা ট্রাইব, কতকগুলি 'গ্রাম' লইয়া আবার এক একটি 'বিশ', আর কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি 'গ্রাম', সকলের নীচে 'গ্রাম', উপরে 'জন'। যোদ্ধ-প্রাধান্য এই সব 'জনের' মধ্যে বেশি, মন্ত্রকার ও যাগ-যজ্ঞাভিজ্ঞ যাজকশ্রেণীরও প্রাধান্য তত নয়—অবশ্য মনে রাখিতে পারি, হয়ত পুরোহিত-রাজের (উর, লাগাসের, হরপ্পারও ?) যুগ পশ্চিম এশিয়ায় একেবারে শেষ হয় নাই। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে বৈদিক সামাজিক শ্রমবিভাগের ফলে ইরানের মত তিনটি শ্রেণী দেখা দিতেছে—যোদ্ধশ্রেণী (ক্ষত্রিয়), পুরোহিতশ্রেণী (ব্রাহ্মণ), সাধারণ জনগণ (বিশ-বৈশ্য)। স্বাধীন নানা বৃত্তিধারী ও কৃষিজীবী পরিবার ইহাদেরই অন্তর্গত। ইহারও বাহিরে হয়ত ছিল 'উপাস্তি' বা প্রায় গোলামের (স্লেভ-এর) তুল্য আশ্রিতশ্রেণী ; এবং ঋণ-দাস ও যুদ্ধ-দাস, ক্রীত-দাস প্রভৃতি, গৃহ-দাস (স্লেভস্‌) প্রভৃতি গোলাম শ্রেণী। 'বিশ' সকলের খাদ্যবস্ত্রাদির ভার গ্রহণ করে—অবশ্য ইহা কার্যবিভাগ মাত্র, শ্রেণীভেদ ; 'জাতিভেদ' নয়। কিন্তু ক্রমশই যোদ্ধশ্রেণী রক্ষাকর্তা হইয়া উঠে। 'বিশই' প্রথম যোদ্ধনেতাকে হয়ত নির্বাচন করিত 'রাজন্‌', কিন্তু অনেক জনেই পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কর ক্রমশ প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে, বৈদিক আর্যসমাজে 'রাজন্‌' ট্রাইবল্‌ চিফ্‌, কিন্তু 'বিশপতি', 'গ্রামাণি'ও আছে, গ্রামের 'সভা'য় তখনো কিন্তু গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসে। আর জনের সাধারণ সম্মেলন 'সমিতি'ও সর্বমান্য। কিন্তু রাজন্‌ ও 'রাজন্য'

---

*এই আলোচনা প্রধানত ডা: দত্ত ও পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত।

(রাজগোষ্ঠী) ক্রমশ শাসনভার কাড়িয়া লয়—যদিও তখনো এই 'রাজন্'গণ স্পষ্টত দাবী করিত না যে তাহারা শুধু 'নৃপতি' নয়, 'ভূপতি'ও, ভূমির মালিক। (রাজার এই দাবী পরবর্তী কালেও সকল স্মৃতিকার স্বীকার করেন নাই)।

পিতৃপ্রাধান্য তখন স্বীকৃত; পুরুষ প্রাধান্য সুস্পষ্ট; দেবতারাও অধিকাংশই পুরুষ। কিন্তু গৃহপতির যজ্ঞসঙ্গিনী 'গৃহপত্নী'ও সম্মানিত, পশুপালক সমাজে 'দুহিতার' তখনো প্রয়োজন আছে; কিন্তু সেই যোদ্ধসমাজেও পুত্রের সঙ্গে সে তুলনীয় নয়, বলাই বাহুল্য। 'সতীদাহ' অপেক্ষাও বিধবার 'দেবর' বিবাহই হয়ত সুপ্রচলিত ছিল,—বংশবৃদ্ধির জন্যও বটে, পারিবারিক সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্যও বটে। বাস্তব উপকরণে তখনো তাম্রপ্রস্তরযুগ। পশুপালনই কৃষির অপেক্ষাও জীবিকার প্রশস্ততর উপায়। প্রধান সম্পত্তিও তখন গোধন, প্রধান খাদ্য দুগ্ধ, পায়স; গরুমেষ, ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, কুকুর তখন গৃহপালিত জীব। আহারে যজ্ঞে, উৎসবে গোহত্যা যথেষ্ট প্রশস্ত। দ্বিতীয় সম্পত্তি—কৃষি। লাঙ্গলের দ্বারা চাষ হয়, গম, যব প্রভৃতি চাষ হইত, চাউলের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। দেবতাদেরও প্রধান খাদ্য এই সব শস্যের পুরোডাশ, আর প্রধানতম পানীয় সোম (আধুনিক সিদ্ধি)। ইহার পর বৃত্তিধারীরা—ইহারা সূত্রধর, রথকার, কর্মকার, চর্ম পরিষ্কারক প্রভৃতি। তখনো লোহ সম্ভবত অপ্রচলিত; কাঠের তৈজসপত্র, তাম্র, পিত্তলের ও মৃত্তিকার 'স্থালী' প্রভৃতি, রঙীন ও কাজকরা 'বাস' ব্যবহৃত হয়, চর্মপরিচ্ছদও আছে। —এইরূপই জীবন-যাত্রার অবলম্বন। উৎসব প্রধানত সভায় 'দ্যূতক্রীড়া,' রথের দৌড়, আর স্ত্রী-পুরুষের একযোগে 'নৃত্য'।—সোমপান অবশ্য ধর্মের অঙ্গ। আর সেই ধর্মের অধিকাংশ তখন যাগ-যজ্ঞ নানা জটিল অনুষ্ঠান-পল্লবিত—নিশ্চয়ই যে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী তাহা রক্ষা করেন তাহারা পুরোহিত যাদুকরেরই মত শক্তিধর বলিয়া সম্মানিত; আর দেবতারা কতকটা আদিকালের মত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক (উষা প্রভৃতি), কতকটা জন-বিভক্ত যোদ্ধসমাজের নেতা; যেমন ইন্দ্র কিম্বা বরুণ। দেবলোক এই মনুষ্যলোকেরই প্রতিচ্ছায়া।

প্রথম দিক্‌কার সপ্তসিন্ধু দেশের বৈদিক সমাজের ইহাই রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক রূপ। কুরু-পাঞ্চাল প্রদেশেও অবস্থা এইরূপ। যতই বৈদিক আর্যরা বিজয়ী রূপে দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনা-রামগঙ্গা প্রদেশে প্রবেশ করিতে

লাগিল, বিজয়ী রূপে 'আর্যাবর্তে' স্থির হইয়া বসিতে লাগিল; ততই এই 'জন-সত্তাক' রূপ পরিবর্তিত হইয়া চলিল। 'ঋকবেদের'ও ১০ম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া স্বীকৃত। উহার পরম গৌরব উহার একেশ্বরবাদ। বেদের বহুদেববাদ যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'জনের' শাসকের প্রতিচ্ছায়া, তেমনি এই নবোদ্ভিন্ন একেশ্বরবাদ বৈদিক 'জন'-স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে সম্রাট-শাসিত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র উদ্ভবের আভাস। —বৈদিক 'জনযুগ' শেষ হইয়াছে; বড় বড় 'রাষ্ট্র' গঠনের যুগ আসিয়াছে। নির্বাচিত নায়ক 'রাজন্' হইয়াছিল; 'রাজন্য'-শাসনও চলিতেছিল; এখন সে শাসক রাষ্ট্রের সার্বভৌম রাজা হইয়া বসিয়াছেন। ইহাতে যোদ্ধ-শ্রেণীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাই। 'দশমমণ্ডলে' এমনি এক সুবিদিত সূক্ত 'পুরুষসূক্ত'—ব্রহ্মার দেহ হইতে চতুর্বর্ণের উদ্ভবের সুপরিচিত কাহিনী। পুরোহিত শ্রেণী শুধু উদ্ভূত হয় নাই, ব্রাহ্মণ রূপে সমাজদেহের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত বলিয়াই ইহাতে দাবী করিতেছেন;—অর্থাৎ যোদ্ধ-সমাজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যুদ্ধ-বিজয়ের পরে আর বেদাভিজ্ঞ যাজক শ্রেণী মানিয়া লয় না। উভয়েই শাসকশ্রেণীর; বিশেষত বর্ণভেদ তখনো কর্মগত; রাজ তন্ত্রে ও পুরোহিত তন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপে তথাপি বৈদিক সমাজের অন্তর্বিরোধ ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। বেদের 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' ভাগ ছাড়াইয়া আরণ্যকের রচনাকালে উপস্থিত হইতেই দেখি—যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান বা কর্মকাল লইয়া পুরোহিত শ্রেণী যতই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবী করুক, তত্ত্বজিজ্ঞাসায়, ব্রহ্মবিদ্যায় রাজারাই বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিক সমাজের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; যুদ্ধজয়, শত্রুবিনাশ, শত্রুর ধনজনের লুণ্ঠনের জন্য দেবতার স্তবস্তুতির আর তেমন একান্ত প্রয়োজন নাই, চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানেরও উপর আর যোদ্ধশ্রেণীর তেমন শ্রদ্ধা নাই। থাকিবে কিরূপে?—জীবন-যাত্রার বাস্তব সাক্ষ্য যে তাহারা দেখিতেছে অন্যরূপ। কারণ বাস্তব রাজশক্তি হিসাবে রাজাদের অধিকতর জীবননিষ্ঠ হইতে হয়; আর কর্মকাণ্ডের রক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণদের হইতে হয় অধিকতর আচারনিষ্ঠ। বৈদিক যুগে তখনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ হইতে পারে; এমন কি, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কেহই জন্মসূত্রে হয় না। তবু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেণী আলাদা। আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যে এই শোষক চক্রের দুই শ্রেণীর মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে তাহার

আভাস বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভার্গব, পরশুরাম, হৈহয়, কার্তবীর্য, পুরুরবা, নহুষ প্রভৃতির বহুবিদিত আখ্যায়িকাতে ছাড়াও সংগ্রহ করা যায়। এই শ্রেণীবিরোধে ব্রাহ্মণের স্ত্রীহরণে, গো-ভক্ষণে ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বিধা ছিল না। শক্তিতে কুলাইলে ব্রাহ্মণরাও তাহাদের ছাড়িত না (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১০৪)। এই দ্বন্দ্ব অবশ্য মোটামুটি একটা সুপরিচিত মীমাংসায় পৌছে—ব্রাহ্মণ ধর্মনেতৃত্ব ও মন্ত্রণানেতৃত্ব লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়কে রাষ্ট্রনেতৃত্ব ছাড়িয়া দেয়, ক্ষত্রিয়ও রাষ্ট্রনেতৃত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লয়; কিন্তু ইহা পরবর্তী কালের কথা, যখন (কণ্ব, সুঙ্গদের সময়ে ?) হিন্দু সমাজ ও রাজত্বের সংগঠন চলে, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রণীত বা সংগৃহীত হইতে থাকে। ক্ষত্রিয়পুত্র গৌতম ও মহাবীরের অধ্যাত্ম্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ক্ষত্রিয়পুত্র শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকেই অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণদের মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু সেই অবতারেরাও বেদ-ব্রাহ্মণের দাস, বশিষ্ঠের মন্ত্রণায় চালিত, ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ, ইত্যাদি। এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা এই—বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে চতুর্বর্ণ হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাড়াও 'শূদ্রের' উল্লেখ পাই ('শূদ্র' অবশ্য বিজিত আদিম অধিবাসী নয়, আর্যদের হয়ত কোনো অধঃপতিত অংশ; দত্ত, ঐ, ১০৫); দেখি বৈশ্য (কৃষি ও বৃত্তিজীবী সাধারণ স্বাধীন মানুষ) ও শূদ্র এই দুই শ্রেণীই নিম্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইতেছে; অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও 'শ্রেণীভেদ' জাতিভেদে দানা বাঁধিবার দিকে চলিয়াছে।

অবশ্য বহুদিন পর্যন্তও তবু শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, ক্ষত্রিয় হইতে পারিত, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও শূদ্র না হইত তাহা নয়, বিবাহে তো বাধা ছিলই না। কিন্তু কাহারা এই শূদ্রশ্রেণী ? নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই; পরবর্তীকালের সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সম্ভবত আর্য সমাজেরই সেই শ্রেণী শূদ্র যাহাদের ভূ-সম্পত্তি নাই; কেহ যাহারা ক্ষেত মজুর, কেহ বা শিল্পী কারুজীবী; অবশ্য আরও পরবর্তীকালে ইহাদেরও এক অংশ আবার সেই ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সৎ-শূদ্রে উন্নীত হয়, আর ভূমিহীনরা শূদ্র বা অসৎ-শূদ্র থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই বৈদিক সমাজের বিষয়ে যাহা প্রথম এখানে জ্ঞাতব্য তাহা এই: নিজেদের এই অধোগতি বৈশ্য-শ্রেণী ও শূদ্রশ্রেণী বিনা দ্বন্দ্বেই মানিয়া লইয়াছিল ? ক্ষত্রিয়ের পিছনে

(কিংবা ব্রাহ্মণের পিছনে) কি ইহাদের শ্রেণীও সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায় নাই? বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ না থাকুক, বৈদিক যুগের শেষেই বৌদ্ধজাতকে দেখিতে পাই বণিক-শক্তির (শ্রেষ্ঠী বৈশ্যদের) আর্থিক প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ নয়, এবং একটু পরেই দেখি মগধের সিংহাসনে আসিয়া বসিতেছে শূদ্র সম্রাটরা, নন্দরা ও মৌর্যরা; আর আরও শত পাঁচেক বৎসর পরে জাতি-ভেদ যখন পাকা হইতেছে তখন বৈশ্য জাতীয় গুপ্তরা ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। তারপরও শত বাধার মধ্যেও এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের শক্তিতেই বারে বারে নানা অজ্ঞাত নিম্নজাতীয় রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; আর নিজেরাও শাসক শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করিয়া সেই রাজগণ সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়াছেন—বুঝিতেও পারেন নাই যে, শোষিতশ্রেণীর প্রতি তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন; বুঝিতে পারেন নাই যে, বিরোধ নির্মূল হইল না; শুধু সাময়িক ভাবে চাপা পড়িল। অর্থাৎ শুধু শ্রেণীভেদ নয়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের বীজ বৈদিক সমাজও বহন করিতেছিল; যদিও তখন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ছিল প্রধানত শোষক-চক্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহাদের ধর্ম-প্রাধান্যের বিরোধ; এই শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে চাপা দিবার জন্য ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী পরবর্তী কালে যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করে পরে তাহা দেখিব, কিন্তু সে পদ্ধতিরও উদ্ভাবনা আরম্ভ হয়—এই বৈদিক যুগের শেষদিকে—মতাদর্শ বা ইডিয়লজির দিক হইতে পুনর্জন্ম ও কর্মবাদের আবিষ্কারে, আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে; বাস্তব ব্যবস্থার দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ-নীতিতে প্রয়োজন মত সংরক্ষণ-সংস্কারে, স্বীকারে, বর্জনে।

বৈদিক যুগেরই শেষ দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করে—আর্যাবর্তের এই নূতন সামাজিক কড়াকড়ি, বিশুদ্ধিতা, পশ্চিমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অধ্যুষিত আর্যদের নাই; আর প্রাচ্যের (মগধ-বিদেহের?) আর্যদের নিকটও এইসব অগ্রাহ্য। দুই দলকে বৈদিক ব্রাহ্মণশ্রেণী সংস্কারহীন বলিয়া হেয় করিতে চায়, সপ্ত-সিন্ধুর আর্যরা এইসব নূতন ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার জানেও না, মানেও না; প্রাচ্যের আর্যরা বেদই মানে না, তাহারা 'ব্রাত্য'। অথচ লক্ষণীয় এই, এই প্রাচ্যমণ্ডলেই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন বেশি; রাজারা আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন; এখানেই একটু পরে উদ্ভূত হন গৌতম বুদ্ধ ও জৈন মহাবীর। তাঁহারা ছাড়াও তাঁহাদের সমকালে এখানে তীর্থঙ্কর, আজীবক, অগ্নিউপাসক

প্রভৃতি নানা অবৈদিক সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না। আসলে বৈদিক আর্যরা যতই বিস্তৃত হইয়াছে ততই অ-বৈদিক আর্যদের অস্তিত্ব ও প্রভাব তাহাদেরও মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে—জীবনযাত্রায় কৃষিসমাজ স্থাপিত হইতেছে, বিনিময় ব্যবসা মহাজনী দেখা দিতেছে, রাষ্ট্রে, সমাজে পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাই একদিকে যখন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ধর্মসূত্র, গৃহ্য-সূত্র রচনা করিয়া সংরক্ষণশীল পুরোহিতরা বাড়াবাড়ি করিতেছে, অন্যদিকে তখনি 'আথর্বণ'দের স্বীকার করিতে হইতেছে, ব্রাত্যদেরও উদ্দেশ্যে প্রশস্তি রচনা চলিতেছে, একেবারে দেশজদের সাপের মন্ত্র, ঝাড়ফুঁকও, গোঁড়া পুরোহিত শ্রেণীর না হোক, বৈদিক সমাজের অন্যদের, গ্রাহ্য হইয়া পড়িতেছে। আর এই নানা অন্-আর্য দেব-দেবী, যোগ-তন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-ভাবনাই কি শুধু আসিয়াছে ?—সপ্তসিন্ধু দেশেও কি বিজিত 'হরপ্পা সভ্যতার' শেষ অধিকারীদের শিল্পকুশল, কৃষিকুশল ব্যবসায়ীরা সমাজে ঠাঁই পায় নাই ? মল্ল, লিচ্ছবী, বৃজ্জি, শাক্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্য জানপাদগুলি সবই কি বৈদিক বা অ-বৈদিক আর্যদের পুরাতন ট্রাইবল্ জনরাষ্ট্র ? না, ঐ সব রাষ্ট্রে আরও প্রাচীনতর অন্-আর্য জান-পাদগুলি নবকলেবর লাভ করে ?

বৈদিক যুগ সম্বন্ধে এই কয়টি সিদ্ধান্ত ও সমস্যাই তাই আমাদের স্মরণীয় : (১) বৈদিক আর্যসমাজেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। (২) কৃষির সুপ্রসার ও বিনিময়-বাণিজ্যের উদ্ভবে উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যায় ; (৩) শ্রেণীভেদ সুস্পষ্ট হয় ; শ্রেণী-বিরোধেরও সূচনা হয়। এমন কি, কৃষিজীবী ও কারুজীবীর দৈহিক শ্রমকে মস্তিষ্কজীবী শোষক শ্রেণী একটু একটু করিয়া হেয় জ্ঞান করিতেও শুরু করেন। (৪) জন-সত্তাক সংগঠন ভাঙিয়া ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র (রাজতন্ত্র ও অভিজাত গণতন্ত্র দুইই) দেখা দেয় ;—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভারতের সুদীর্ঘ সামন্ততন্ত্রী সমাজের উন্মেষ শুরু হয়। দেশজ নানা সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ট্রাইব্‌কে আর্যীভূত করিবার তাগিদ বাড়ে ; পুরোহিতদিদের উপরেই পড়ে তাহারও ভার। (৫) এই আলোড়নের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ৭০০ অব্দের পূর্বেই পুরাতন বৈদিক দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, অর্থাৎ বৈদিক আইডিয়োলজি বদলাইতে থাকে, যাজক পুরোহিতেরা শক্ত করিয়া যতই বেদের কর্মকাণ্ড বাঁধিতে লাগিল, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ততই তাহার গোড়া ধরিয়া টান দিল—'সত্য কি' ? বৈদিক আর্যসমাজ সম্ভবত অন্-আর্যদের পুনর্জন্মতত্ত্বকে কর্মবাদে

বিকশিত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা শুধু পরাবিদ্যাতেই ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, সেই leisure class idealism ছাড়া লোকায়ত মতও ছিল—যাহারা পৃথিবী-কেই স্বীকার করিত, আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতি যাহারা মানিত না (দ্রষ্টব্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন-দিগ্‌দর্শন, পৃঃ ৪৮৪); পরবর্তীকালে অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এবং ষড়দর্শনেরও সাংখ্যযোগ ও কণাদের মধ্যেও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-তন্ত্রের বা আস্তিক্যবাদের কতটুকু নিদর্শন আছে?

এই সিদ্ধান্তগুলি ছাড়া মোটামুটি বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ভারতীয় কৃষিজীবী, গ্রাম্যসমাজ ও সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়া ভারত ইতিহাসের ৩টি বৃহৎ জটিল সমস্যারও বীজ বপন করিয়া যায়: (১) এই কৃষিসমাজে ভূমিস্বত্ব কিরূপ ছিল? ইহা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের একটা মূল প্রশ্ন। (২) ভারতীয় জাতিভেদের স্বরূপ ও ইতিহাস কি? ভারতীয় সমাজতন্ত্রের একটা বড় প্রশ্ন। (৩) নানা শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেও কেন ভারতীয় সামন্ততন্ত্র টিকিয়া থাকিতে পারিল? ইহা ভারতের ইতিহাসেরই সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন।

এই সমস্যাগুলি পরবর্তী সমস্ত ভারত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নানাভাবে আবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে; আর ইহা বুঝিতে পারিলে ভারতের ইতিহাস ও ভারতের সংস্কৃতির রূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সমস্যাগুলির আলোচনা তাই সমস্ত ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়াই করিতে হইবে। তৎপূর্বে ভারতের এই কৃষিসভ্যতা বৈদিক আর্যদের নিকট যে দান লাভ করিল, যুগে যুগে যাহাদের নিকট যে দানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব স্মরণ করিতে পারি (দ্রষ্টব্য স্যর যদুনাথ সরকারের *India Through the Ages*, 1939)।

আর্য-সংস্কৃতির রূপ

আর্য কৃষিজীবীর পক্ষে এই দেশে বাস্তব জীবনযাত্রা স্বচ্ছল, সুস্থির ও সহজলভ্য হইয়াছিল, এইটিই এই দেশীয় আর্য-সংস্কৃতির একটি গোড়ার কথা। কিন্তু আজও সেই বাস্তব জীবনযাত্রা একেবারে অতীত বলিয়া মনে হয় না। সেদিনকার কৃষিসমাজের সেই বাস্তব উপকরণ বা জীবিকাপ্রণালী বলিতে গেলে আজও প্রায় ভারতীয় পল্লী-সভ্যতায় অব্যাহত রহিয়াছে—সেই সামান্য কাঠের লাঙল বলদের ব্যবস্থা, কৃষির তুচ্ছতম উপাদান, সেই মাটি ও খড়ের ঘর-দুয়ার, সেই মাটি ও ধাতুর বাসন-কোসন, সেই বাঁশ ও কাঠের

সামান্য তৈজস-পত্র। (দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত 'বৈদিক সমাজ—জীবনযাত্রা' ও *Life in Ancient India in the Age of the Mantvas*, P. T. Srinivasa Iyengar)। মূল উৎপাদন-শক্তিতে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে কি এই কৃষি-সভ্যতায় ? (ঋক্‌বেদের প্রাচীন মন্ত্রাদিতে আমরা যে আর্যদের সাক্ষাৎ লাভ করি, মনে হয় তাহারা প্রবল ও দুর্ধর্ষ মানুষ ; যুদ্ধজয় ও শত্রুনাশ তাহাদের প্রধান সাধনা ; জীবনের সুখভোগে তাহাদের পরম আগ্রহ ; খাদ্য, পানীয়, নৃত্য, ক্রীড়া—এই সবেই তাহাদের উৎসাহ—চিন্তা, ধ্যান, বৈরাগ্য তাহাদের ধর্ম নয়। তবু বৈদিক সমাজে চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়া সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থকে অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই এমন এক মানসিক প্রকর্ষের অবকাশ সৃষ্টি হইল—যাহার তুলনায় আজিকালিকার পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় বা পরবর্তী যুগের আমাদেরই মঠ বিদ্যাপীঠও বড় বলিয়া মনে হয়না। কিন্তু ইহা সম্ভব হইল যে বিশেষ কারণে তাহা আবার স্মরণীয়—নদীমাতৃক ভারতীয় প্রকৃতি কৃষিজীবীর প্রতি অকুণ্ঠিত স্নেহ পোষণ করেন ; নাতিশীতোষ্ণ ভারতীয় মণ্ডলের অধিবাসীরা পরিধেয়াদি সম্পর্কেও তাহার অযাচিত অনুগ্রহ লাভ করে। অর্থাৎ এখানে জীবন-যুদ্ধে মানুষের সহজেই জয় হয়। এই জয়ে তখন শাসক শ্রেণীর জুটিল বিশ্রাম, অবকাশ। উৎপাদন কর্ম হইতে, ক্রমে কায়িক শ্রম হইতেও দূরে থাকিয়া উচ্চ কোটির শাসক শ্রেণীর পক্ষে চিন্তায় ও কল্পনায় বাস্তবকে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ জুটিল। তাই এই অবকাশের সামাজিক মানসিক ফলগুলিও লক্ষ্য করিবার বস্তু : দৈনন্দিন জীবনে বিশ্রামের সুযোগে তাহাদের আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রায় অল্পকালের মধ্যেই বাহুল্য ও শৃঙ্খলা দেখা দিল। যথা, যজ্ঞাদিতে একদিকে যেমন দেবতা হইলেন মেঘরাজ ইন্দ্রাদি কৃষকের রক্ষাকর্তারা, অন্য দিকে বেদের যুগ শেষ না হইতেই বেদের কাণ্ডও বহুবিস্তৃত ও বহুবিভাগে বিভক্ত হইল। সেই পরবর্তীকালে আর্য সমাজের শৃঙ্খলাবোধ যেন আর তাল সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, লৌকিক ও দেশীয় চিন্তা ও অনুষ্ঠানকে যেমন ভাবে পারে স্বীকার করিয়া লইতেছে। শাসিত লোকশক্তিকে একেবারে অবজ্ঞা করা আর সম্ভব হয় নাই।

বাস্তব জীবনযাত্রার সুবিধা ও অবকাশ এবং আনুষ্ঠানিক ঐশ্বর্যের ফলে অবকাশ-ভোগী সমাজে দৈহিক শ্রমের ও বাস্তব চিন্তার অপেক্ষা বাস্তবাতীত এক মানসিক প্রক্রিয়া, ভাববাদিতার (subjectivity) প্রতি শ্রদ্ধা জাগে বেশি।

'ভাববাদিতা' অবসরভোগীর স্বাভাবিক ধর্ম। ইহাই হিন্দু 'আধ্যাত্মিকতায়' পরিণত হয়। অবসরভোগীদের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তিতে। 'বর্ণভেদের' বাস্তবক্ষেত্রে পর্যন্ত ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালেও যাস্কের (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ ?) নানাভাবে বেদ-বেদাঙ্গের ভাগ-বিভাগ, তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৪০০ ?) মত অপূর্ব ব্যাকরণ প্রণয়ণ, ইত্যাদি হইতে বুঝি চিন্তার ক্ষেত্রে আর্য মনীষীদের এই শৃঙ্খলা-বোধ অব্যাহত রহিয়াছে ; আর্যদের কাব্য বা কল্পনার প্রকাশে অনেক দিন পর্যন্ত (গুপ্তযুগেরও শেষে) এমনি এক সুসীমতা (symmetry and proportion)-বোধ অক্ষুণ্ণ ছিল (দ্রষ্টব্য *India Through The Ages*, J. N. Sarkar)।

এই দুইটি গুণই যতই দিন গিয়াছে ততই আর আর্য-সমাজের পক্ষে সংযতরূপে স্থির রাখা সম্ভব হয় নাই ; অবকাশের প্রাচুর্যে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, আনুষ্ঠানিক বাহুল্যে উহা সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। কায়িক শ্রম ক্রমেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে অপমানজনক হইয়া উঠিয়াছে, আর বস্তুবিমুখ চিন্তার প্রসার, ভাববাদ, একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন বাস্তব জীবনযাত্রা জীবিকার প্রাচুর্যে ততটা গৌণ হইয়া উঠে নাই, ততদিন ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনভাবে তাল হারাইয়া ফেলে নাই—discipline বা শৃঙ্খলা-বোধ, organisation বা কর্মশক্তি, অকুণ্ঠ জীবন-পিপাসা আপনাকে ততদিন আবেগ (emotion) বা কল্পনার (imagination) প্রবাহে চিন্তাক্লিষ্ট অন্তর্মুখিতায়—subjectivity'র মধ্যে—তলাইয়া দেয় নাই।

কিন্তু এই subjectivity'র, ভাবানুশীলনতার তরঙ্গ যে কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে, মানসলোকের আকাশগঙ্গায় বহিয়া চলাই যে স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে. বৈদিক যুগেই তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তত্ত্বানুসন্ধানীরা তখন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও প্রকৃতি-পূজা ছাড়িয়া আত্মচিন্তায় ডুবিয়া পড়িতেছেন। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা স্বদেশীয় অপেক্ষাও বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট এক অপূর্ব মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়া গত শতাব্দীতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সত্যই তাহা মানসিক তৎপরতার প্রমাণ। কিন্তু তথাপি ভুলিবার নয়, ইহার মধ্যে ঋক্ বেদের অকুণ্ঠ জীবন-স্বীকৃতি নাই, আছে একটা একান্ত আত্মমুখিতা—সেই দুর্ধর্ষ মন যেন উপনিষদে অনেক স্থলে 'sicklied o'er with the pale cast of

thought.' যাহা অমৃত নয় তাহাতে তাঁহাদের আর পিপাসা মিটিতেছে না। কারণ যাহা অমৃত তাহাই সত্য। জীবনের বাস্তব পিপাসা যতক্ষণ তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ মানুষ এই পরম পিপাসার কথা টের পায় না। ক্ষুধার্ত উদর বেদান্তের কথা ভাবিতে পারে না—স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অন্নব্রহ্মের কৃপা সহজলভ্য হইলে মানুষ প্রাণ ও মনোময় কোষ ছাড়াইয়া বিজ্ঞানময় কোষের দিকে মন দিতে পারে। অবশ্য ভাববাদীর সেই মানসিক ভাবনাও পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তী বাস্তব অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিয়মিত ও অনুরঞ্জিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক যুগের শেষ দিকেই ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হইল। হয়ত খণ্ড খণ্ড আর্য-অনার্য গোষ্ঠীগুলিও একীভূত হইতে তখন শুরু করিয়াছে—একই আর্য-শাসন জয়ী লইয়াছে। তাই বৈদিক দেবতাদের ছাড়াইয়াও এক-দেবতার কল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে। তাই তখন মানবীয় দেহের রূপকে সমাজদেহকেও সাজাইয়া লইতে তাহারা চেষ্টা করিল। এই মানবীয় চিন্তা এক অর্ধসত্য লইয়া তখন হইতে ব্যাকুল হয়। তাহা এই : সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত প্রকৃতি ইহাদের চক্ষে মনে হইয়াছে, স্থায়ী ও স্থির, চক্রাকারে চিরাবর্তিত। কিন্তু মানুষের আয়ু অল্প, সে মরণশীল, অমৃত নয়; তাহার জীবন-চক্র অস্থির, চঞ্চল, ক্ষণিক; অতএব নিত্য নয়, শাশ্বত নয়। আসলে জীবন কেন, প্রকৃতিও যে কত অস্থির ইহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতেও পারে নাই : আর মানুষও প্রকৃতিরই একটি প্রকাশ ইহাও তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অমৃতের পিপাসা তাই তাহার পক্ষে আর কিছুই নয়—জীবমাত্রেরই জৈবধর্ম সেই বাঁচিবারই সাধ। এবং শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ করিয়া Status quo অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজন। তাই তাহারা কেবলি অমৃতত্ব চাহিতেছিল, স্থিরতা খুঁজিতেছিল। ঘটনাপ্রবাহ ও গতিচঞ্চলতাই যে একমাত্র সত্য তাহারা তাহা বুঝিতেছিল না; ভাবিতেছিল, সত্য ইহার অতীত কিছু, যাহা স্থির, অচঞ্চল, স্থাণু। গতিময় বিশ্বের উপর স্থাণুত্ব আরোপ করিবার প্রয়াসেই দেখা দেয় আধ্যাত্মিকতাবোধ, মর মানুষে অমর আত্মার আরোপ, পরিবর্তমান প্রকৃতির কেন্দ্রে তেমনি এক বিশ্বাত্মার কল্পনা, আর সমস্ত চঞ্চল রূপকে গৌণ, এমন কি অসত্য ও মায়া বলিয়া পাশে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা। আসলে

এই "a static application of a dynamic truth" পূর্ববর্তী কালের মন্ত্র-তন্ত্রেরও মূল, যজ্ঞাদি ক্রিয়ারও মূল, পরবর্তী তত্ত্বচিন্তারও মূল (*cf. A Short History of Culture*, Lindsay, p. 40)। কিন্তু উদরজ্বালা যেখানে উগ্র সেখানে বাস্তবজীবনকে এমন মায়া বলিবার অবকাশ জোটে না—জীবিকার প্রচণ্ড দাবী চিন্তাকেও শাসনে রাখে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ

এই জীবন-বিমুখিতা বৈদিক যুগের পরে দেখি বুদ্ধদেবের চিন্তায়ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তত্ত্বচিন্তায় তিনিও পাগল হইয়া বাহির হইলেন। যে মতবাদ 'নির্বাণকেই' জীবন-জ্বালার চরম অবসান বলিয়া স্থাপন করিতে অগ্রসর, তাহার পক্ষে জীবনের প্রতি মমতা না থাকাই স্বাভাবিক। নির্বাণবাদও যেন উপনিষদের ব্রহ্মবাদের আর এক ধারা, উহা বস্তুবাদ নয়, তাহা স্পষ্ট। কর্মবাদ ও জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া উহা শুধু দর্শনে নয়, সমাজেও বিপ্লব-বিমুখী ভাববাদের প্রশ্রয় দিয়াছে। অবশ্য পার্থক্যও সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনো উত্তর দিলেন না, আত্মার অস্তিত্বও মানিলেন না; বরং তাই দেখিলেন সবই অনিত্য, সবই ক্ষণিক, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহও কিছুই নাই, 'বিচ্ছিন্ন প্রবাহ'ই চলিয়াছে (দ্রষ্টব্য, 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন', রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পৃ ৫১২)—জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া শুধু কর্মের জ্বলন্ত শিখা পুড়িতেছে—সমস্তই পুড়িয়া যায়, পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইলেই হইল নির্বাণ—জীবনে তাই চায় শুধু এই সত্যকে অঙ্গীকার—ক্ষমা, মুদিতা, মৈত্রী, উপেক্ষার অনুশীলন।

এইরূপ চিন্তার উপরে আধুনিক বাস্তব-বোধ আরোপ করা অবশ্যই ভুল; কারণ তাহা হইলে ঐতিহাসিক নিয়মধারাকেই অস্বীকার করা হইবে। কর্ম ও জন্মান্তর যেমন সেই প্রাচীনতর সামাজিক অবস্থার সম্ভাবনা ও ভাবনার পরিণতি, তেমনি বুদ্ধদেবের 'অনাত্মবাদ' ও 'ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা' হয়ত প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন 'সাংখ্যের' সহিত সংযুক্ত। বলা বাহুল্য, সাংখ্য খাঁটি বস্তুবাদ (Realism) নয়; ইহা পরিচিত ভাববাদও (Idealism) নয়। মানুষের মন প্রাচীনকালে যতটুকু বস্তুনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইত তাহারই এক পরিচয় বৈশেষিক দর্শনে (কণাদে) এবং অন্যতর পরিচয় সাংখ্যে দেখিতে পাই—কোনোটিই বস্তুবাদ নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতীয়

বস্তুবাদের দর্শন ছিল চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন। তাহার সামান্যই টিকিয়া আছে। যাহা টিকিয়া আছে তাহা কিন্তু সবল ও সরস। আর ইহা যে 'লোকায়ত' তাহা হইতে বুঝা যায়, অলস শ্রেণী যতই ভাববাদে বুঁদ হইতে চান, জনসমাজ বাস্তবকে ভুলিতে পারে না, এবং সমাজের ও ধর্মের চিরাগত প্রথা-নিয়মের সহিত তাহারা জীবন-যাত্রার পার্থক্য জানিত। তথাপি সাংখ্যতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বাস্তবনিষ্ঠাই কপিল ও গৌতম বুদ্ধকেও একেবারে পথ হারাইতে দেয় নাই বরং এই রূপে তাঁহাকে কতকটা জীবননিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

অন্যদিকে বৌদ্ধ মতবাদ কার্যত এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিল। সামাজিক জীবনের যাহা পরম প্রয়োজন, সহজ জীবনযাত্রার যাহা একমাত্র পাথেয়, বৌদ্ধধর্মের পথ তাহাই—ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি 'আর্য অষ্টমার্গ' এই পথ। উহাই 'মধ্যম পথ'—ইন্দ্রিয় লালসারও নয়, ইন্দ্রিয় সংহারেরও নয়, ইন্দ্রিয় সংযমের নিশ্চয়ই। ইহা এক সমন্বয়-সন্ধানী বস্তুনিষ্ঠ চেতনার আবিষ্কার—যে চেতনা সমাজের দাবীকে সশ্রদ্ধচিত্তেই গ্রহণ করিয়াছে,—বুঝিতেছে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এইভাবে একটা সুসঙ্গতি রাখা যায়; আর চিন্তার ক্ষেত্রেও একেবারে উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ ও লোকায়ত বস্তুবাদের মধ্যে এই সমন্বয় খুঁজিতেছে।

বুদ্ধদেবের সমস্ত মতবাদকে এই দৃষ্টিতে যাচাই করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, তখনকার সামাজিক পরিবেশে এই সংস্কারবাদী বৌদ্ধনীতির প্রয়োজন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। "বেদহীন" "জাতিহীন" মতবাদের পেছনে শ্রেণী-বিরোধ ছিল—তাহা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। মনে রাখা প্রয়োজন, বুদ্ধদেব জন্মিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; মরিয়াছিলেনও এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে সেকালের ধনাঢ্য বণিক এবং রাজা ও সম্রাটরাও অবশ্য ছিলেন। তিনি সমাজসাম্য চাহিবেন ইহা সম্ভব নয়: কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্যকেও পারিলে তিনি অস্বীকার করিতেন তাহাও স্পষ্ট—ইহা প্রমাণিত হয় তাঁহার বৌদ্ধসঙ্ঘের নিয়মাদি হইতে, গণতান্ত্রিক (অভিজাত) রাষ্ট্রগুলির প্রতি তাঁহার উদার উপদেশ হইতে (দ্রষ্টব্য দর্শন-দিগ্ দর্শন, পৃ ৫০৮)। তথাকথিত আর্য-অনার্য বা আসলে সেদিনকার নিম্নশ্রেণীর বিরোধের মুখপাত্র হইয়াছিলেন বোধ হয় সেদিনকার এই ক্ষত্রিয়েরা। সেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজে বুদ্ধদেব (১) এক কেন্দ্রাভিমুখী

সংগঠন, (২) এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থা এবং (৩) এক জীবননিষ্ঠ মানসিক নীতি বা বিনয় পরিপাটির (code of ethies) নির্দেশ দান করিলেন। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এক সমাজরক্ষী ধর্মরূপে উদিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে সমাজের জনগণের এক প্রতিষ্ঠান; কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জীবননিষ্ঠ মানুষের এক প্রতিরোধ। ক্ষত্রিয় শক্তি স্বভাবতই ইহাকে সমর্থন করিল, ইহাই বৌদ্ধধর্মের সামাজিক সার্থকতা। এবং ইহার বৈপ্লবিক ব্যর্থতা এই যে, বুদ্ধদেব ধনিক বণিকের উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছেন, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহেন নাই, আর শত সত্ত্বেও উহা সংস্কারবাদী।

প্রথম সামন্ত সাম্রাজ্য

জীবনের বাস্তব উপকরণে কতদূর পরিবর্তত তখন সাধিত হইয়াছে বলা কঠিন। কিন্তু 'জাতকের' কথাসমূহ এবং কোটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' যে স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সেই কৃষিযুগে গৃহশিল্পের প্রসার কম হয় নাই; অনাথপিণ্ডদের মত বণিকেরা বেশ প্রবল। পণ্যবণ্টন ও বিনিময় সূত্রে স্বার্থবহদল দেশদেশান্তরে চলিয়াছে আর বণিকগণ সমুদ্র পারাপার করিতেছে। ব্যবসায়ী সংঘ ও শিল্পী কারিগরের গিল্ড (ইহারই নাম ছিল 'শ্রেণী') গঠিত হইয়াছে। ছোট ছোট রাজ্যসীমা ইহাদেব উদ্যোগ বিস্তারের পক্ষে বাধা। রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহও লাগিয়া থাকে, বাণিজ্য ব্যাহত হয়; তাহা ছাড়া উদয়ন, প্রসেনজিৎ, প্রদ্যোত, বিম্বিসার প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে চলিয়াছে সংগ্রাম। রাজ্য-বিস্তারে তাঁহাদেরও আগ্রহ। কিন্তু অভিজাততন্ত্র রাষ্ট্রও (শাক্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি) রহিয়াছে, তাহাদের 'সংঘাগার'ও আছে। ইহারাও সংগ্রামে কুণ্ঠিত নয়। ইহারই মধ্যে 'একই কালে দুই পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুমার—সিদ্ধার্থ ও মহাবীর—বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন। তাঁহাদের দুইটি অপূর্ব মিল—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অবিশ্বাস তাহার একটি, অন্যটি তাঁহাদের প্রচারিত অহিংসাবাদ। ব্রাহ্মণ শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের অন্যান্য স্তরের যে বিদ্রোহ ধোঁয়াইতেছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ক্ষত্রিয় মনস্বীরা ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞের সেই আনুষ্ঠানিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি অসার প্রমাণিত করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে আরও ম্রিয়মাণ করিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা অবশ্যই অগ্রগামী ক্ষত্রিয়দল। অন্তত

মগধ বিদেহের মত প্রাচ্য দেশে ক্ষত্রিয়রাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণেরা নয়। তাঁহাদের একটি শক্তিকেন্দ্র ছিল অনাথপিণ্ডদের মত বণিকগণ আর তাহাদের সর্বশ্রেণীর অনুচরবৃন্দ। এই বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রথম ফলই এই :—(১) বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় শ্রেণীবিভক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডী অগ্রাহ্য করিয়া জন-সমাজের দাবী সেই যুগের মত কতকাংশে স্বীকার করিল। তাই বৌদ্ধধর্মে বর্ণ বা শ্রেণী ভেদ নাই। উহার বিনয় পরিপাটি (নীতি ও ধর্ম) সকলেরই পালনীয়, এবং তাই সহজবোধ্য। বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণীর প্রবেশের অধিকার রহিল। উহাতে একত্র হইয়া সামূহিক নির্ণয়ের নির্দেশ আছে। বৌদ্ধদের 'মহাসঙ্গীতি' এক বিপুল জনসমাবেশ নয় শুধু, এক বিশাল জনসভা। বৌদ্ধধর্মের প্রচারপদ্ধতিও তাই সরল হইল, সহজবোধ্য জনগণের ভাষায় সাধারণের কথাগল্পে রূপান্তরিত হইল (তুলনীয় খ্রীষ্টের পদ্ধতি)। (২) বৌদ্ধসংঘকে কেন্দ্র করিয়া এক কেন্দ্রাভিমুখী সমাজগঠনের আভাসও ইহার মধ্যে দেখা যায় (তুলনীয় রোমান্ ক্যাথোলিক চার্চ)। খণ্ড কলহপরায়ণ রাজন্যবর্গ ও নানাজাতি লইয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপনের যেই প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল ইহা যেন তাহারই অনুলিপি (দ্রষ্টব্য *India Through the Ages*, J. N. Sarcar)। মৌর্য সাম্রাজ্যের যে প্রাগ্-অশোকরূপ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মেগেস্থানিসের ভারত-বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে মৌর্য centralism বলিলেই ভালো হয়। ইহাতে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রথম কেন্দ্রিত সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা দেখা যায়। তাহার শিল্পযূথে 'শ্রেণী'-প্রবর্তন বর্তমান Corporate State'র একটি প্রাথমিক সংস্করণ। শূদ্র-জাত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পরে মৌর্য অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ সংগঠনীধারার এই দিকটি আরও পরিপুষ্টি লাভ করে! ইহা যেন Holy Roman Empireএরই এক প্রথম ভারতীয় রূপ। শূদ্র সম্রাটগণ স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-প্রয়াস ও বর্ণ-বিরোধী নীতিতে আকৃষ্ট হইবার কথা—ফলত বৌদ্ধধর্মের মত সেদিনকার শূদ্রস্থাপিত মৌর্য-সাম্রাজ্যও সেদিনকার সমাজ-দন্দ্বের সূচক। পরবর্তী কালে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের উত্থানে ব্রাহ্মণ পুষ্যামিত্রের অশ্বমেধে Orthcdox Counter-Revolution-এর সূচনা হয় (দ্রষ্টব্য *Manu and Yajuavaikya*, Jayaswal, p 40-48 এবং তৎসহ ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী)। আর, এই সময়েই সম্ভবত ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও রামায়ণ মহাভারতাদির প্রথম সংকলন আরম্ভ হয়; ব্রাহ্মণ্যবাদের নূতন করিয়া আত্মসংস্কার ও সংগঠন চলে। নিছক

সংরক্ষণশীল সামাজিক ও মানসিক প্রয়োগের বিচারে এই প্রয়াসকে তুচ্ছ করাও অসম্ভব।

কিন্তু আলেকজেণ্ডারের অভিযানকাল হইতেই হয়ত ভারতবর্ষ একরাষ্ট্রিক শাসনের প্রয়োজন বোধ করে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের শাসনে আপনার একত্ব সম্বন্ধে সে ক্রমশ সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। এমন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর জোটে নাই। (পরে গুপ্তযুগে হিন্দু তীর্থযাত্রার ও ধর্ম-পালনের নিয়ম হয়ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধটিকে দৃঢ় করিয়া দেয়)। কিন্তু বৌদ্ধ প্রেরণা ও এই বৌদ্ধ সংগঠনশক্তিই মৌর্যসাম্রাজ্যের সহায়তায় ভারতীয় ভৌগোলিক বন্ধনকে ছাড়াইয়া জলপথে ও স্থলপথে ভারতকে পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করে, তাহার সংস্কৃতিকে দেশে দেশে প্রসারিত করিয়া দেয় (দ্রষ্টব্য *Indian and Indonesian Art*, A. Coomarswami)। বৌদ্ধধর্মের একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ছিল। এই ধর্ম-বিজয়ে সেদিনকার বণিকসমাজেরও যে বাণিজ্য প্রসারের দুয়ার খুলিয়া গেল, তাহা নিঃসন্দেহ ;—অবলুপ্ত খোটানের পুথিপত্রে পর্যন্ত তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীর্তি

এই আভ্যন্তরীণ ঘটনা-প্রবাহে ও বাহিরের সম্পর্ক-সংঘর্ষে মিলিয়া ভারতীয় সমাজ যে নূতন ছাঁদে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহা বুদ্ধদেবেরও স্বপ্নাতীত ছিল। তাই কয়েক শত বৎসর পরে ভারতীয় সমাজ যখন পারশিক যবন, শকদের আগমনে জীবনে ও চিন্তায় জটিল হইয়া উঠিল, সেই জটিল বাস্তব পরিণতিতে বৌদ্ধ মতবাদেও কালক্রমে জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখা দিল। আলোড়িত ভারতীয় সমাজের চিত্র ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিবর্তমান রূপে লাভ করা যায়—ইহাদের ভারতীয়করণ বৌদ্ধধর্মের এক প্রধান কীর্তি। বুদ্ধদেব 'শাস্তা'র আসন হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিদাতার আসনে উঠিয়া গেলেন—ইহাতে বেদোপনিষদের বিরাট পুরুষ বা বৌদ্ধ ধর্মের স্থির জ্ঞানমার্গের পরিবর্তে মানুষ জীবন্ত কিছু পাইল। জনসেবকের এই পরিণতি তখনকার দিনে স্বাভাবিক। জনশ্রেণীর আশাকে যিনি সঞ্জীবিত করেন স্বভাবতই তিনি অপ্রাকৃত শক্তির অধিকারীরূপে কল্পিত হন, শীঘ্রই অবতারে পরিণত হন। বুদ্ধ-জারথুস্ত্র হইতে লেনিন পর্যন্ত Culture Hero'

দের এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নূতন মানবীয় আবেগ এক অভিনব পথে আবার প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহা বুদ্ধমূর্তি। ভারতীয় শিল্পের জন্ম হয় বৌদ্ধ অশোকের প্রেরণায়। সাঁচি, ভারহুত, অশোকস্তম্ভ আজ সুপরিচিত। আমাদের শিল্পের জাগরণ জাতকের কাহিনীতে চিত্রিত। দক্ষিণে অন্ধ্র রাজ্যের অমরাবতী ও নাগার্জুন কোণ্ডে ইহার সুরম্য দান একটু পরেই বিকশিত হইয়া উঠে। কয়েক শত বৎসর আবার তাহার বিকাশ উত্তরে গান্ধারে। ইহার কতটুকু প্রাচীনতর ধারার উদ্বোধন,—যে ধারা পূর্বেও নানা মূর্তি গড়িতেছিল . পশ্চিম-উত্তরে, দক্ষিণে, তক্ষশিলায়, ভিড়-এ, লৌড়িয়া নন্দগড়ে মৃত পূর্বপুরুষের সমাধিস্তূপ সাজাইতেছিল,—কতটুকুই বা এই মূর্তিপূজা য়ূনানীদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তাহা অনিশ্চিত। য়ুনানীরা তখন ঈরানে, গান্ধারে, কপিশায় অধ্যুষিত, ভারতেও নানাস্থানে পরাক্রান্ত। আর এদেশে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহারা তখন য়ূনানী ছাঁদে বুদ্ধকাহিনী রচনা করিতেছে কিংবা হেলিওডোরসের মত বিষ্ণুভক্ত হইয়া গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছে। গান্ধার শিল্পে তাহাদেরই প্রেরণা ও পদ্ধতি সবল। প্রথম দিকে এই উৎকীর্ণ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধের মূর্তি নাই, শুধু প্রতীক স্বরূপ অঙ্কিত হইত তাঁহার পদদ্বয়। তাহার পরে আর সে দ্বিধা রহিল না, নানা আসনে নানা রূপে ভগবান তথাগত আবির্ভূত হইলেন। ইহাতে কুশান যুগ হইতে আবার ভারতশিল্পের নবজন্ম হইল। মন্দিরে, মঠে, বিহারে, চৈত্যে, পর্বতে, গুহায় বৌদ্ধধর্ম শিল্পের জোয়ার ডাকিয়া আনিল। হিন্দু ও জৈনধর্মও তাহার দুকূলপ্লাবনী ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। (দ্রষ্টব্য *Civilisation in the East*, Vol II, Rene Grousset)। অন্য দিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কীর্তি তাহার দর্শন, তাহার ন্যায়শাস্ত্র। যবন (গ্রীক) দর্শনের সঙ্গে তাহার মুকাবিলা করিতে হয়। নাগসেন, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রী) এই ধারা বহিয়া যায়।

পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি

এই পরবর্তী বৌদ্ধধারাকে সহস্র গুণে প্রশস্ত করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হইল—আর পরেকার (খ্রীঃ ২০০-১,০০০) সাত-আটশত বৎসরে তাহা যেরূপ বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া একটা বিষম ও বিশৃঙ্খল রূপ লাভ

করিল, তাহাতে তাহাকে আর বৌদ্ধ ধর্ম না বলিলেও চলে। তাহার ফলে পুরাতন হিন্দুধর্ম ও তাহার কঠিন জাতিবন্ধনই আবার মানুষের চেতনায় সমাজ-শৃঙ্খলার ও সমাজ-সংগঠনের একমাত্র পথ বলিয়া প্রতিভাত হইল। উহাতে আহারে বিহারে, বিবাহে ক্রিয়াকর্ম ও শুচিতা প্রাধান্য পায়। খ্রীষ্টীয় ১ম ২য় শতাব্দেও শক ও তুরানী গোষ্ঠী রাজন্য-শক্তিরূপে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৈষ্ণব বা শৈব হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-নীতির আশ্রয় লইতেছিল। সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা পাইল গুপ্তযুগে আসিয়া। তখনো বৌদ্ধ শিল্প বৌদ্ধ দর্শন কিছুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। কিন্তু ইহার পরবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের শেষে হর্ষবর্ধন যতই বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রসারে উদ্যোগী হউন, বুঝা যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ব কালের অধিকাংশ শক্তিই হারাইয়া ফেলিতেছে—নানা উদ্ভট শৃঙ্খলাহীন 'বাদে', বৌদ্ধ চিন্তা ও জীবনযাত্রা তলাইয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ-চিন্তার সেই ক্রমবসান যে বাস্তব ও সামাজিক দুর্যোগের সূচক তাহার সম্পূর্ণ হিসাব নাই, কিন্তু পরবর্তী কারণগুলি হইতে তাহা অনুমান করা চলে। যেমন (১) বৌদ্ধ সংঘগুলির বিপুল প্রভাবে দেশের রাষ্ট্রশক্তি নির্জিত হইয়া পড়িতেছিল; আর দেশের জনশক্তিও সেই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞেয় ও শোষণেরই বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ এই বৌদ্ধ সংঘের তখন কোনো সামাজিক দায়িত্ব নাই, এমন কি আত্মরক্ষারও শক্তি নাই। (২) গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষে তরঙ্গের পর তরঙ্গে যে শক হূন ভারতবর্ষের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা সেই ধর্মের মধ্যে নিজেদের জীবন-যাত্রা, ধারা-ভাবনা মিশাইয়া দিল, বৌদ্ধ সমাজেরও তেমনি শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। হয়ত বাস্তব জীবনযাত্রায়ও সেই যাযাবরেরা ছিল নিম্নস্তরের। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি আর একবার বাহিরের আঘাতে পর্যুদস্ত হইল। (৩) বৌদ্ধ-সংঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার থাকাতে নারীর প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছিল। নূতন করিয়া তাই আবার নারী 'শক্তি'রূপে আবিষ্কৃতা হইলেন; মনে পড়িল মানুষের জীবধাত্রী প্রকৃতির প্রতীক নারীই। সমকালবর্তী হিন্দুরাও এই আবিষ্কারকে অঙ্গীভূত করিয়া লইতে দেরী করিল না। কিন্তু যেখানে জীবনযাত্রায় নারী গৌণ সেখানে এই মিথ্যা নারী-প্রাধান্য মিথ্যাচারেরই কারণ হইতে বাধ্য। বিশেষত মঠে ও সংঘে যেথা নেএই ভিক্ষুক-ভিক্ষুণীদের দায়িত্ব রহিল না কিছুই, কিন্তু হাতে

রহিল অগাধ ধনৈশ্বর্য সেখানে বিকৃতি অনিবার্য হইয়া উঠিবারই কথা। অবস্থাটা প্রায় 'হলিউডের'ই একটা পূর্বাভাস—আধুনিক পাশ্চাত্য ধনিক-সমাজের একটা প্রাচীন সংস্করণ। (৪) অথচ এই বিস্তৃত কালের মধ্যে কৃষি-সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ঘটিয়াছে, জন-সংখ্যা বাড়িয়াছে, যানবাহনের প্রসার ঘটিতেছে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় তথাপি তাহার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি সম্ভব হইতেছে না। এমন কি, যে অখণ্ড একরাষ্ট্র মৌর্যরা গঠন করিতেছিল বাহিরের আক্রমণে তাহাতেও বাধা পড়িল। মিন্দোর, কনিষ্কের মত সম্রাটরা মধ্য এশিয়ার দিকে ভারতীয় বণিকের ও ধর্ম-প্রচারকের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য প্রসারে কতটা সহায়ক হইতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। এক সময়ে জলপথে ও স্থলপথে এই বাণিজ্যগতির পক্ষে বৌদ্ধ যুগ সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু শেষ দিকে শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের ধনৈশ্বর্য ভিক্ষুদের লুব্ধ মুষ্টি এড়াইবারই হয়ত পথ খুঁজিতেছিল (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের মেয়ে" গ্রন্থে বাংলা দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর চিত্র দ্রষ্টব্য); হিন্দু সমাজের সংযত ব্রাহ্মণ-শাসন তখন তাহার আশ্রয়স্থল হইল। ব্রাহ্মণ্যবাদী এই বৈশ্য সম্রাটদের নিকটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিল, সমাজের এই বাস্তব ও জাগ্রত শক্তিচয় বাধা পাইল না; সেখানেই তাই ভারতীয় সমাজের চরম প্রকাশ ফুটিয়া উঠিল। এই পরিবেশ একটিবার মাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনে ঘটিয়াছে; তখনো বৌদ্ধ মহাযান যুগেরই মধ্যাহ্নকাল। মনে হয় গুপ্ত সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্মকেও প্রসারের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিতেন—বৌদ্ধ শিল্পকলা ভারতবর্ষে তাঁহাদেরই আমলে চরম সৃষ্টিতে সার্থক হয়। কিন্তু এই পরিবেশ সৃষ্টি করিল, সমাজে চিন্তায় এই শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিল, সাহিত্যকলায় তাহার সহস্রদল ছড়াইয়া দিল—কোনো পরম-সৌগত বৌদ্ধ সম্রাট নয়। মগধের পরম-ভাগবত গুপ্ত সম্রাটরা ভারতবর্ষকে তাঁহারা আর একবার ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির তখনি এক সুদীর্ঘ উৎসব গিয়াছে—যতদিন সেই শান্তি, সেই শৃঙ্খলা, সেই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় হূনদের আক্রমণে একেবারে ভাঙ্গিয়া না পড়িল, ততদিন ভারতীয় কৃষি-সংস্কৃতির এক বিকাশ-বৈভবের যুগ ছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের কীর্তি

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান দান—হিন্দুসংস্কৃতি। তখনি নূতন করিয়া ভাষা ও সমাজ গঠিত হইতে লাগিল—পুরাণ গ্রথিত হইল, পৌরাণিক হিন্দু সমাজের পত্তন হইল। শিল্প ও ভাস্কর্যের সে এক স্বর্ণযুগ। অজন্তার ১৬ ও ১৭নং গুহা, সারনাথ, দেওঘর, ভিতরগাঁও প্রভৃতির মূর্তি ভারতবর্ষের চিরন্তন গৌরব। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, নালন্দার তাম্রনির্মিত সুবৃহৎ (৮০ ফিটের) বুদ্ধমূর্তি, এবং সর্বোপরি দিল্লীর লৌহস্তম্ভ গুপ্তযুগের কারুশিল্পের যে বাস্তব প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে, তাহাও তেমনি বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে এই লৌহ ঢালাই ও তাম্র ঢালাইর প্রক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া পড়ে। মানুষের সেদিনকার সভ্যতা যে কত গণ্ডীবদ্ধ ও স্বল্পায়ু ছিল প্রসঙ্গত উহা তাহারও এক প্রমাণ। কিন্তু গুপ্তযুগ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে কত অগ্রসর হইয়াছে, শুধু এই লৌহ স্তম্ভাদি হইতেই যে তাহা বুঝা যায় এমন নয়। আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তাদি তখন গণিত ও জ্যোতিষের কঠিন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন। মহাকবি কালিদাস কাব্য লিখিতেছেন; শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক অভিনীত হইতেছে; কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্ধন যবদ্বীপকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া নানকিং-এ দেহলীলা শেষ করিতেছেন। ফা-হিয়েন দেখিয়া গেলেন সুসমৃদ্ধ, শান্তিময়, সুসভ্য জাতির দেশ—যেখানে চৌর্য প্রায় নাই, মদ্যমাংস প্রায় বর্জিত হইয়াছে, বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ দুইই সমমর্যাদায় বাস করে—বৌদ্ধ বসুবন্ধু পরম-ভাগবত সমুদ্রগুপ্তেরও সুহৃদ।

গুপ্তযুগ শেষ হইল বাহিরের আঘাতে। বর্বর হূনের দল প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ও তাহার শাসকশ্রেণীকে নিঃশেষ করিল, কিন্তু নূতন কিছুই স্থাপন করিতে পারিল না। সমাজ-শক্তি আর অখণ্ড রাষ্ট্রকেন্দ্র লাভ করিতে পারিল না—হর্ষবর্ধনের পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে নানা বিরোধী ধারার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরিবর্তিত হইয়া চলিল—পরিবর্ধিত হইতে পারিল না। (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী। সাম্রাজ্যগঠনের চেষ্টা শেষ হইলে খণ্ড খণ্ড 'কৌমী রাজতন্ত্র' বা 'সামন্ততন্ত্রের' দিন আসিল। বারে বারে এই সাম্রাজ্য সংগঠনের ব্যর্থতার ফলেই ভারতবাসী এক রাষ্ট্রজাতি বা 'নেশন' হইবার সুবিধা পায় নাই, বহুজাতিক দেশ ও সমাজ হইয়া রহিয়াছে। 'অখণ্ড ভারত' চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্ন—অতীতে

তাহা সফল হইলে এযুগে আমরা ভারতবাসী 'অখণ্ড ভারতীয় নেশন' হইয়া উঠিতে পারিতাম। তাহা হয় নাই—এখন যাহা সম্ভব তাহা এই—বহু-জাতিক রাষ্ট্র সংগঠন—বহু জাতি লইয়া মহাজাতি গড়া)। সেই ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে এখানে ওখানে জীবনের প্রয়াস না ছিল তাহা নয়—তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার চলিল, চীনে কাশ্মীরের দূত গেল, বাঙলায় পাল-সাম্রাজ্য এক নূতন তেজে জ্বলিয়া উঠিল; সমস্ত উত্তরাপথে শকবংশীয় নরপতিরা রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজে উন্নীত হইলেন, নানা রাজবংশ নানা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন করিলেন, তাহাদের প্রসাদে সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি সেই সব রাষ্ট্রগণ্ডীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেও লাগিল। কিন্তু সেই জাতীয় সমাজ ও তাহার বহুখণ্ডিত রাজশক্তি আর বাহিরের একটি আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি পাইল না। হিন্দুযুগ শেষ হইল—সংস্কৃতির এক পর্বান্ত হইল।

"হিন্দু সংস্কৃতি" বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহার বিকাশ এই গুপ্ত-সম্রাটদের সময়ে—তাহার অবসান এখনো হয় নাই। কারণ শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতির যুগ পার হইয়া বিবেকানন্দ অরবিন্দের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, এমন কি, হিন্দু মহাসভার প্রয়াসেও তাহার সেই নবায়মান প্রকৃতির নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির সুপ্রভাত সেই গুপ্তযুগ—উহার সামাজিক মানসিক পরিবেশ এক নূতন অভ্যুদয়ের পরিচয় বহন করে। তাহারও পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত যে জীবনযাত্রা চলিয়াছিল তাহাও প্রধানত কৃষিমূলক; শিল্পের ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভাব নাই; মুদ্রারও প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এত বড় দীর্ঘ যুগেও রোম সাম্রাজ্যের মত, 'money community' বা 'কাঞ্চনকৌলিন্য' ভারত-সংস্কৃতিতে কোনো কালেই স্থাপিত হয় নাই। শ্রেষ্ঠী অপেক্ষা গুপ্তরাজ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব ছিল বেশী। অপর দিকে হয়ত এত দিনকার বৌদ্ধ প্রভাবে মদ্য মাংসাদি তখন হইতেই অশাস্ত্রীয় হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত রাজাদের ভাষা হইয়াছে। পুরাণ ও শাস্ত্র নূতন করিয়া প্রাকৃতজনদের জীবনকে সুসংস্কৃত করিতেছে। মোটের উপর গুপ্তযুগ যেন এক সদাচারের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, অভিজাত শ্রেণীর পুনর্জাগরণ। এই বিষয়েই এই যুগের হিন্দু সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ বা তৎপরবর্তী অন্যান্য ভারতীয় প্রয়াস ও চিন্তার পার্থক্য মনে পড়ে—যেমন, নাথ সম্প্রদায়ের, সহজিয়াদের, চৈতন্য, নানক,

কবীর প্রভৃতির। সাধারণ মানুষও তাহার নানা সহজ সংস্কার ও প্রথাকে স্বীকার করিয়া লয়, পৌরাণিক হিন্দু-সংস্কৃতি শৃঙ্খলা, সংযম প্রভৃতি অভিজাত গুণাবলীকে বড় করিয়া দেখে। এই সংস্কৃতির আদর্শে এক আভিজাত্য আছে। এই আভিজাত্য সূচিত হয় কয়টি মানসিক দানে,—প্রথমত আত্মসংযমে, দ্বিতীয়ত অহিংসায়, তৃতীয়ত পরমতসহিষ্ণুতায়, চতুর্থত সত্যানুসন্ধিৎসায়। সমগ্র হিন্দু-সংস্কৃতির মেরুদণ্ড এই আভিজাত্যচেতনা; উহা বর্ণাশ্রম ধর্মেরও ভিত্তি। বারে বারে ভারতবর্ষের পক্ষে অতি বৃহৎ বর্বর আক্রমণের উচ্ছৃঙ্খলার শেষে এই আত্মসংযত, নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাত্রার ও চিন্তাধারার বড় প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই আক্রমণে, মাৎস্যন্যায়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর দুর্ভাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বণিক শ্রেণীর ধন ও ব্যবসা বিনষ্ট হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীও এই ব্রাহ্মণ্যবাদী আভিজাত্য শাসন তাই তখন প্রায় স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইয়াছে—মনে মনে বুঝিয়াছে, এই শৃঙ্খলা স্বীকারেই তাহার আপন স্বার্থকতা। মোটের উপর ইহাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম—'ব্রাহ্মণিক কাল্‌চার।' গুপ্ত সম্রাটদের সময় হইতে ইহাই এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

মনে রাখা দরকার, পূর্বাপর হিন্দু-সংস্কৃতির বনিয়াদ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। শ্রেণী-ভেদ সেই বৈদিক সমাজেরও চিন্তায় ভাবনায় তাহার দুস্তর ছাপ রাখিয়া যাইতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি। 'জন্মান্তরবাদ' ও 'কর্মবাদ' এই পৃথিবীর বঞ্চিতদের প্রবোধ দিবার ও সান্ত্বনা পাইবার মত এক অদ্ভুত জিনিস। 'পরলোক', 'তত্ত্বমসি'ও সেদিকে বেশ কার্যকরী হয়। পরবর্তী হিন্দু-সংস্কৃতি এই শ্রেণী-বৈষম্যের বনিয়াদকে পাকা করিয়া লইয়াছে 'অধিকার-ভেদ' নামক নীতি সুপ্রচলিত করিয়া—বঞ্চিতের পক্ষে এমন আত্মহত্যার নীতি আর নাই। হিন্দুর সমস্ত দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এই বৈষম্যবাদের দ্বারা জর্জরিত। দেখিতে পাই এই হিন্দু-সংস্কৃতির চক্ষে সমাজের উৎপাদক-শ্রেণীর স্থান কত নিম্নে—তাহারা রহিল শূদ্র ও অন্ত্যজ হইয়া; মানুষের অধিকার হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হইয়া রহিল। তেমনি বঞ্চিত রহিল স্ত্রীজাতি। হিন্দু সমাজের পরমতসহিষ্ণুতার অর্থ তাহা হইলে এই—এই সমাজের জনগণের অর্থাৎ অধিকাংশের মন ও মতের একেবারে ধ্বংস সাধন। তাহার অহিংসার অর্থ—গো-ব্রাহ্মণেরই রক্ষা। এবং সত্যানুসন্ধিৎসা এক অসাধারণ মানসক্রিয়া—পৃথিবীর রূপ রস স্পর্শ গন্ধকে তাহার বলে সে

তত্ত্ব হিসাবে উড়াইয়া দেয়, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার তিলার্ধও তাই বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে না। আর হিন্দুর সংযমনিরত সাত্ত্বিক জীবনযাত্রার অর্থ দাঁড়ায় শুধু অসংখ্য স্মৃতির অনুশাসন, শেষ পর্যন্ত পঞ্জিকা ও বিধি-নিষেধ। আর এই কথা মনে করিবার কোনো কারণ নাই যে, ইহা শুধু আজিকার (বা মুসলমান আমলের) 'পতনে'র জন্যই ঘটিয়াছে—পূর্বাপর হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজ যে বনিয়াদকে অটুট রাখিতে চাহিয়াছে তাহাতেই এই পতন অবশ্যম্ভাবী হইতে বাধ্য।

তবে মানিতে হইবে, এই হিসাবে গুপ্তরা একান্তভাবে প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী ছিলেন না; তখনকার মত গুপ্ত সম্রাটদের ভূমিকা ছিল সাময়িক প্রগতি বাহকের—প্রকৃতিপুঞ্জের আদর্শ-স্থানীয়, বণিক ও শিল্পীর প্রিয়, রাষ্ট্র ও সমাজে একটা শান্তি ও সুস্থিরতার প্রতিষ্ঠাতা—সমগ্র ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপয়িতা। তাই না গুপ্তযুগে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন সকলের সৃষ্টি এমন উৎসারিত হইয়া উঠে, এবং অব্যাহতভাবে বহির্ভারতেও ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ দেখি। গুপ্তযুগের প্রতিক্রিয়ার দিকটি তখনো ভারতের সমাজ-জীবনে প্রকট হয় নাই। পরে তাহা ক্রমেই প্রকট হইল। এই প্রতিক্রিয়ার দিকই নিহিত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণাশ্রমের বজ্রবন্ধন রচনায়, বর্তমান (পুরাণগুলি তখন শেষবারের মত গ্রথিত হয়) পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠায়—সমুদ্রযাত্রা নিষেধে, জাতিভেদ ও আচার, স্পর্শদোষ প্রভৃতি হাজার ব্যবস্থায়।

গুপ্তরা নিজেদের জাতির কথা উল্লেখ করেন নাই—সম্ভবত তাঁহারা ছিলেন বৈশ্য। কিংবা আরো নীচেকার শূদ্র। লিচ্ছবী দুহিতাকে বিবাহ করায় হয়ত তাঁহারা শক্তিলাভ করেন; পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় সমাজের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারিলেন। পূর্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্য ও রাজাদের অত্যাচার হইতে বণিক ও সাধারণ শিল্পীদের মুক্তি দিয়া তাঁহারা হয়ত (সিজার অগষ্টাসের মত, কিংবা ইংলণ্ডের টিউডর রাজাদের মত ?) সত্যই সেকালের 'শ্রেণী'-সমৃদ্ধ বণিক্ ও শিল্পীদেরও অন্য দিকে পরম পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন ('রঘুবংশ' যদি গুপ্তবংশের প্রতিলিপি বহন করে)।

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সংস্কৃতির মতোই এই সংস্কৃতি শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের ও অগণিত জনগণের দেহ-মন-প্রাণের সুদীর্ঘ

দাসত্বের পরিচায়ক।[১] কিন্তু সেই জনসমাজ, শূদ্র ও চণ্ডালের দল, এই জীবনই মাথা পাতিয়া লইয়াছিল,—এখনো লয়, যতদিন পর্যন্ত সেই মূল কৃষি-সমাজের পরিবর্তন না হইবে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব কার্যকরী না হইবে, ততদিন লইবেও।

কিন্তু বর্ণ-আভিজাত্য যেখানে একালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ধ্বংস হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে নূতন ধনাভিজাত্য চাপিয়া বসিতে লাগিল, সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বা ক্ষাত্রধর্মের কোনো আত্মসংযম ও আত্মোৎসর্গের চিহ্নও আর নাই। শুধু ধনাভিজাত্যের স্বার্থপরতা ও বিলাসবাহুল্যই উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও তাই বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে, অথচ এতদিনকার বাধ্যতার অভ্যাসে হিন্দু নিম্নবর্গের শোষিতদের সে বিদ্রোহ আজও উগ্র হয় নাই।

---

১ "We must not forget that these idyllic village communities, inoffensive though they may appear, had always been the solid foundation of Oriental despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies. We must not forget the barbarian egotism which, concentrating on some miserable patch of land, had quietly witnessed the ruin of empires, the perpetration of unspeakable cruelties, the massacre of the population of large towns with no other consideration bestowed upon them than on natural events, itself the helpless prey of any aggressor who deigned to notice it at all. We must not forget that this undignified, stagnatory, and vegetative life, that this passive sort of existence evoked on the other part, in contradistinction, wild, aimless, unbounded forces of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindustan. We must not forget that these little communities were contaminated by distinctions of caste and by slavery, that they subjugated man to external circumstances, that they transformed a self-developing social state into never changing natural destiny, and thus brought about a brutalising worship of nature, exhibiting its degradation in the fact that man, the sovereign of nature, fell down on his knees in adoration of Hanuman, the monkey, and Sabbata the cow." New York Daily Tribune, June 25, 1853. —KARL MARX.

প্রাচীন ভারতের আর্থিক বনিয়াদ

আড়াই হাজার দুই হাজার বৎসরে (আনুমানিক ১,০০০-১,৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে খ্রীষ্টীয় ১,২০৩-এ মুসলিম বিজয় পর্যন্ত) প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা একটি বিশেষ আর্থিক বনিয়াদেরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কথা আবার মনে করা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় কেন, ভৌগোলিক পরিবেশও একরূপ নয়, এবং সর্বকালেও একই অবস্থা কোথাও অব্যাহত থাকে নাই—জীবনযাত্রা একই বনিয়াদে গড়িয়া উঠিলেও দেশে ও কালে মিলিয়া ইহারও মধ্যে তাহার অনেক রকমফের দেখা দিয়াছে; ঐক্য সত্ত্বেও তাহাতে অসামান্য বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে। এই বৈচিত্র্যের জন্য এবং স্থায়ী রাষ্ট্রীয় বন্ধনের অভাবে প্রাচীন ভারত "এক-জাতীয়তার" দিকে তখনো অগ্রসর হইতে পারে নাই, তবে ভবিষ্যতের "বহুজাতিক মহাজাতির" উপযোগী উপাদান রচনা করিয়া গিয়াছে,—কারণ, এই দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসরে তাহার সর্বকেন্দ্রের জীবনযাত্রায় একটা মূলগত মিল ছিল, তাহার সংস্কৃতিরও একটা মূলগত ঐক্য রহিয়া গিয়াছে—পরবর্তী কালেও তাহা অটুট রহিয়াছে। তাহাই ভারতীয় মহাজাতির প্রাচীনতম ভিত্তি।

জীবন-যাত্রার এই মিলের কারণ, ভারতীয় সমাজ পূর্বাপর কৃষিকর্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য সমাজেরই প্রধান আশ্রয় থাকে কৃষি। কৃষি-সম্পর্কিত শিল্পেরও সেই অবস্থায় জন্ম হয়—কিন্তু শিল্পীর স্থান সেখানে গৌণ। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এই কৃষি-সভ্যতারও একটা বিশিষ্ট রূপ বিকশিত হয়, তাহাই বুঝিবার মত। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রীয় নানা প্রভাব ছাড়াও যে-দুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে কৃষি-সমাজের বিকাশ এখানে প্রভাবিত হয় তাহার একটি ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা, অন্যটি ভারতীয় "জাতি"-ব্যবস্থা। দুইটিই পরস্পর সম্পর্কিত; দুইটিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দুই জটিল প্রশ্ন, এবং কোনোটিরই বিষয়ে আজও ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ সকল প্রশ্নে একমত নন, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। অথচ, ভারতবর্ষের কৃষি-সভ্যতার বা ভারতের সামন্ততন্ত্রের বিশেষ রূপটি এই আর্থিক বিন্যাস ও সামাজিক বিধি-নিষেধের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থা *

কৃষি-সমাজের প্রধান কথা হইল ভূমি-ব্যবস্থা--যাহারা প্রকৃত কৃষক, মূল উৎপাদক (primary producer), জমিতে তাহাদের স্বত্ব কি ধরণের, অন্যান্যরাই বা জমিতে কি স্বত্ব ভোগ করে ?

বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই এই ভূমি-স্বত্ব ও ভূমি-সম্পর্কের রদ-বদল হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটি কয়েকটি সাধারণ রূপ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া যায়। যথা, (১) গ্রামের জমি প্রথমত গ্রামের দশজনেই (সভা, পঞ্চায়েত, পল্লীসমাজ) বিলি ব্যবস্থা করিত। (২) জমির বণ্টন হইত পরিবার ('কুল' বা 'গৃহ') হিসাবে। পরিবারই সমগ্রভাবে তাহাদের জমি চাষ করিত, নিজেদের হালবলদ, বীজধান তাহাদের ছিল,—সমগ্রভাবে পরিবার হইত তাহাদের উৎপন্ন শস্যের অধিকারী। অবশ্য গ্রামের কিছু কিছু সাধারণ জমি, সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রভৃতিও থাকিত। কিন্তু মোটের উপর জমি পরিবার বা ব্যক্তির সম্পত্তি। (৩) উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ 'রাজস্ব' হিসাবে প্রজার বা কৃষকের রাজাকে দিতে হইত। মুদ্রায় নয়, 'রাজস্ব' দিতে হইত দ্রব্যজাতে। রাজস্ব না দিলে 'অবশ্য' ভূমি হারাইতে হইত। এইখানেই প্রশ্ন—রাজস্ব কি অধিকারে রাজা আদায় করিত ? প্রজাপালক ও রাজ্যরক্ষক বলিয়া ? না সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক বলিয়া ? অর্থাৎ ইহা কি ট্যাক্স্, না, রেণ্ট ? জমির উপর কৃষকের অধিকারই বা কি ? এই প্রশ্নে ভারতীয় পণ্ডিতদের মতভেদের অন্ত নাই।

মেন্ প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতদের অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় গবেষকগণ অধিকাংশেই পল্লী-সমাজ (ভিলেজ কমিউনিটিকে) গ্রামের জমির মূল মালিক ও কৃষককে (বা কৃষক পরিবারকে) জমিতে স্বত্বাধিকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে—ভারতীয় কৃষক এই স্বত্বস্বামিত্ব হারায় বিদেশীয় বিজেতাদের আমলে—অর্থাৎ মুসলমানদের সময়ে, বিশেষত ইংরেজ রাজত্বে। এই বিষয়ে প্রমাণপত্র তুচ্ছ নয়। সত্যই মনু

*'ভূমি-ব্যবস্থা' 'জাতিভেদ' প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের Studies in Indian Social Polity, 1944, Calcutta, দ্রষ্টব্য। যথাসম্ভব ঐ গ্রন্থে ও রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থাদিতে মূল শাস্ত্র, পুরালিপি প্রভৃতির বিচার আছে, এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(খ্রীঃ পূঃ ২০০এর দিকে), জৈমিনি (খ্রীঃ ২০০এর দিকে) ও সায়নাচার্য (খ্রীষ্টীয় ১৩০০'র দিকে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে) প্রজাকেই ভূমির মালিক বলিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশনের নিকটে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই সব প্রমাণ বিশদ ভাবেই উপস্থিত করেন। ইহাও ঠিক, মুসলমান রাজগণ বিজেতা হিসাবে সমস্ত দেশের মালিক বলিয়া নিজেদের গণ্য করিতেন, ইরানের নিয়ম ও ধারণানুযায়ী ঐরূপ ব্যবস্থাও প্রচলন করিতে থাকেন, প্রজার অধিকার ক্রমশ তাহাতে খর্ব হয়। —ইহাও ঠিক, ইংরেজ পণ্ডিতেরা (ফ্লাউড কমিশন পর্যন্ত) ভারতবর্ষে বরাবরই 'রাজা জমির মালিক' এই মত প্রচার করিতেন। কিন্তু বিদেশী ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে দেশী সাধারণ কৃষকের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও আমাদের জাতীয় স্বার্থ-বাদী গবেষণার যে একটা ঝোঁক আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। (এই 'জাতীয়তাবাদী' পণ্ডিতগণ এখন আবার কংগ্রেসী রাজের আমলে কৃষককে জমিতে অধিকার না দিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপের নামে নূতন করিয়া 'রাষ্ট্রাধিকৃত জমিদারী প্রথার' পুনর্গঠনের পক্ষপাতী হইবে কি?) কিন্তু রাজাই যে জমির মালিক ছিল মেগেস্থানিস প্রমুখ গ্রীক ও কৌটিল্য প্রমুখদের কথা এই বিষয়ে প্রামাণ্য। এই দিকেও এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ উপস্থিত করেন। ভারতবর্ষে প্রজাদের ভূ-সম্পত্তিতে কোনো স্বামিত্ব বা মালিকানা (প্রাইভেট রাইট্স্ ইন্ ল্যাণ্ড) ছিল না, ইহা মার্কস্এর অভিমত। মার্কস্ ভালো করিয়াই জানিতেন, "প্রাচ্য" বা 'এশিয়াটিক সমাজে' পল্লী-সমাজ বা ভিলেজ কমিউনিটির আয়ু কম ছিল না। ঐতিহাসিকরা আরও দেখেন, সর্বকালে সর্বত্র প্রজা ভূমি দান-বিক্রয়ও করিতেছে। তাই মনে হইতে পারে, প্রজাই জমির মালিক। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকদের যে সব প্রমাণপত্র মার্কসের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতেই তাঁহাকে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে মত গঠন করিতে হয়। তাই এই সব প্রশ্নে তাঁহার ভুল ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু ভুল মার্কসের ঘটে নাই। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মৌর্য যুগ হইতে বিজয়নগর সম্রাটদের কাল পর্যন্ত বহু শিলালিপি ও তাম্রলিপি বিচার করিয়া এই সুস্থির সিদ্ধান্তেই পৌঁছেন (দ্রষ্টব্য *Studies in Indian Social Polity*, Chapter xv)। মার্কসের কথা ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেই তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার হইয়া উঠে। (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : *The Modern*

Quarterely, Summer, 1948এ জন মরিস্ লিখিত *Slaves and Serfs* নামক প্রবন্ধ)।

মার্কস্ এশিয়ায় সাধারণ ভাবে দেখিতে পান—'কর-গ্রাহী রাষ্ট্র' ("tribute state"), অর্থাৎ "রাষ্ট্র প্রধানতম ভূস্বামী" ("State as the supreme landlord")। কথনো কোনো যাযাবর 'জন' বা কোনো পল্লী-সমাজের কিংবা উহারও উপরকার কোনো বড় সংগঠিত রাষ্ট্র এক একটা সামূহিক (collective) সত্তারূপে গণ্য হইত। (কাশী, কোশল, মগধ, এবং পরে মৌর্য সাম্রাজ্য এমনি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়, শাক্য-লিচ্ছবী, সংবঙ্গদের ট্রাইব্‌ল রাষ্ট্রও ছিল, তাহা আমরা জানি। বৈদিক যুগের 'প্রাচ্য সমাজ' এইরূপ রাষ্ট্রের বিকাশে অবশ্য লোপ পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য)। এইরূপ সত্তার যে শাসক, হোক্ সে রাজা কিংবা সম্রাট, কিংবা অভিজাততন্ত্র, সমগ্র ভাবে সত্তার ক্ষমতার সেই জীবন্ত প্রতীক; সমগ্র ভূ-সম্পত্তিতে তাহারই স্বামিত্ব থাকিত। কাজেই "জমিতে কাহারও নিজস্ব স্বত্ব নাই; অবশ্য জমিতে দখল ও ভোগের সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার থাকিত।" ("there is no private ownership of land, although there is complete private possession and use of land." *Capital* III, p 918 হইতে উদ্ধৃত; দ্রষ্টব্য *The Modern Quarterly*, Summer,p. 948, p 44)। এই উক্তি ভারতবর্ষ ও মিশর সম্বন্ধে সত্য হইলেও প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া সম্বন্ধে সত্য নয় বলিয়া ষ্ট্রুবে প্রভৃতি রুশ ঐতিহাসিক কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু 'স্বামিত্ব' ও 'দখল ও ভোগের অধিকার' এই দুই-এর পার্থক্য মনে রাখিলে এইরূপ আপত্তির কারণ ভারতবর্ষ বা মেসোপোটেমিয়া কোনো ক্ষেত্রেই থাকে না। ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণ এক একটি পরিবার ("কুল" বা "গৃহ") অনুযায়ী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইত। 'গ্রাম্য সমাজ' ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইল এক একটি রাষ্ট্রে, কথনো-কথনো বা সাম্রাজ্যেও। কথনো সে রাষ্ট্র হইত রাজতন্ত্র কথনো রাজন্যতন্ত্র (অভিজাত তন্ত্র)। প্রজা-কুলের উৎপাদনের একাংশ (এক-ষষ্ঠাংশ) শাসকরা ভূস্বামীরূপে পাইতেন। রাজশক্তির ইহাই ছিল আয়ের প্রধান পথ। অবশ্য এই মূল আদায়ের সঙ্গে শ্রমের উপরও দাবী ('বেগার'), এবং আরও অন্যান্য নানা রাজকীয় সামন্ততান্ত্রিক আদায়-উশুল (আবওয়াব) প্রভৃতির দাবী, যথা,

'কর' বা ট্যাক্স্ (পুষ্প, দুগ্ধ, দধি, প্রভৃতির উপর), কিংবা 'শুল্ক' প্রভৃতি বাড়িতে বা কমিতে পারে ; এবং রাজা ও কৃষকের মধ্যে রাজা কাহাকেও নিজের রাজস্ব দান করিয়া ভূমির সামন্তরূপে স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু মোটামুটি রাজাই যে ভূমির মালিক, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং প্রমাণাবলী হইতে দেখা যায়—(ক) প্রজারও অধিকার কিছু ছিল, সেই অধিকার জমি দখলের ও ভোগের। রাজা খাজনা অনাদায়ে ছাড়া সাধারণত তাহা বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না। (খ) অন্যকে রাজা দিতেন তাঁহার নিজ অধিকার-টুকু—প্রদত্ত ভূসম্পত্তির দ্রব্যজাতের যেটুকু রাজার প্রাপ্য তাহাই রাজা দান করিতে পারিতেন—উহা প্রজা দিলে তাহার স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত। (গ) এই ভোগ-দখলের অধিকার প্রজা-পরিবার হস্তান্তর করিতে পারিত। কিন্তু হস্তান্তর করিতে হইলে ভূমির নিকটস্থ দশজনকে অধিকারীর সাক্ষ্য রাখিয়া করিতে পারিত—অর্থাৎ পল্লীপ্রধানদের উহাতে অনুমোদন প্রয়োজন হইত। তাই চাষীর ভূসম্পত্তিতে স্বত্ব কতটুকু ছিল ? দখলীস্বত্ব—রাজস্ব না দিলে সে উচ্ছেদ হইত। হস্তান্তরেরও কিছু বাধা ছিল। ধর্মকর্মে ছাড়া—দেব-ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে ছাড়া—প্রজাদের সত্য সত্যই একেঅন্যে ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীন অধিকার (প্রাইভেট্ রাইট্ ইন্ প্রোপার্টি) কতটুকু ছিল ?

মোটের উপর এই পরস্পর-বিরোধী প্রমাণাবলী হইতে যে ঐতিহাসিক সহজ সত্য বুঝা যায় তাহা এই :—বৈদিক সমাজেই রাজা যোদ্ধনায়ক হইতে রাজমহিমা আয়ত্ত করিতে লাগিয়াছিলেন। তখনো তিনি নিজ প্রাপ্য পাইতেন উপহাররূপে, সে প্রাপ্যের প্রথম নাম ছিল 'বলি' (সশ্রদ্ধ উপহার); কিন্তু ক্রমে উহাতে তাহার অধিকার জন্মিল। তখন উহার নাম হইল 'ভাগ', হয়ত স্পষ্ট করিয়া উহাকে 'খাজনা' বলিয়া ঘোষণা করিতে সময় লাগিয়াছে। পতিত জমি, বন, খনি প্রভৃতির উপর রাজার স্বামিত্ব স্থির হইয়া গিয়াছে, অবস্থাটা নির্ভর করিয়াছে রাজার ও জন-সমিতির পরস্পরের শক্তির উপর। শক্তি থাকিলে ক্রমেই রাজারা এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতেন—'নৃপতি' তখন অবশ্য 'ভূপতি' হইয়া উঠিতেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের ঠাঁট দেখিয়াই বুঝা যায়—রাজার শক্তি সেখানে অপরিমিত, কৌটিল্য বা গ্রীক সাক্ষীরা রাজাকে ভূমির মালিক বলিলে সত্য কথাই বলিয়াছেন। তখন হইতে অবশ্য ছোট-বড় সকল রাজাই এইরূপ দাবী করিত, তাহাতে ভুল নাই; এবং ক্রমশই প্রজাদের

তুলনায় রাজার দাবী বাড়িয়া যায়, তাহাও নিঃসন্দেহ। বারে বারে বিদেশীয় আক্রমণে বিদেশীয় রাজশক্তি নিজেদের ক্ষমতা বাড়ান; অষ্টবসুর শক্তি ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়াও ক্রমশ রাজারা অলৌকিক মহিমা আয়ত্ত করিতে থাকেন। তথাপি কিন্তু এ বিরাট দেশে সকল স্থানে রাজার এই দাবী গ্রাহ্য হয় নাই; সর্বকালেও স্বীকৃত হয় নাই। মনু-জৈমিনি প্রভৃতি হয়ত এমনি আদর্শের কথা মনে রাখিয়াই রাজার স্বামিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। সায়ন ও মাধবাচার্য প্রভৃতির কথা অন্তত বিজয়নগরের রাজশক্তির সম্বন্ধে মোটেই খাটিত না। তথাপি মনে করা চলে, ভারতবর্ষে যখন যেখানে রাজশক্তি দুর্বল হইয়াছে, সেখানেই তাহাদের এই সার্বভৌম অধিকারের দাবীও টিকে নাই; অন্তত মনু, জৈমিনির মত গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও রাজার এই দাবীকে স্বীকার করিতে বা শাশ্বত বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ভূমিস্বত্বের রূপ

প্রজার অধিকার যে ক্রমশই খর্ব হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজা নানা মধ্যস্বত্ব গড়িয়া তুলিতে থাকেন। কত রকমের ভূমিস্বত্ব যে সৃষ্টি হইতে থাকে তাহারও উল্লেখ পুরালিপি হইতে পাওয়া যায়—যথা, (ক) 'নিবি-ধর্ম' ও 'অক্ষয় নিবি', হয়ত দুইটি কথা মোটামুটি একই স্বত্বকে বুঝাইত—মূল দ্রব্যের ('শিবর') ক্ষয় না করিবার শর্তে বরাবর ভোগ করিবার অধিকার (ইউরোপের ফিয়েক্ এর মতই ?); 'অপ্রদ',—যাহা আর দান করা চলিবে না,—তাহাও এই স্বত্বই বুঝাইত। (খ) কিন্তু 'নিবিধর্ম-ক্ষয়' রূপ স্বত্বে গ্রহীতা বা ক্রেতা দান ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত স্বত্ব লাভ করিত। 'অপ্রদ ক্ষয়ও' এইরূপই অধিকার। (গ) 'ভূমি ছিদ্রের' ('ভূচ্ছিদ্র') কথাই বেশি পাওয়া যায়—ইহার অর্থ আজকালকার ভাষায় 'খাজনা লাগিত না'। স্বভাবতই অনেক দান এই পর্যায়ে পড়িবে। (ঘ) 'দান' বা 'নিষ্কর' জমি, দেবত্র, ব্রহ্মত্র প্রভৃতি সর্বরকম কর, শুল্ক, শ্রম-শুল্ক (বেগার) হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত —(ইউরোপীয় 'বেনিফিস্'-এর অনুরূপ ?)। (ঙ) 'স্থল বৃত্তি'তে কর, খাজনা প্রভৃতি দ্রব্যজাত দ্বারা দেয় হইত।

এই সব নানা স্বত্বের উদ্ভবের মধ্য দিয়া স্বভাবতই বুঝি রাজা ভূস্বামী রূপে স্বীকৃত; তিনি নানা স্বত্বের মধ্যবিত্ত সৃষ্টি করিতে পারেন; প্রজা-সাধারণের অধিকার সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল প্রজাই যে জমি চাষ করে তাহা

নয়; 'ভাগচাষী' বা 'বর্গাদার'এর মত চাষীও আছে। কোথাও তাহারা পায় ফসলের 'আধি', কোথাও তাহারা পায় 'তেভাগার' মাত্র এক ভাগ। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক একটা ভূমিব্যবস্থার ও সমাজব্যবস্থার পরিষ্কার সাক্ষ্য ইহাতে দেখি। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ বুঝিবার পূর্বে অবশ্য এর জাতিভেদ প্রথার প্রশ্ন সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। আর বর্তমান প্রসঙ্গে এই অধিকারহীন 'ভূমিদাস' 'দাসদের' কথা একবার বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় দাসপ্রথা

কি কৃষিকর্মে, কি শিল্পকর্মে, কোনো দিকে দাস-পরিশ্রমে (slave labourএ) উৎপাদন কি প্রাচীন ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল? তাহা মনে হয় না। গ্রীসের মত 'খনি' বা 'কারখানায়' এখানে দাস-শ্রমিক প্রযুক্ত হইবে, কিংবা কার্থেজ বা রোমের মত ক্ষেতে বাগিচায় (প্লান্ টেশনে) পণ্যশস্য উৎপন্ন হইবে দাস-পরিশ্রমে, এমন অবস্থাও হয় নাই। উহার প্রমাণও ভারতবর্ষে কোথাও নাই। যেইরূপ দেখি ইউরোপের ফিউডাল সমাজের সার্ফ বা 'ভূমিদাস' ও ভারতবর্ষে ছিল না—প্রজা বা কৃষক জমি হস্তান্তর করিতে পারিত। অবশ্য 'দাস' বা স্লেভ বরাবর ছিল, (একেবারে আদিতে বৈদিক সমাজে 'দাস' প্রথার যাহাই অর্থ থাকুক, 'দাস' আমরা এখানে 'স্লেভ্' অর্থে ব্যবহার করিতেছি) বৈদিক সাহিত্যেও দাসদের অনেক উল্লেখ আছে, ক্রীতদাস ছিল, ঋণদাস ছিল, যুদ্ধদাসও ছিল; বিচারে অধিকার হারাইলে দাস হইত, দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া (সবংশে) চিরকালের মত বা নির্ধারিতকালের জন্যও কেহ কেহ দাস হইত। প্রভুর পরিবারে দাসেরা থাকিত, অর্থাৎ গৃহদাস হইত, ভৃত্যরূপে শিল্পে বাণিজ্য-ব্যবসায়েও নিযুক্ত হইত; অনেকে রাজভৃত্য রূপে বহু উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারিত। এই সব বিষয়ে তাহাদের অবস্থা গ্রীক দাসদের অপেক্ষা হয়ত ভালোই ছিল। কিন্তু কোনো সময় ভারতীয় সমাজে দাসেরা সংখ্যায়ও তত অধিক হয় নাই, আর উৎপাদন ক্রিয়ায়ও প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে নাই। তাহার প্রধান একটি কারণ এই যে, ভারতীয় সমাজ এমন নিম্ন-শ্রেণীর ছিল, যাহাদের দ্বারাই উৎপাদন করা চলুক, দাসতা প্রথার প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ ঠিক দাস না থাকিলেও দাসতুল্য শ্রেণী সমাজের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, আর তাহারাই ক্ষেতে, গৃহশিল্পে, গৃহকর্মে উৎপাদনের একটা

বড় অংশ জোগাইত। এইরূপ 'সাফ' না থাকিলেও এমন স্বত্বহীন উৎপাদক শ্রেণী তৈয়ারী হইয়াছিল যাহারা 'সার্ফ তুল্য'—নিজের ইচ্ছামত শ্রমোৎপাদনের কোনো অধিকারই পাইত না। 'জাতিভেদ' প্রথার ইহাই এক অসাধারণ কীর্তি—আইনত দাস না করিয়া কার্যত দাসশ্রেণীর সৃষ্টি করা—চিরস্থায়ী দাস প্রথার প্রচলন করা।

ভারতের 'জাতিভেদ'

'জাতিভেদের' বা 'বর্ণাশ্রম ধর্মের' যাহা প্রধান বিশেষত্ব তাহা মোটের উপর তিনটি—বংশানুগত বৃত্তি গ্রহণের নির্দেশ, ভিন্ন জাতিতে বিবাহের নিষেধ, এবং ভিন্ন জাতির সহিত আহারের নিষেধ। অবশ্য ইহা ছাড়া ছোটখাটো কত রকমের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও আচার, খাদ্যাখাদ্য বিচার, এবং স্পর্শ-দোষ-কৌলিন্যের নানা ধাপ প্রভৃতি ধারণা যে প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই ! তাহা ছাড়া সগোত্র, সপিণ্ড প্রভৃতি কৌলিক ধারণাও আছে, আর মূলত আছে পরিবারগত ঐক্য। কিন্তু এই তিনটি মূল ব্যাপার সকল প্রাচীনপন্থী হিন্দুই মানে; হিন্দু ছাড়া ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের উপরও ইহার প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। এবং আজ আবার সমস্ত ভারতবর্ষেরই আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রচলনে শহরে ও খানিকটা পল্লীঅঞ্চলেও শিক্ষিত সমাজে জাতিভেদের কঠিন বিধিনিষেধ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তাহাও স্মরণীয়।

বৈদিক সমাজে আমরা দেখিয়াছিলাম 'বর্ণভেদের' উৎপত্তি; শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আবির্ভাব হয়। প্রাচীন সমাজে অন্যত্রও এই ধরণের 'বর্ণভেদের' অস্তিত্ব যথেষ্ট দেখা যায়—বংশানুগতভাবে বৃত্তিবিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিষেধ, এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ কেন, প্রাচীন গ্রীসে রোমেও ছিল; সামন্ত ইউরোপেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য ডাঃ দত্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায়)। সুতরাং এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি একমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য দেশের সেই সব ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থার তফাৎ তবু গুণগত এবং অসামান্য। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য সমাজে ঠিক এইরূপ ভাবে এই ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়া এমন জটিল, এমন পাকা, এমন অচ্ছেদ্য বিভাগে পরিণত হইতে পারে নাই।

বেদের প্রথম দিক্‌কার তিন বর্ণের পরে বৈদিক যুগেই (যজুর্বেদে) চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের কথা জানিতে পারি। 'বর্ণ' সত্যই কি এবং কাহারা এই 'শূদ্র'—এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। কিন্তু যাহা সত্য মনে হয় তাহা এই : বিজিত অন্‌-আর্য জাতিরা শূদ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকায় ছিল, আর্যরা শ্বেতকায়, আমাদের বহুপঠিত এই সব ধারণা খুব সম্ভব মিথ্যা। সমস্ত 'বর্ণভেদের' গোড়ায় ছিল শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদের বনিয়াদ ; সাধারণ 'বিশ' ভাঙিয়া যোদ্ধারা শাসক শ্রেণীতে উঠিয়া যায়, সম্ভবত (অন্যান্য দেশের মতই) ইহাদেরই একাংশ এবার পুরোহিত বা যাজকরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিণত হয়। সাধারণ লোক স্বাধীন কৃষক ও কারুজীবীরা রহিল বিশে। এই 'বিশের' বা কৃষক ও বৃত্তিজীবীদের বৃহৎ অংশই অধিকারচ্যুত হইয়া দাসতা প্রাপ্ত হয় ও 'শূদ্রে' পরিণত হয়। অবশ্য বাকীবাদ অংশ ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া স্বাধীন থাকে, 'বৈশ্য' জাতি হয়, শ্রেণী হিসাবে হয় 'শ্রেষ্ঠী' বণিক। এই অধিকারচ্যুত 'শূদ্রের' মধ্যে প্রাক্‌-আর্য সমাজের শ্রমিক শ্রেণী (যেমন, হরপ্পা সভ্যতার বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণী) যেমন ঠাঁই পাইয়াছিল, তেমনি বৈশ্যের শ্রেণীর মধ্যেও ঠাঁই পাইয়া থাকিবে সেই প্রাক্‌-আর্য সমাজের সম্পন্ন বণিক শ্রেণী। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও হয়ত ঠাঁই পাইয়াছে 'অসুর', 'রাক্ষস' প্রভৃতি অন্‌-আর্য (এবং সম্ভবত সুসভ্য) ক্ষমতাবান্‌ শাসক শ্রেণীর লোক—ইহা অনুমান করা যায়। অন্তত বর্ণভেদের মূল কারণ রঙের পার্থক্য (বা কলার ডিফারেনস্‌) নয়, জেতা-বিজেতার রেসিয়াল্‌ সমস্যাও নয়—আসল কারণ এই শ্রম-বিভাগ ও শ্রেণীভেদ, উহাই ক্রমে 'জাতিভেদে' রূপ লাভ করে—এই কথা বহু পণ্ডিতেরই মত। সমাজের বিকাশের সঙ্গে নূতন নূতন শিল্প দেখা দেয়। তন্তুবায়, কুম্ভকার, তাম্রকার, (লৌহকার, কাংস্যকার), সূত্রধর, রথকার, চর্মণী ছাড়াও আরও নূতন শিল্পী দেখা দেয় তৈলকার, নাপিত, ধোপা, ইত্যাদি। নূতন নূতন কারিগর ও নূতন বৃত্তিজীবী এইভাবে বাড়িতে থাকে শিল্পকৌশলের ক্রমবিকাশের জন্য। সমস্ত শিল্পী শ্রেণীই প্রায় শূদ্রদের মধ্যে পরিগণিত হয়, শুধু চার বর্ণে তাই আর কুলাইল না। সন্দেহ নাই যে শারীরিক শ্রম ঘৃণ্য বিবেচিত হইতে শ্রেণীভেদ ক্রমশ বংশগত হইতে লাগিল ; বিবাহ, আহারাদির নিষেধ ইহার মধ্যে জুটিতে লাগিল। এইরূপে বর্ণভেদ হইতে 'জাতিভেদ'-রূপে মূলের শ্রেণীভেদ এমন আকার গ্রহণ করিল যে মূল সত্যও প্রায় চিনিবার উপায় রহিল না। 'জাতিই' একটা প্রবল ও ব্যাপক

ধারণা ও ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত যুগের সময় হইতে গ্রাহ্য হয় এবং সমাজের নানা ভাঙা-গড়ায় এক এক অঞ্চলে নূতন জাতিরও এইভাবে আবির্ভাব হয় (যেমন, প্রাচ্য ভারতের লেখক-বৃত্তিধারী 'করণ', কায়স্থ, ও মহারাষ্ট্রদেশের 'প্রভু'), অনেক পুরাতন জাতি লোপ পায় (যেমন, হিন্দুস্তান ও রাজপুতনার বাহিরে ক্ষত্রিয় প্রায় বিলুপ্ত), অনেকের আবার অধোগতিও হয় (যেমন, বৌদ্ধ পালদের পরে সুবর্ণ বণিকদের বাংলায় দুর্দশা ঘটে, অনেক বৌদ্ধ মুসলমান হয় ; অন্যেরা পরেবৈষ্ণব সমাজে স্থান পায়), বিভিন্ন অঞ্চলের জাতির মধ্যেও ব্যবধান বাড়ে (যেমন, 'রাঢ়ী', 'বারেন্দ্র' ব্রাহ্মণের তফাৎ), এবং হয়ত পুরাতন ট্রাইব হইতেও নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতে থাকে (বাঙলার বাগ্‌দী, বাউড়ি, প্রভৃতি জাতি)।

বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদও একটা সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস—তাহা ভারতীয় সামাজিক বিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রধান সত্য। এই বিবর্তন-ধারা তাই লক্ষণীয়। বৈদিক যুগেই বর্ণভেদের যখন সূচনা হয় তখনো ভেদ বংশগত নয়, বর্ণান্তর বিবাহে বাধারও উল্লেখ নাই, আহারাদির সম্পর্কেও নিষেধ দেখা যায় না। অনেক রাজা মন্ত্রী শূদ্র ছিল, শূদ্রত্ব অনেকে প্রাপ্তও হইত, আবার অনেক শূদ্রও শাসক বর্গে উঠিয়া যাইত। কিন্তু শূদ্র তখনো হেয়, সম্ভবত দাসমাত্র। প্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও পারে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কথা বলিতে আরম্ভ করে। ইহার পরে বৈদিক যুগের পরে বুদ্ধজন্মকালে ব্রাহ্মণ্যবাদও জন্মিয়াছে। আপস্তম্ব, গৌতম ও বোধায়নের ধর্মসূত্রে (আনুমানিক কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০-খ্রীঃ পূঃ ৩০০ পর্যন্ত) দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ সুবিধাভোগী (প্রিভিলেজড্) শ্রেণী হইয়া উঠিয়াছে. তবু অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহও চলে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রা বিবাহও অসিদ্ধ নয়, ব্রাহ্মণের ঔরসের পুত্র ব্রাহ্মণই থাকে,—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিগত হেয়তার গোড়াপত্তন হইয়াছে, তবে তাহা তত কঠিন হইয়া উঠে নাই। সমসাময়িক বৌদ্ধ প্রমাণে দেখি ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী ও তখনো ব্রাহ্মণ সম্মানিত, কিন্তু পেশা হিসাবে ব্রাহ্মণও চাষী, ব্যবসায়ী, শিকারী, সূত্রধর, সৈনিক, কশাইর কাজ করে। এই মর্মের তথ্য রামায়ণ মহাভারতেও মিলিবে,—হয়ত ঐসব পুরাণ-ইতিহাসে তাহা সংগৃহীত রহিয়াছে। বৌদ্ধজাতকে দেখি এক ক্ষত্রিয়-কুমারও রাঁধুনি, মালাকার ও বেতওয়ালা হিসাব কাজ করিতেছে। তবে কারিগর ও শিল্পীরা গিল্‌ডে

সুসংগঠিত, বৈশ্য ব্যবসায়ীরাও শ্রেষ্ঠীরূপে গিল্‌ড বা শ্রেণী রক্ষা করিতেছে। তথাপি সন্দেহ নাই যে, কাজ এই সময়ে বংশগত হইয়া গিয়াছে।

অন্য দিকে এই বিষয়েও সন্দেহ নাই যে, ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জিজ্ঞাসুরা, ও নানা অ-বৈদিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মত অ-বৈদিক ধর্ম অনেকাংশে খর্ব করিয়া দেয়। মানুষের মূল্য নির্ণয়ে বুদ্ধদেব মানুষের গুণের উপর জোর দিয়াছেন—জন্মের উপর নয়, শ্রেণীর উপরও নয়। ইহার পরে তৃতীয় পর্বে মৌর্য যুগ যখন আসিল তাহার পূর্বেই মগধের সিংহাসনে শূদ্র মহাপদ্ম নন্দ অধিষ্ঠিত হইয়াছে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও শূদ্র ছিলেন ('বৃষল' ক্ষত্রিয় নয়) তাহাও সাধারণ বিশ্বাস। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের ঔদ্ধত্য পাই না, শূদ্রদের বিরুদ্ধেও তেমন উগ্রতা দেখি না—এমন কি শূদ্রদেরও আর্য পর্যায়ের অন্তভুক্ত করা হইল, বলিয়া মনে হয়। জয়স্বালের মতে এই অর্থশাস্ত্র "Imperial Code of the Law of the Mauryas"। অশোকের শিলালিপিতে যে ধর্ম, নীতি, অহিংসার আভাস, 'ধর্ম-মহামাত্যের' নিয়োগ, 'দণ্ড-সমতা' ও 'ব্যবহার সমতার' নির্দেশ দেখি তাহাতে বুঝি ব্রাহ্মণ্যবাদ রীতিমত প্রতিহত হইল। অপর পক্ষে পুরাণাদির (বিষ্ণুপুরাণের) কথা হইতেও বুঝি নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয়রা আর রাজশক্তি একচ্ছত্র অধিকারে রাখিতে পারে নাই; শূদ্র শ্রেণী হইতে রাজার উদ্ভব হইল, বৌদ্ধ ও জৈনমতাবলম্বী রাজারাও বহু স্থলে রাজত্ব করিতেন। এই পর্বেরই পরে (চতুর্থ পর্বে) আসিল কণ্ব ও সুঙ্গদের ব্রাহ্মণ-রাজত্ব, অশ্বমেধ, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রথম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, "Orthodox Counter-Revolution" (জয়স্বালের ভাষায়)। আর, এই সময়েই মনুসংহিতা রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্যশক্তির হিটলারী দাপট, 'ব্লাড থিওরি' হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর শাসক-শ্রেণীর যাবতীয় উৎকট-অধিকারের দাবী এবং শূদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ, ঘৃণা, অবজ্ঞা—মনু মহারাজের পাতায়। ইহাই First Code of Law of Fascism.

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গ্রীক-বংশোদ্ভূত বাহ্লীকের যবন রাজারা, শকেরা, বিশেষত কুশান্ সম্রাট্‌রা অধিষ্ঠিত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রীকদের মিশ্র বর্ণ (ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত) বলিয়া বলিল, শকদের বলিল শূদ্র, ম্লেচ্ছ। আসলে এই নবাগতরা বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও তাহার

শাসন-চক্র চূর্ণ করা তাহাদের প্রয়োজন, নিজেদের শাসন-চক্র প্রচলন করাও চাই। ইহাই শ্রীযুক্ত জয়স্বালের অভিমত। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র শাতকর্মী বা শাতবাহন (খ্রী পূঃ ২০০ হইতে খ্রী ২৩০ পর্যন্ত) একদিকে এই বিদেশীদের রাষ্ট্রক্ষমতা ঠেকাইয়া রাখেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও সুদৃঢ় আশ্রয় দেন। এমনি সময়ে (পঞ্চমপর্বে) মধ্য দেশে হয়ত ম্লেচ্ছ রাজারই রাজত্বে যাজ্ঞবল্ক্য (খ্রীঃ ২০০ ?) তাঁহার স্মৃতি রচনা করেন—মনুর মত উগ্রতা তাহাতে নাই; শূদ্র, স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্বন্ধে বিধি-নিষেধে একটু কড়াকড়ি কম। এই স্মৃতিই সম্ভবত পরবর্তী গুপ্ত রাজত্বে পশ্চিম ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু গুপ্তদের পূর্বে ভারতবর্ষে আর একটা ভাঙা-গড়ার কাল গেল। ষষ্ঠপর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের তাই পুনর্গঠন শুরু হইল। বৈদিক কর্মকাণ্ড আর চলে না, নূতন দেবতাদের পূজা প্রচলিত হইতেছে—ভারশিব বাকাটক রাজারা তখন মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। নাগরাজ ভারশিব ছিল সম্ভবত দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত, কিন্তু তাহারা শৈব, ব্রাহ্মণ্য সমর্থক, —পূর্বাধিষ্ঠিত বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। ভারশিবরা ক্ষত্রিয় আখ্যা পাইলেন ব্রাহ্মণদের কৃপায়। (তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, না, ছিলেন বৈশ্য ?) 'বিন্ধ্যশক্তি' বাকাটকগণ (খ্রীঃ ২৮৪-৩৪৮) কিন্তু নিজেরাও ব্রাহ্মণ; তবু ভারশিব-কন্যাকে তাহার রাজপুত্র বিবাহ করিতে বাধে নাই। বাকাটরাও শৈব ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞাদিও করেন। এদিকে আরও দক্ষিণে পল্লবরা (ব্রাহ্মণ ?) কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের তাঁহারাও পরিপোষক। বর্ণাশ্রম ধর্ম এই স্তরে সুদৃঢ় হইল।

এই ষষ্ঠপর্বের পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের যাহা কিছু শক্তি ও কীর্তি তাহা কিন্তু প্রকটিত হয় গুপ্ত যুগে; আর তাহাকে চিরস্থায়ী করার যাহা কিছু প্রতিক্রিয়া-মূলক প্রচেষ্টা তাহাও তখনি শাণিত ও সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্ম তখন উদ্ভূত হইল বেদের পরিবর্তে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়া (বৌদ্ধ জাতকের সহিত তুলনা করিলে দেখি ইহাতে সাধারণ জীবন-যাত্রা নাই); বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা তাহার ভিত্তিরূপে নির্দিষ্ট হইল—মানুষের (নিম্ন বর্ণের, বৌদ্ধ শ্রমণের) দর্শনে, স্পর্শে পাপ; আচার-বিচারের অবধি নাই। অথচ তখনো বিধবা বিবাহের বিধানও কোনো কোনো স্মৃতিতে আছে। শূদ্র ও বৈশ্যদের প্রতিও এক-আধটুকু কৃপার

দৃষ্টি আছে (সম্ভবত গুপ্তরা বৈশ্য না হইলে আরও নিম্নজাতীয় ছিলেন)। ব্রাহ্মণ তখন "ভূদেব" হইয়াছেন। স্বভাবতই অন্যদিকে বাস্তববিমুখ ভাবনাদিতে বেদান্ত-দর্শন বিকাশ লাভ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব-ভক্ত পরম ভাগবত সম্রাটদের যুগে বৈষ্ণব ধর্মও (মহাযান বৌদ্ধ যুগকে আত্মসাৎ করিবার জন্যই যেন) একটু করুণামিশ্রিত ভক্তিবাদকে সমাজে প্রচলিত করিতেছে। গীতায় "গুণকর্মবিভাগশই" ভগবান চাতুর্বণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, (বুদ্ধদেবের অনুকরণে) এমন কথাও স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। তবু মোটামুটি ব্রাহ্মণ্যবাদের সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান গুপ্ত সম্রাটরা, তাঁহাদের পরে জন্মগত জাতি, রক্তের বিশুদ্ধিতা, বিবাহে আহারে বিধি-নিষেধ, জাতি-ধর্ম, ক্ষাত্র-ধর্ম (সামন্ততন্ত্র, দাস-ও-ভূমিস্বত্বের বিকাশের সহিত), রাজার ঐশ্বরিক বিভূতি প্রভৃতি সাধারণের মনে গাঁথিয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে উত্তরাপথ দক্ষিণাপথের এই দিকে সাংস্কৃতিক ব্যবধানও মুছিয়া যায়—সাতবাহনদের মতই চের ও পাণ্ড্য রাজারা ('ক্ষত্রিয়' বলিয়া দাবী করিতেন) ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপোষক হন। পল্লবরাও (হয়ত উত্তরাপথের ব্রাহ্মণ বংশীয়ই তাঁহারা) ব্রাহ্মণ্যবাদকে পরিপুষ্ট করেন। শকরা, যবনরা (হেলিয়োডোরসও) ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গুপ্তযুগের পরে একটা অন্ধকার—সেই অন্ধকারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বজ্রবন্ধন টিকিয়া রহিল। তাই সপ্তম পর্বে হর্ষবর্ধন যখন আসিলেন (খ্রীঃ ৬০৬-খ্রীঃ ৬৪৮) তাহার পূর্বে গৌড়ের ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম উৎপাটিত করিয়া হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হর্ষবর্ধন বৈশ্যবংশোদ্ভব, সম্ভবত শ্রেষ্ঠীরা অনেকেই তখন বৌদ্ধও ; গুপ্তদের সময় হইতেই শ্রেষ্ঠী বণিকদেরও সম্পদের ও সুযোগের পথ প্রশস্ততর হইয়াছিল ; বণিকশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণশক্তির তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলিতেছিল (ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া), হর্ষবর্ধনের জয়লাভে সাময়িকভাবে বৈশ্যদের ও বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি রক্ষিত হইল—বৈশ্যরা তখন হইতে বাণিজ্যই সার করে, কৃষিকর্মও শূদ্রের কর্ম হইয়া পড়ে। বৈশ্য অবশ্য তখন রাজার জাতি ; তাহাদের 'শ্রেণী' বা গিল্ড প্রবল, সম্পদও যথেষ্ট। তাই পরবর্তী বহু দুর্যোগের মধ্যেও উত্তর ভারতে বৈশ্যরা এক সম্মানিত জাতি রহিয়া গেল। সেই দুর্যোগের মধ্যে (অষ্টম পর্বে) বাঙলার পাল সম্রাটরা প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া 'মাৎস্যন্যায়' শেষ

করেন। তাঁহারা ছিলেন সম্ভবত শূদ্র (দাসজীবিন), অন্তত (তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য ও নাথগুরুদের) বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিপোষক আর সামন্ত অত্যাচার ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী বলিয়া তাঁহারা পরিগণিত—নিশ্চয়ই শূদ্র সামন্ত ও শাসক-চক্র তাহাদের সঙ্গে প্রবল হয়, আর বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মত বৌদ্ধ বণিকেরাও তাঁহাদের আশ্রয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ-বিদেশে গৌড়ীয় বৌদ্ধ-সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করেন— আর তাই সেন যুগের সময় হইতে বাঙলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ জাতি (বৌদ্ধ? সুবর্ণবণিক, সাহা, প্রভৃতি) অনাচরণীয় হন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণবাদ আর একটি শাসন-চাতুর্যের উদ্ভাবনা করিয়া বসিয়াছে—যে কোন জাতির নূতন রাজশক্তিকে তাহারা কোনো-রূপে একটা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়া নিজেদের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে—সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশের বংশ-পীঠিকায়ও প্রয়োজন মত তাঁহাদের স্থান করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এই ভাবে প্রমোশন পাইয়া প্রত্যেক নবাগত রাজবংশও ব্রাহ্মণ্যবাদের বড় পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইবে এবং অন্য ছোট জাতিকে দৃঢ় হস্তে দমন করিবে, তাহাতে বিস্ময় নাই। তাই এখন হইতে (এই নবম পর্বে) আবার নূতন ক্ষত্রিয় বংশের সৃষ্টি হইল। গুর্জর প্রতিহাররা 'ক্ষত্রিয়', চালুক্যরা সূর্যবংশীয়, রাষ্ট্রকূটরা চন্দ্রবংশীয়, সেনরা কর্ণাটের 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়'। অবশ্য এই সব ক্ষত্রিয়দের বিবাহাদিও ভিন্ন জাতিতে হয়,—আর তাই ইহাদের পরে (দশম পর্বে) যদি হিন্দু যুগের শেষ দিকে দেখি নানা সামন্ত শাসক সকলেই 'রাজপুত' এই নামে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (ভারতবর্ষ তখন রাজপুত রাজবংশগুলিরই কবলিত) তাহা হইলে বুঝিব জাতিভেদ প্রয়োজন মত 'উদার' হইয়া তাহার নিগড়কে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। দুইটি চতুর নীতির ফোঁড়ন এ জন্য ইহার দরকার হয় প্রথম হইতেই—চাতুর্বর্ণ্যের' বাহিরের বর্ণকে 'মিশ্র জাতি' বলিয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা, আর পরে রাজবংশ (ও তাহার স্বজন) মাত্রকেই ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোশন দান। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে অবশ্য এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনেক বেশি সংকীর্ণতার ও বর্জননীতি গ্রহণ করে—এবং কতকাংশে হয়ত এই 'কমঠ ব্রতের' জন্যই ইসলামের সর্ববিজয়ী প্লাবনের মধ্যেও হিন্দুধর্ম টিকিয়া থাকিতে পারে—ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বপক্ষে ইহাও বলা চলে। এই সময়ের মধ্যে এক-একটি গিল্ডের

অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিজীবী যূথ ক্রমে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়—মিশ্র জাতিগুলি অনেকাংশেই এই গিল্ড-জাতি। তাই গিল্ডের বিবর্তনও এই দিক হইতে স্মরণীয়। বৈদিক যুগের পর হইতে বৃত্তি বংশগত হইতে থাকায় কারিগরদের গিল্ড বা শ্রেণী গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হইতে থাকে। শিল্পীদেরই তাহা কারুসংস্থা। মৌর্য যুগের পূর্বেই গিল্ড বা শ্রেণীগুলির সুস্পষ্ট অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু শ্রেণীগুলি তখনো গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই; দুয়ার রুদ্ধ করিয়া বসে নাই, 'জাতি' হইয়া উঠে নাই। এই মৌর্যদের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৩২১) হইতেই বর্ণাশ্রমের তৃতীয় স্তরের সূচনা—ক্ষত্রিয়ের শক্তি খর্বিত, শূদ্ররা রাজা। ওদিকে অর্থশাস্ত্রে দেখি তখন ব্যবসায়ী শ্রেণী-গুলিও সুবিকশিত। কোনো কোনো বিষয়ে রাজা তাহাদের আত্মশাসনের সুবিধাও দিয়াছে। (কৌটিল্য শূদ্রকেও 'আর্য'—স্বাধীন নাগরিক, যে দাস নয়—পর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন মনে হয়। মৌর্য সম্রাটদের বংশটা উচ্চ নয় বলিয়াই কি?) এক একটি কারুবৃত্তি এক একটি শ্রেণী সৃষ্টি করে, এক একটি কারুবৃত্তিধারী শ্রেণী নিজেদের মধ্যেই কলাকৌশল, বিবাহ ও সামাজিক বন্ধন আবদ্ধ রাখিতে থাকে—জাতি হইয়া উঠিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দ আরম্ভ না হইতেই (কণ্ব ও সুঙ্গদের ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার সহায়ে মনু তখন শূদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইলেন) মোটামুটি এই শ্রেণীগুলি গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যায়—জাত্যন্তরে বিবাহ ও আহার নিষিদ্ধ হয়। গুপ্তযুগে তাহারা নিজেদের বিচার ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর সুবিধা উপভোগ করে (দ্রষ্টব্য *New History of Indian People*, Ed. Altekar & Majumdar, p 333 ff); করিবারই কথা, কারণ গুপ্ত সম্রাটরা সম্ভবত বৈশ্য (?) ছিলেন; শ্রেষ্ঠীদের এক একটা 'শ্রেণী' তখন এক-একটা 'কর্পোরেশনের' মত হইয়া উঠিয়াছে। বহু শহরে উহাদের শাখা, উহা আবার অনেকটা 'চেম্বার অব কমার্সের' ও মত। সমৃদ্ধিও তাহাদের যথেষ্ট। মন্দির নির্মাণ, গুহা নির্মাণে তাহারা উৎসাহী। আবার কারি-গরদের শ্রেণীগুলিও সমৃদ্ধ—যথা তন্তুবায়, তৈলকার, প্রস্তর ভাস্করদের। মহাজনীও আছে। কারিগরের শ্রেণী বৃহৎ হইলে ভাগ হইয়া একটা নূতন 'শ্রেণী' সৃষ্টি করে*—অর্থাৎ নূতন জাতি আরও বাড়িল (যেমন

---

* প্রাচীন ভারতে 'গিল্ড্'কে বলিত শ্রেণী। এখানে বাঙ্গলায় আমরা 'ক্লাস' অর্থে শ্রেণী শব্দ সুপ্রচলিত হওয়ায়, গিল্ড্ অর্থে 'শ্রেণী' (উর্দ্ধ কমার মধ্যে) প্রয়োগ করিলাম।

হেলে ও জেলে কৈবর্ত, কলু ও তিলি)। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই শ্রেণীগুলি সামন্ত যুগে লোপ পায় নাই—পাঠানরা চেষ্টা করিয়াও ইহাদের দমন করিতে পারে নাই। উহারই অনেকখানে 'জাতি-পঞ্চায়েৎ'এ পরিণত হয়। তথাপি ব্যবসায়ীদের গিলড্ (পঞ্চায়েৎ-শাসিত) এখনো দক্ষিণে ও উত্তর ভারতে টিকিয়া আছে।

এই বহুস্তরের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ভারতীয় বর্ণভেদ জাতি-ভেদের যে বিবর্তন ঘটে তাহাতে তাই মোটামুটি দেখা যায় :

(১) বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ শাসক শ্রেণীরূপে জনসাধারণের ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে। রাজাই জমির চরম মালিক ছিল ; সে সামন্ত বা মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করিত।

(২) 'বিশ' প্রথমত ছিল জনসাধারণ, পরে 'বৈশ্য' অর্থ হইল কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী। তাহারা বণিক হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ ও মর্যাদা গুপ্তযুগে লাভ করিয়াছিল। হর্ষবর্ধনও বৈশ্যকুলসম্ভূত। তখন হইতে বৈশ্যরা ব্যবসায়ী। আর তখন হইতে এখন পর্যন্ত বৈশ্যরা উত্তর ভারতে সম্মানিত জাতি রহিয়াছে। অন্যত্র তাহারা প্রায় লুপ্ত—হয়ত বৌদ্ধ বণিক সম্প্রদায় ক্রমে শূদ্র জাতিতে নিমজ্জিত হয়।

(৩) বিশের সাধারণ শিল্পীরা (যাহারা কায়িক পরিশ্রম করিত) তাহারা চাষী, কারিগর হিসাবে ক্রমশ 'শূদ্র' হইল। (ক) শূদ্ররা সাধারণত ছিল অধিকারহীন,—ভূসম্পত্তি তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। সকলে কিন্তু স্লেভ নয়, তাহারা ভাগচাষী কিংবা ক্ষেতমজুর। (খ) শিল্পী কারিগর হিসাবে অবশ্য তাহারা হইত সমস্ত গ্রামের প্রতিপাল্য—গ্রামের চাহিদা জোগাইয়া যদি কিছু থাকিত তাহা শ্রেষ্ঠীরা হয়ত নগরের পণ্যরূপে গ্রহণ করিত। (গ) অধিকারহীন শূদ্রদের মধ্যেই ছিল ক্রীতদাস, ঋণদাস, এবং অন্য জাতির পতিতরা, এবং বিজিত দেশের শ্রমজীবীরা। (ঘ) শূদ্রদেরও বাহিরে ছিল মেচ্ছ, অন্ত্যজ। মৌর্য যুগে শূদ্রদের যেটুকু প্রতিষ্ঠা ছিল মনুস্মৃতি তাহা হরণ করে। মোটামুটি শূদ্রের অর্থ হইয়া দাঁড়ায়—ভারতের অধিকারহীন দাস-তুল্য শ্রমজীবী শ্রেণী। (ঙ) পরে ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু সুবিধা করিতে পারে, বাংলাদেশে তাহারা একটু প্রোমোশন পাইয়া সৎশূদ্র হয় ; অন্যেরা অনাচরণীয় হয়, অন্ত্যজ হয়, পঞ্চম হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উৎপাদক শ্রেণী এই শূদ্র ও অন্ত্যজ

জাতিরাই—ইহারাই ছিল ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, সামান্য কারিগর শিল্পী, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই কৃষকও। মোটামুটি শূদ্র অর্থ দাঁড়ায় এই—দাস-তুল্য, অধিকারহীন।

(৪) প্রধানত ব্রাহ্মণরাই এই শ্রেণীবিন্যাসে নিজের মহিমা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য শ্রেণীর মধ্যেও এই উচ্চ-নীচ-পর্যায় বাড়াইতে থাকে। বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিতে থাকিলে বৃত্তিজীবীরা কলাগত জীবিকা নিজেদের বংশগত রাখিবার জন্য তাহা মানিয়া লয়।—তাহাদের এইরূপ গিল্ড্ বা শ্রেণীগুলিই নানা জাতিতে পরিণত হয়, এই বংশগত বৃত্তির সুবিধার জন্যই বিবাহ ও আহারের বিধানও গ্রহণ করে। তখন গিল্ড 'জাত পঞ্চায়েতের' জাতি হয়।

(৫) এই ভেদ-রেখা ধরিয়া ক্রমে টোটেম (বা গোষ্ঠীপিতা বিষয়ক) তাবু (বা ভক্ষাভক্ষ্য ও অন্যান্য নিষেধাত্মক) সম্পর্ক ও 'মেনা' (বা শুদ্ধাশুদ্ধ, পাপ পুণ্য) মূলক আদিম সংস্কারগুলি নূতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিল। তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর জাতির পক্ষে নিম্ন শ্রেণীর জাতির শুধু ভোজ্যপেয় বা বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, স্পর্শ, দর্শন পর্যন্ত অমঙ্গল সূচক হইয়া উঠিল। শুদ্ধাশুদ্ধের ধারণা ও বিচার শুধু অসম্ভব রূপে পল্লবিত হইল না, এই ভেদরেখা অনুসরণ করিয়া তাহা অসম্ভব রকমের সুদৃঢ়ও হইল; এবং প্রত্যেকটি জাতিকে তাহারই শ্রেণীর অন্যান্য জাতি হইতেও দূর করিয়া রাখিল, শ্রেণীর মধ্যেও অসংখ্য ও অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিল। যে 'জাতি' আসলে আর্থিক মাপকাঠিতে যত নিম্ন, স্বভাবতই সে হইল অশুদ্ধ, অস্পৃশ্য। কিন্তু তাহার পক্ষে এই ধারণা মানিয়া চলাই হইল তাহার জাতি-নিয়ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সংস্কারের অনুশাসন। এই ভাবে একটা আর্থিক-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া আরও দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত হইয়া পড়িল। এই রহস্যময় বিধিবিধান সমন্বিত জাতিভেদ প্রথা সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থাকেও একটা রহস্যময় ঐশ্বরিক মহিমাও দেয় আর ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও হইয়া উঠে।

তাই জাতিভেদের প্রধান যাহা উদ্দেশ্য তাহা যে অনেকাংশে সিদ্ধ না হইয়াছে তাহা নয়। আর্থিক শ্রেণীভেদকে প্রথম হইতেই ধর্মশাস্ত্রের বলে অপার্থিব বিধান বলিয়া প্রচার করা হয়। শুধু সমাজ নয়, শাসিত শ্রেণীও

খণ্ড, জাতিতে ভাগ হইয়া গেল—না রহিল জাতীয় অখণ্ডতা, না রহিল শ্রেণীগত অখণ্ডতা। ইহার ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কলানৈপুণ্য জোটে, কিন্তু মোট উৎপাদনশক্তি ক্রমেই রুদ্ধগতি হইয়া পড়ে অর্থাৎ নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনা. বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন বৃদ্ধির তাগিদ রহিল না, উৎপাদক শ্রেণীর মনে উদ্যোগের কারণ নাই, শাসক বা ধনিক শ্রেণীর লাভ ও প্রাপ্য এতই সুনিশ্চিত যে, শিল্পোদ্যোগেরও প্রয়োজন তাহারা বোধ করে নাই। গ্রীস সভ্যতাও পুরানো সভ্যতা এইরূপ দাসতার ফাঁসে মরে; ভারতীয় সভ্যতা জাতিভেদের বন্ধনে ধীরে ধীরে slow death গ্রহণ করে। এই বর্ণভেদের ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সহায়তায় ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে টানিয়া থাকিবার মত একটা স্থাণু ব্যবস্থা হইল, এবং শ্রেণী-সংঘাতও প্রতিহত করিবার মত বাস্তব উপায় শাসক শ্রেণীর হাতে আসিল। সমাজ-বিকাশ রুদ্ধ করা গেল উৎপাদনশক্তি এইরূপে দুর্বল করিয়া। উৎপাদক শ্রেণীকে এইভাবে ধর্মের নামে শাস্ত্রের নামে এবং বাস্তব রাষ্ট্রীয় বিধানের জোরে পোষ মানাইয়া রাখিয়া সমাজতন্ত্র টিকাইয়া রাখিবার পক্ষে জাতিভেদ প্রথার মত এমন নিগড় আর কি হইতে পারে?

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র

ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্প উৎপাদন যেমন ভারতীয় 'বর্ণাশ্রমের' সহিত জড়িত, তেমনি সেই ভূমি-ব্যবস্থা ও 'জাতিভেদ প্রথা' মিলিয়া আবার ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট স্থায়িতা দান করিয়াছে। এই জন্যই এই সামন্ততন্ত্রকে ইউরোপীয় বা অন্যান্য ফিউডাল ব্যবস্থার তুলনায় স্বতন্ত্র জিনিস বলিয়া মেন্ প্রভৃতির মনে হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি মোটা লক্ষণের কথা সম্মুখে রাখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে এই ভারতের সামন্ত-ব্যবস্থা কি আকারের।

প্রথমতঃ কৃষিই যখন প্রধান উৎপাদন-পন্থা, ভূমি-ব্যবস্থাতেই তখন সমাজের মূল জট নিহিত থাকিবে। সেই ভূমি-ব্যবস্থার দিক হইতে দেখি—সর্বোপরি রাজা আছেন ভূস্বামী; তাঁহার নীচে তাঁহার সৃষ্ট দেব-ব্রাহ্মণ হইতে নানা মধ্যস্বত্ববানেরা আছে; এবং তলাকার দিকে আছে দখলী স্বত্ববান্ কৃষক গৃহস্থ (পূর্বে একাজ করিত বৈশ্যরা; পরে শুধু বৈশ্য ধনিকেরাই বৈশ্য থাকে, এই কৃষকেরা শূদ্র হইয়া যায়), তাহাদের নীচে

আছে বর্গাদার, নানা পর্যায়ের দাস ও অন্ত্যজ ক্ষেতমজুর। ঠিক 'ক্রীতদাস' বা 'ভূমিদাস' না হইলেও ইহাদের অনেকের অবস্থা দাসদের মতই। মুদ্রার বেতন বা মুদ্রার প্রচলন মোটেই বাড়ে নাই। কাজেই শস্যে বা বস্তুতেই বেতন দেওয়া হইত।

জন বা ট্রাইব্ ভাঙিয়া যখন বৈদিক সমাজ গঠিত হইতেছে তখনো এই স্তর-বিন্যাস (হেয়ারারকি) ছিল না, অবশ্য রাজারা তখনো ভূমিদান করিতেন; সম্পন্ন (মহাকুল, মঘবন্) সম্মানিত গোষ্ঠী তখনো ছিল। মৌর্যযুগেও সামন্তদের সাক্ষাৎ পাই না; বিরাট্ মৌর্যসাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন রাজকর্মচারীদের (মহামাত্র) সহায়ে চলিত। সুঙ্গদের সময়ে সামন্তদের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। হয়ত মহামাত্রদের পূর্বাধিকার এইভাবে স্বীকার না করিয়া এই দুর্বল রাজারা পারিত না। কিন্তু ভারশিব-বাকাটক ও গুপ্তযুগে আসিতে আসিতে সামন্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সমস্তহিন্দুযুগে উত্তরে ও দক্ষিণে সামন্ত-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, (মুসলমান যুগে তাহা আরও নূতন ও সুদৃঢ় হয়)।

এই বিভিন্ন স্তরের সামন্তদের স্তরবিভাগ সুপরিচ্ছন্ন না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পুরালিপি হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যথা: (১) উপরে মহারাজাধিরাজ, পরে একে একে (২) মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহামাণ্ডলিক, (৩) সামন্ত মাণ্ডলিক, মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি, (৪) ভুক্তিপতি, ভোগপতি, ভুগিক ইত্যাদি, (৫) বিষয়পতি, গ্রামপতি, (৬) ষষ্ঠাধিকৃত (রাজস্বের এক ষষ্ঠের অধিকারী), (৭) ভোজক (সম্ভবত গ্রামের অধিকারী), (৮) কুটুম্বি, ক্ষেত্রকার, কর্ষক, ইত্যাদি (কৃষক, ক্ষেতকার), (৯) পরের ভূমিতে কর্ষণ করিয়া শস্যের একাংশ পায় (ভাগচাষী, বর্গাদার) ও (১০) যাহারা একেবারেই ক্ষেতমজুর (তাহারা সম্ভবত এই 'কর্ষক' নামেই পরিচিত হইত, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ইহাই অনুমান)।

ইহা রাজকর্মচারীদের উপাধি নয়। বরং সামন্তরাই নিজ নিজ এলাকায় শাসন-বিচারেরও অধিকারী ছিলেন। এবং রাজকর্মচারীরাও যেমন সামন্ত অধিকার লাভ করিত, সামন্তরাও তেমন রাজকর্মচারী হইত, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। দ্বিতীয়ত, ভূমিস্বত্বের দিক হইতে নিবি-ধর্ম (ফিউডাল ফিয়েফ্, মুসলমান আমলের জায়গীরের সমতুল্য), পরিহার (ইমিউনিটি), ভূমিছিদ্র, দান (ফিউডাল 'বেনিফিস্'এর সমতুল্য) প্রভৃতি ব্যবস্থা

সামন্ততন্ত্রের সুপরিচিত ব্যবস্থা। ইহার সহিত পরবর্তী কালের 'নিষ্কর, 'চাক্‌রান্'. প্রভৃতির কথা স্মরণীয়—প্রভু গোষ্ঠীর পূজা-যাজন, এবং দেবী-প্রতিমা, হাড়িকুড়ি, ক্ষৌরকর্ম, বস্ত্র ধোলাই প্রভৃতির প্রয়োজন মিটাইবার শর্তে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোত্র), ও কুম্ভকার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি নানা শিল্পীরা, এমন কি ভৃত্যরা পর্যন্ত, এইরূপ ভূমি লাভ করিত। ইহা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা। তবে ভারতে এই ব্যবস্থা মুসলমান আমলেই এতটা বিকাশ লাভ করিয়া থাকিবে। শেষ কথা : ভাবাদর্শের দিক হইতে ক্ষাত্রধর্মের যে আদর্শ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়—রাজপুতদের কেন, মুসলমানদের মধ্যেও দেখি—তাহা ইউরোপীয় নাইট্‌স্‌দের আদর্শের অপেক্ষা অনেকাংশেই উচ্চতর।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র অবশ্য যোদ্ধশ্রেণীর (ক্ষত্রিয়দের) সৃষ্ট নয়; ভারতের সামাজিক অবস্থাটা উদ্ভূত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে যাহা স্মরণীয় তাহা এই : 'চাকরানা' বা ইউরোপীয় ধরণের মেনোরিয়েল প্রথা এখানকার বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পী কারিগররা গ্রামের প্রয়োজন জোগাইত, গ্রামই তাহাদের পোষণ করিত। একমাত্র শহরে বন্দরে হয়ত রাজশিল্পীরা রাজা বা সামন্তের ভৃত্য ছিল—কেহ একটু সম্মানিত, কিন্তু অধিকাংশেই গণণাযোগ্য নয়।

সাধারণভাবে শিল্পীরাই শিল্পকর্মের ও জীবিকার উপযোগী নিজেদের যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিলেন, এবং কৃষকেরা নিজেদের লাঙল, গোরু প্রভৃতি দ্বারা জমি চাষ করিতেন। ইহাই ফিউডাল 'সার্ফের' অবস্থা—'ভূমিদাস' বলিলেও আসলে ইহারা জমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিত। কারণ, সামন্ত প্রথার মূল কথা হইল এই—উৎপাদকের (কৃষক বা কারিগর যাহাকেই ধরি) সহিত তাহার উর্দ্ধতন অধিকারীর বা মালিকের সম্পর্ক কি কি সামাজিক আর্থিক সত্যের উপর এই পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত। *

---

* "The emphasis...will lie......in the relation between the direct producer (whether he be artisan in some workshop or peasant cultivator on the land) and his immediate superior or overlord and in the socio-economic contents of the obligation which connects them." (Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism).

• "The direct producer is here (i.e. Feudalism) in production of his means of prodution, of the material labour conditions required for the realization of his labour and the production of his mear.; of subsistence.

বলা বাহুল্য, সাধারণ কৃষক বা কারিগরের অবস্থাটা ইহাতে স্লেভ্ বা দাসের মতও নয়, আবার নির্বিত্ত বন্ধনমুক্ত প্রোলিটেরিয়েটের মতও নয়। কতটা শাসক-শক্তি কোন্ শ্রেণীর—যোদ্ধৃ শ্রেণীর অস্ত্র, না পুরোহিত রাজাদের, না কোনো চিরাগত প্রথা ও বিধি-বিধান সেই শক্তির উৎস, —এই কথা গুরুতর হইলেও গৌণ, আসল কথা উৎপাদকদের অবস্থা। এই বিচারে দেখিব যে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কাঠামো ক্ষাত্রশক্তি জোগায় নাই, ব্রাহ্মণশক্তি জোগাইয়াছে,—তাহাদের বর্ণাশ্রমের বাস্তব মতাদর্শ ও ব্যবস্থা দ্বারা; উহার মেরুদণ্ড স্তরবিভক্ত ভূমি-ব্যবস্থা বটে, কিন্তু এই মেরুদণ্ড 'ক্ষুদ্র কৃষক (ও কারিগর) ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর আর্থিক নীতি: এবং উহার ভিত্তিভূমি ভারতের চিরদিনকার বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-নির্ভর পল্লী-সমাজ, উহার কৃষি ও কৃষিশিল্প।

সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে এই ভারতীয় পল্লী-সমাজের পরিবর্তন কতটা হইয়াছে? এই কথা সত্য, ভূমি কোনো দিন গ্রাম্য-সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ছিল না। উহা ছিল পরিবারগত সম্পত্তি: পরে গ্রামপতিরও উদ্দেশ মিলে। পল্লীর স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতাও অনেকাংশেই ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদের গ্রাম্য-সভার কথা মৌর্য যুগেই আর শুনি না; অবশ্য শহরের শ্রেণী বা করপোরেশন তখন প্রভাবশালী। গুপ্তযুগে আসিতে আসিতে দেখি, 'নগর শ্রেষ্ঠী', 'প্রথম সার্থবহ' (বণিক গিল্‌ডের নায়ক), 'প্রথম কুলিক' (শিল্পী গিল্‌ডের নেতা), 'প্রথম কায়স্থ' (লেখ্যকারদের নেতা) প্রভৃতি লইয়া নগরের 'নিগম-সভা' চলে; গ্রামে ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ে দানে 'গ্রামকূট', 'মহামাত্র' (মাতব্বর), 'গ্রামিক' (প্রধান), 'কুটিম্বী'দের (গৃহস্থ কৃষকদের) মতামত ও উপস্থিতি প্রয়োজন; —প্রত্যেক গ্রামের জীবন অনেকটা স্ব-নির্ভর। উত্তরে ও দক্ষিণাপথে (বাংলারও) গ্রাম্য-সভা বা গ্রাম্য-সমিতির এইটুকু ক্ষমতা অনেকদিন স্বীকৃত ছিল, অবশ্য গ্রাম্য ও নগর সভায় অবস্থাপন্নরাই আসন লাভ করিত, নির্বাচিত হইত না। কিন্তু মুসলমান বিজেতারা এই ক্ষমতা

(১৬৭ পৃষ্ঠার পর হইতে) He carries on his agriculture and the rural house industries with it an independent producer, at the sametime, the property-relation must assert itself as a direct relation between rulers & servants that the dirzct producer is not free." (ঐ গ্রন্থে Capital III হইতে উদ্ধৃত)।

আর স্বীকার করেন নাই। তাহার পর হইতে গ্রাম্য সভা নয়, 'জাত পঞ্চায়েত'ই প্রবল হয়। তখনও কিন্তু তাই বলিয়া গ্রাম্য অর্থনীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই;—বাহিরের বাজারে যায় বিলাসপণ্য এবং কৃষক ও পল্লীর শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরস্পরের প্রয়োজন মিটায়। যানবাহন নাই, মুদ্রার প্রচলন সামান্য, গ্রামের উপজ তাই গ্রামেই রহে। তাই ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই আর্থিক শক্তি লইয়া আত্মসন্তুষ্ট গ্রাম্য-সমাজ মোটামুটি শত পরিবর্তনের মধ্যে একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এই স্বরূপ বুঝিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না—কেন এত সুদীর্ঘকাল ইহা স্থায়ী হইতে পারিল। পুনরুক্তি হইলেও তাহা আর একবার স্মরণীয়: প্রথমত স্বাভাবিক কারণ ছিল (ক) নাতিশীতোষ্ণ বায়ুতে ভারতবাসীর জীবনমান সরল ছিল; (খ) উর্বর ভূমির জন্য কৃষি-সমাজের জীবনযুদ্ধ সহজ হইয়াছিল; (গ) বিরাট দেশের সেদিনে জন-সংখ্যা ছিল অল্প; দ্বন্দ্ব বাধিলে নূতন গ্রাম স্থাপনেও বাধা হয় নাই। দ্বিতীয়ত ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ ও জাতিভেদে পরিণত হইয়া শোষিত শ্রেণীকে বিভক্ত ও উদ্যোগহীন করিয়া রাখিতে পারে। তৃতীয়ত, ভারতের এই চিরাগত ভাবাদর্শ, ধর্ম, দর্শন, এমন কি, সাহিত্য, শিল্পনীতি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উদ্যোগ-আয়োজনে বিশেষ সহায়তা দেয় নাই;—চতুর্থত, 'কর্মফলের' ধারণা ও 'অধিকার-ভেদের' ধারণা প্রায় অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রাহ্য হওয়ায় মানুষ যে-কোন দুঃখ দৈন্যকে মানিয়া লওয়াই শ্রেয়: বলিয়া বুঝিয়াছে। আর শেষ কারণ, এই সব বাস্তব ও মানসিক কারণে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে **উৎপাদন-শক্তি এত বৃদ্ধি পায় নাই যে সমাজ-বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়ে।** নতুন গ্রাম গঠন করিয়া কিংবা ব্রাহ্মণের সুচতুর শম-দম-দণ্ড-ভেদ নীতি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব চাপা দিবার অদ্ভুত কৌশল প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া উৎপাদনশক্তি ফাটিয়া বাহির হইবে কৃষিব্যবস্থার বা শিল্পব্যবস্থার **এমন কোনো উপকরণগত পরিবর্তন হয় নাই**—সেই পুরনো সামান্য লাঙল-গরু রহিল সম্বল, সেই পুরনো চাকা কুমারের সর্বস্ব, সেই হাতুড়ীই কামারের উপায়—এবং বন্দরের বণিক, সমৃদ্ধ বণিক শ্রেণী, উপনিবেশের বহির্বাণিজ্য ও আন্তর্বাণিজ্য সত্ত্বেও শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর হয় নাই, কারখানা বসায় নাই,-(হয়ত দাদন দিয়া) শিল্পীদের পণ্যজাত লইয়া ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে

মাত্র, ব্যবসা ও সাউকারী করিয়াছে, শিল্পোদ্যোগে হাত দেয় নাই। মোটামুটি মুদ্রা-যুগ আসে নাই, যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা সামান্য, পল্লী-প্রধান সমাজ নিশ্চল রহিয়াছে।

শ্রেণী সংঘাতের সাক্ষ্য

ইহা দেখিয়া বলা হইতে পারে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীবিরোধের মীমাংসা করিয়াছিল ('জাতিভেদের' ও 'কর্মফলের' ব্যবস্থা দ্বারা ?)। উল্‌টাইয়া কেহ বা বলিবেন—শ্রেণীবিরোধই যে ইতিহাসের মূল সূত্র ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ অবশ্য উপরেই রহিয়াছে—কোনো একটা বিরোধকে দমন বা প্রশমন করিতে পারিলে অবশ্য বিরোধের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। ইহাও সত্য বটে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণপত্র এত কম যে, উহাতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা না পাইলে মোটেই বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ এই যে, যত ভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব চাপা দেওয়া হউক, তাহার সংবাদ তবু এক আধটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মানব সমাজ, ৫ম অধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত *Studies in Indian Social Polity*, Class Struggle in Ancient India, p 9 pf)। বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয় ও যাজক শ্রেণী অন্যদের ক্ষমতা কাড়িয়া নিজেদের শক্তিশালী করিতে থাকে। কিন্তু মল্ল লিচ্ছবী শাক্য প্রভৃতি অভিজাততন্ত্র তবু রাজা বা ব্রাহ্মণকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেয় নাই, যৌধেয় মালব প্রভৃতি গণতন্ত্র গুপ্তযুগ পর্যন্তও টিকিয়াছিল। এদিকে বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এই শাসক শ্রেণীর অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কুমাররা যে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করিলেন, তাহা কোন সামাজিক আর্থিক তাড়নায় ? অবশ্য অনেকাংশে তাহা সেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটা আপোষ মীমাংসা। প্রাচীন ও মধ্য যুগের যে-কোনো সামাজিক দ্বন্দ্বই যে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা দেবতার দ্বন্দ্বরূপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয় তাহা তো জানা কথা। ইহাই মুসলমান আমলের ধর্ম প্রবর্তকদের ও সংস্কারকদেরও সম্বন্ধে সত্য। নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয় রাজাদের পরিবর্তে শূদ্র রাজাদের অভ্যুত্থান ঘটিল কি করিয়া—যদি সেই বিশেষ রাজবংশ ও তার অনুচরগণ বর্ণাশ্রমের নিয়মে উচ্চবর্ণের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ

করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত? আর কোন্ সূত্রে আসিল সুঙ্গ কণ্বদের ব্রাহ্মণ রাজত্ব, ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়া? কিংবা পরবর্তী কালের নিম্নজাতীয় সম্রাটদের অভ্যুদয়? গুপ্তদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ছায়ায় বণিক ও শিল্পী জাতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিই কি অর্থহীন? (অন্ত্যজের 'দেবী' মনসার পূজা প্রচলিত হইবে চাঁদবেণের পূজায়—ব্রাহ্মণের নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, একজন বণিক নেতার? একি পাল রাজত্বের বাঙ্গালী সমাজে বণিক প্রতিপত্তির স্মৃতিচিহ্ন?)। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আপেক্ষিক উদারতা ও শান্তির প্রয়াসকে অবলম্বন করিয়া যে 'শ্রেষ্ঠী বণিকেরা প্রথম অবধিই আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, সমাজের নিম্নশ্রেণীরা আপনাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা লাঘব করিতে চাহিয়াছে, তাহারও আভাস যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শ্রেণীর ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধ্যে শূদ্র শ্রেণীতে স্থান হইল, তাহারও প্রমাণ মিলে। অবশ্য এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের সব চেয়ে ভালো প্রমাণ এই যে, নানা অশ্রুতনামা গোষ্ঠী রাজশক্তিতে পরিণত হইলেই 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া গণ্য হয়, তাহাদের স্বজনগণও সম্ভবত মর্যাদা লাভ করিত। কিন্তু এই সুযোগ লাভে তাহারাই আবার শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বর্জন করে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইহাতে সমাধান হয় না; হয় কোনো নিম্নশ্রেণীর রাজগোষ্ঠীর উন্নতি, সমগ্রভাবে শ্রেণীবিদ্রোহে আসে একটা সাময়িক ব্যর্থতা।

এই কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, এই দীর্ঘকালে সমাজবিপ্লব সাধিত হয় নাই। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই বুঝিয়াছি, উৎপাদনশক্তির তত বিকাশ ঘটে নাই। শুধুমাত্র বিলাস-পণ্যের বাণিজ্য-সূত্রে পল্লী-প্রধান সমাজ পরিবর্তিত হয় না, এমন কি মুদ্রা বিনিময় ও টেক্‌নোলোজিক্যাল উন্নতি যথেষ্ট না হইলে 'বণিকপুঁজি'ও প্রভাবশালী হয় না, আর নির্বিত্ত বা প্রোলিটেরিয়ানের (ভূমিহীন শ্রমসর্বস্ব শ্রমিকের) সৃষ্টি না হইলে আসলে ধনিকতন্ত্রও ধনিকতন্ত্রে উন্নীত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঘটে না তাহা নয়,—শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীবিদ্রোহ এই সামন্ততন্ত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই শ্রেণীসংঘাতের ছাপ তাই রাষ্ট্রে সমাজে কেন সাহিত্যে দর্শনেও লাভ করা যায়—তবে লাভ করা যায় অনেক খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিচার করিলে।

মুসলমান বিজয়

মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হইল। প্রথমপর্ব জুড়িয়া ছিল হিন্দু-সংস্কৃতি—তাহা অবশ্য শেষ হইল না; আসিল দ্বিতীয় পর্ব—এক নূতন শক্তি।

মনে রাখিবার মত কথা এই যে, এই দুই পর্বের মধ্যে জীবনযাত্রার দিক হইতে মৌলিক তফাৎ সামান্য। দুইই একটি প্রধান যুগের রূপভেদ মাত্র, জীবিকা ও জীবিকার উপাদান প্রায় সম্পূর্ণ একই রহিয়াছে; তাহা সেই কৃষি যুগের পরিচিত বস্তু-সম্ভার। উহাতেও যাহা কিছু তফাৎ দেখা যাইবে তাহা সামান্য। কতকাংশে তাহাও এখানকার কৃষি-সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফল, কতকাংশে তাহা নবাগত তুর্ক তাজিক ইরানী মুঘল প্রভৃতি জাতিদের বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক নিজস্ব নিয়মকানুন ও ধারণা, কতকাংশে বা তাহাদেরই গৃহীত মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত আইন কানুন, ক্রিয়া কলাপ, আচার পদ্ধতি—তাহাও আবার অধিকাংশেই আরবীয়, খানিকটা ইরানী। কিন্তু জীবনযাত্রার বাস্তবভিত্তি তখন পরিবর্তিত হয় নাই—এইটুকু ভুলিবার নয়। পরবর্তীকালে যে সামন্ততন্ত্র সমস্ত মুসলমান আমলের প্রধান লক্ষণ হইয়া রহিল, তাহার স্পষ্ট বিকাশ গুপ্তযুগেই দেখা যায়। হর্ষবর্ধনের পর হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের যে সূচনা হয়—তাহাতে ক্রমে রাজপুত জাতির রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় এইরূপ সামন্ততন্ত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান সুলতানরা স্বভাবতই তুর্ক ও ইরানী আফঘান সেনাপতি ও প্রাদেশিক কর্তাদের বড় বড় জায়গীর দিয়া এক নূতন ধরনের সামন্ততন্ত্রের পত্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য পুরাতন হিন্দু রাজারাও অনেক ক্ষেত্রে বশ্যতা স্বীকার করিয়া সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিত, অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া শাসক শ্রেণীতে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করিত। তথাপি রাজ্যের প্রধান সামন্ত, পাত্রমিত্র, সেনাপতি প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই যে তুর্ক কিংবা আফঘান জাতীয় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। এই নূতন সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিভেদ বা পুরাতন হিন্দু শ্রেণীভেদের মূল ভিত্তিই ধ্বসিয়া গেল। কিন্তু মুসলমান সম্রাটদের শাসনকালে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অবসান হইল না, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে

একটা নূতন পর্বের সূচনা হইল। তুর্ক তাজিক প্রভৃতি জাতিরা ভারত-বর্ষের বাহির হইতে যে সামন্তপদ্ধতি বহিয়া আনিল তাহা সুপরিচিত সামন্তপ্রথার অনুরূপ বরং সামন্ততন্ত্রের আরও প্রবল ও আরও সুদৃঢ় রূপমাত্র। ইহারই জন্য এই বিপুল দেশে দিল্লীর সুলতানদের একটু মাত্র কড়া দৃষ্টির অভাব ঘটিলেই তাঁহাদের এই সামন্তরা বিদ্রোহী হইত, নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্যে নিজেরা স্বাধীন হইয়া বসিত। আলাউদ্দীন খিলিজী (১২৯৪—১৩১৬) অবশ্য জায়গীরের পরিবর্তে সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বেশি দিন কার্যকরী হয় নাই। বলা বাহুল্য. আলাউদ্দীন হিন্দু ধনিকবণিক কাহাকেও নিস্তার দিবার কথা নয়, দেনও নাই। নিশ্চয়ই মুসলমান ধর্মের অনুশাসন ছিল তাঁহার প্রধান যুক্তি এবং তুর্কদের ধর্মান্ধতার অপেক্ষাও তাহা ক্রূর নিষ্ঠুর প্রবল ছিল—কিন্তু যুক্তিটা আসলে শোষণ মাত্র; তখন জমির নতুন করিয়া মাপজোঁক হয়, রাজার পাওনা হিন্দু আমলে ছিল সাধারণত একষষ্ঠাংশ, এখন আলাউদ্দীন আদায় করিলেন অর্ধাংশ। "কাহারও ঘরে সোনা রূপা রহিল না……কোনো জিনিসই উদ্বৃত্ত দেখা যায় না।" ইহাতেই বিদ্রোহের মূল কারণ নাকি দূর হয়। অবশ্য খাজনা আদায়ের জন্য তুরুক ঠোকা, কারাদণ্ড হইতে শৃঙ্খলবন্ধন কিছুই আলাউদ্দীন বাদ দিতেন না—অলবররণী তাহাও জানাইয়াছেন।

আলাউদ্দিন শীরীর (দিল্লীর তৎকালীন শহর) নির্মাতা, নূতন সৌধ-হর্ম্যও নির্মাণ করেন, তাঁহার সভাতেই কবি ছিলেন প্রসিদ্ধ আমীর খসরু (যদিও খসরুর হিন্দী পদ হয়ত তাঁহার রচনা নয়, কিংবা কালে কালে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে)। এই ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি অনুরাগের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক থাকার কথা নয়—উহা এক সামন্ত সম্রাটের কঠিন দর্প ও দুর্ধর্ষ স্বেচ্ছাচারিতারই সাক্ষ্য বহন করে। এই কথা সত্য যে, এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যাহারা করিত তাহারাও সামন্তশ্রেণীরই প্রধান, তাহাদের সেই বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত সাধারণ মানুষের ধূমায়িত অসন্তোষ—মহম্মদ তোগলকের (১৩২৫-১৩৫১) সময়েই দিল্লীর এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে (আনুমানিক ১৩৪৯); বাঙলায়, গুজরাটে (পাঠান শিল্প ও স্থাপত্যের বহু কীর্তিই এই সব স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজাদের), সিন্ধুতে বিদ্রোহ দেখা দেয়, দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত (১৩৩৬-১৬৪৬)

হয়, কুলবর্গায় বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৬-১৪৭৪ ও ১৬৭৩) করে হাসান গঙ্গু বাহমনি। অলবররনী বলেন "জনসাধারণও বিদ্রোহ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই, সুলতানও তাহাদের শাস্তি দিতে ক্ষান্ত হন নাই।" হয়ত ইহার মধ্য দিয়াই পুরাতন জমিদার প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত হইতেছিল। অন্তত ফিরোজশাহ্ তোগলোক (১৩৫১-১৩৭১) জায়গীরদারী প্রথাই পুনঃ প্রবর্তন করেন। তুর্ক-পাঠানের রাজত্বশেষে মুঘলরা (১৫২৬ হইতে) রাজা হইয়া বসিলেও এই জায়গীরদারী পদ্ধতি অব্যাহত চলে। (ইহারই মধ্যে অশোকের কাল হইতে পূর্বাপর আমরা যাহা জানি তাহাই দেখি শের সাহের (১৫৪০-১৫৪৫) সময়ে আরও সুনিশ্চিত রূপে)। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র বিরাট দেশের পথঘাট নির্মাণ করে, কূপ খনন করে, সরাই স্থাপন করে, কৃষকের সেচের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে স্বেচ্ছাচারী শাসকদেরও মুখাপেক্ষী করিয়া রাখে—বলা বাহুল্য এই পালন-মূলক মূল কাজ সাধারণ গ্রাম্যসমাজের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। ক্ষুদ্র সামন্তের পক্ষেও কূপ ও পুষ্করিণী খনন মাত্র সম্ভব,—এই কৃষি সমাজের পক্ষে এই দুর্ধর্ষ এবং শোষণধর্মী কেন্দ্রিত রাজ্যগুলিও ছিল তাই বাঞ্ছনীয়। এইখানেই ছিল সাধারণভাবে তাহাদের সার্থকতা, কদাচিৎ যদি অশোক, শের শাহ, আকবরের মত মহৎ রাজা এই রাজ্যের নিয়ন্তা হন, তখন প্রজাসাধারণের পক্ষে তাহা একটা অভাবনীয় সৌভাগ্য—আসলে তাহা প্রায় নিয়মের ব্যতিক্রম (কি হিন্দু, কি মুসলমান যুগে, কিংবা কি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে, কি বাহমনি সাম্রাজ্যে প্রজারা শোষণের পেষণ হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পাইত কদাচিৎ)।

ভারতবর্ষে এই সামন্ত প্রথার অবসান আরম্ভ হয় সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৫-১৬০৫) টোডরমল্লের নূতন জরিপ ও বন্দোবস্তে। আকবর এক কেন্দ্রিত ও সংগঠিত সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হন। জায়গীরদারী প্রথা তিনি বাতিল করিয়া সেনাপতিদের (মনসবদার) ও শাসনকর্তাদের (সিপাহিসালার) বেতন দিতে লাগিলেন। তাহাদের পক্ষে শর্তমত সৈন্য সরবরাহ করা অনেক ক্ষেত্রে আর প্রয়োজন হইল না—সৈন্যবাহিনী সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে আসিল। রাজস্ব যাহারা আদায় করিত তাহারাও জায়গীর হিসাবে উহা রাখিতে পারিত না, আদায় উশুলের ভারই মাত্র তাহাদের উপর ছিল, জমির মালিকানা নয়, কোনো স্বত্ব নয়। কৃষকের সঙ্গে ব্যবস্থা হইত রাজার

—আধুনিক রায়তোয়ারী প্রথার মত। আকবর ফসলের একতৃতীয়াংশ আদায় করিতেন—মুদ্রায় আদায়ও চলিত। কিন্তু স্মরণীয় এই যে, এই ভূমিব্যবস্থা যথার্থভাবে বাঙলায় তখনো প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। আসলে বাঙলাদেশের ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটান মুর্শিদ কুলি খাঁ—বাঙলার পুরাতন জমিদার বংশগুলি (নাটোর, দীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা, প্রভৃতি) তখনকার নবাবী আমলা ও প্রধানদের এই রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ হইতে উদ্ভূত হয়। ইহা রায়তোয়ারী ব্যবস্থা নয়, বরং অনেকটা জমিদারী ব্যবস্থার প্রথম সংস্করণ (দ্রষ্টব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত *History of Bengal*, Vol. II)।

কিন্তু তৎপূর্বেই পাশ্চাত্য দেশে বিরাট উদ্যোগ দেখা দিয়াছে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা ভারতবর্ষে আসন স্থাপন করিতেছে, ইংরেজ ফরাসির অভ্যুদয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ সামন্ত যুগের জীবনে একটা নূতন স্রোত আসিয়া লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই—প্রথমত, ভারতবর্ষের বাণিজ্য এইবার সত্য সত্যই সিংহল, মালয়, লঙ্কা ও ইরাণের উপকূল ছাড়াইয়া বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—salt petre, সুতা, বিশেষত বস্ত্রশিল্পের প্রকাণ্ড চাহিদা এই প্রথম দেশের উৎপাদক শ্রেণীর পক্ষে গোচর হইবার কথা। এতদিন পর্যন্ত শত সত্ত্বেও উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রয়োজন মিটানো, বড় জোর সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহ, বাদশা-বেগমের জন্য বিলাসোপকরণ তৈয়ারী করা (ফিরোজ শাহ হাজার কুড়ি ক্রীতদাস কিনিয়া নানা শিল্পকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন প্রধানত হয়ত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটাইতে)। কিন্তু এই বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য-প্রসারে পণ্য উৎপাদন—'বাজারের জন্য' উৎপাদনও আরম্ভ হয়, (বেশি হইত দাদনে), তবে ইহাদের কুঠিতে ফ্যাক্টরির অনুরূপ উৎপাদন পদ্ধতি গৃহীত হয়। মজুর খাটাইয়া কারখানা চলিত, তাহার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়ত, প্রতি বৎসর বহুলক্ষ টাকার সোনা ও রূপা বিদেশ হইতে এই পণ্য ক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষে আসে,—তাহার বৃহৎ অংশই হয়ত অলঙ্কারে পরিণত হইত। কিন্তু মুদ্রা-চালিত বিনিময়ের (মানি ইকোনমির) যে সূত্রপাত হয় তাহাও স্বীকার্য (দ্রষ্টব্য *History of Bengal*, ঐ)। অর্থাৎ বিদেশের বণিকপুঁজি ক্রমেই সামন্ততন্ত্রের মধ্যে পরিবর্তনের শক্তিসঞ্চার করিতেছিল।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইহাই অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ—উহার প্রথম পর্বেও যেমন, দ্বিতীয় পর্বেও তেমনি সামন্ততন্ত্র প্রবল ছিল। ভারতীয় জীবনযাত্রায় সামন্ততন্ত্রের ভিতরকার অসামঞ্জস্য ইংরেজ অভ্যুদয়ের পূর্বে ফুটিয়া উঠে নাই, জীবনযাত্রার বাস্তব ভিত্তি তখনো সুদৃঢ় ও বিস্তৃত; ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জীবিকা-পদ্ধতিতে তখনো উহার প্রসারের ক্ষেত্র রহিয়াছে। যেমন করিয়া শক, হুন প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব জাতিরা বাহির হইতে আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া প্রায় সেই মধ্য এশিয়ার উষর প্রান্তর হইতেই তাহাদেরই বংশধরগণ তুর্ক, পাঠান মুঘল এবারও আসিল, আর ভারতবর্ষে তাহারাও স্থান করিয়া লইল।

ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিলে পরাজয়টা নূতন নয়, শুধু তাহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতারও ফল নয়, তাহার জীবিকালম্বনের ত্রুটি মাত্রও নয়। তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কৃষির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবিকা-উপায় মানুষের জানা ছিল না—কুসুস্, টায়ার. সিডোন প্রভৃতির বাণিজ্যপুষ্ট প্রাচীন সভ্যতাকে অবহেলা না করিয়াও ইহা বলা যায়। সেই কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের জীবনে তখনো প্রসারের ক্ষেত্র ছিল—তাহারও দেশবিদেশে বাণিজ্য বাড়িতেছিল; ভরকুচ্ছ, তাম্রলিপ্ত ও চোলমণ্ডলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি উহারই পরিপোষকরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল; আর লোকসংখ্যা বাড়িলে নূতন জাতির আবির্ভাবেও সেই জীবনযাত্রায় স্থানাভাব হইত না। বরং ভারতবর্ষের এই সুজলতা ও সুফলতাই ছিল বাহিরের জাতিদের ভারত-আগমনের ও ভারত-আক্রমণের প্রধান কারণ।

এই আক্রমণের হেতু হয়ত আরও আছে। মধ্য এশিয়ার বা দূর দূরান্তরের এই জাতিগুলি প্রায়ই ছিল যাযাবর—যাযাবরের হাতে গৃহস্থ-সভ্যতা অনেক সময়ে মার খায় ও মারা পড়ে, ইহা নূতন কথা নয়। কিন্তু এই যাযাবরের দলও যে কারণে নিজেদের পরিচিত ভূভাগ ছাড়িয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে সেই কারণ অনেক সময়ে বংশবৃদ্ধি; অনেক সময়ে মধ্য এশিয়ার ঐরূপ অন্যান্য দেশের এক-একবার সাময়িকভাবে ভৌগলিক পরিবর্তন। এক-একবার নদী মরিয়া যায়, মরুভূমির তলে গ্রাম নগর চাপা পড়ে, আর পশুচারণের তৃণভূমি শুকাইয়া উঠে—অমনি যাযাবরদল সেই ভূভাগ পরিত্যাগ করে, নিকটবর্তী ভূভাগে চড়াও হয়। এমনি করিয়াই শুরু হয় তাহাদের অভিযান, যেমন ভারতবর্ষে শুধু নয়, ইয়োরোপ-এশিয়ায়

আর্যদের সময় হইতেই তাহা হইয়াছে। শক-হূন-তুর্ক-তাতারের আক্রমণে ভারতবর্ষের মতো পূর্ব-ইয়োরোপও বারবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমান বিজেতাদের আবির্ভাব সেই বৃহত্তর ইতিহাসেরই একটি পরিচ্ছেদ, তাহা মনে রাখা দরকার। উহার পিছনকার ঐতিহাসিক তাগিদটা ভারতের নয়, ভারতের অভ্যন্তরে উৎপাদন-প্রথার সংকটে বা কোনোরূপ অর্থনৈতিক অচল অবস্থার জন্য তাহা জন্মে নাই, জন্মিয়াছিল বরাবরকার মত ভারতের বাহিরে সেই মধ্যএশিয়ায় আর্থিক কারণে, রাষ্ট্রীয় কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত কারণেও।

এবারকার এই বিজেতাদের আবির্ভাবে এই এক নূতনত্ব ছিল—সে নূতনত্ব এই যে তাহাদের এই অভিযানের সঙ্গে মিশিয়াছিল তাহাদের নূতন গৃহীত ধর্মের প্রেরণা। মুসলমান ধর্ম অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের মতোই স্বমতসর্ব্বস্ব এবং পরমতে অবিশ্বাসী। সেমিটিক জাতিদের ইতিহাসে ইহার কারণ দেখা যায়; তাহারা ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কম নিপীড়ন সহ্য করে নাই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত মুসলমান ধর্মের প্রেরণাও তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শতখানেক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারস্য, সিরিয়া, আর্মানীয়া জয় করিয়া মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়া স্পেন পর্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল, পূর্বে অক্ষু নদীর পরপারে বর্তমান তুর্কীস্থান জয় করিয়া উহা চীনের সীমান্তে আসিয়া ঠেকিল, সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিল। মরুভূমির এই ঝড়ের সম্মুখে পূর্বযুগের মিশর ঈরান তো মুহম্মদের মৃত্যুর পরে পঁচিশ বৎসরও টিঁকিয়া রহিল না। এই বিপুল প্রেরণা অবশ্য ইতিহাসে আরব জাতির অভ্যুদয়রূপেও পরিচিত। তাহার সামাজিক ঐতিহাসিক কারণসমূহ সেই সময়কার সেই ভূখণ্ডের জীবনযাত্রার দিক হইতেও পর্যালোচনা করা চলে। তারপর পূর্ব পশ্চিমের বিবিধ সংস্কৃতির সার্থবহ হিসাবে, বণিক হিসাবে, আরব জাতি সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাসের পথকে আলোকিত করিয়া রাখিল,—তাহারও বিচার-বিশ্লেষণ করা শিক্ষাপ্রদ।[১] কিন্তু যাহাদের

১ আরব জগতে বণিক ও বাণিজ্যের যে প্রাধান্য ছিল তাহা এইক্ষেত্রে কম কাজ দেয় নাই। আরব সভ্যতার বাস্তব কারণের ও বস্তুমুখীনতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দ্রষ্টব্য Cambridge Mediaeval History—VolI.

সম্মুখে পৃথিবী দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহারাও সেদিন সিন্ধু জয়ের পরে আর ভারতবর্ষে অগ্রসর হইতে পারিল না। মুসলমান ধর্মের আঘাতে একশত বৎসরে মিশর স্পেন পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িল—অথচ পাঁচশত বৎসরেও ভারতবর্ষে তাহা প্রবেশ-পথ পাইল না। যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় হিন্দুদের অধঃপতনেই মুসলমানেরা এদেশে বিজয়ী হন তাঁহাদের এই কথাটি স্মরণীয় : ইসলাম ঈরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্যএসিয়ার দুর্ধর্ষ জাতিদের উহা স্বধর্ম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা ভারতবর্ষ বিজয়ের পথও পায় নাই। সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিয়াও সেখানেই ঠেকিয়া গিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় যখন লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও য়ূনানী খ্রীষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন করিয়া তুর্ক, তাজিক, উজবেগ জাতিদের উহা নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন ভারতবর্ষেও ইসলামের প্রবেশ ঠেকানো দুঃসাধ্য হইল। কারণ, এই মধ্যএসিয়ার জাতিরা বরাবরই ভারতবর্ষের দুয়ার ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতিরোধ করা যায় নাই। প্রবেশের পরে বারবার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির মধ্যে অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে। স্থান এবারও হইল, কিন্তু এবার তাহারা মিলাইয়া গেল না। কারণ এবার তাহারা এক নূতন গর্বে গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন উগ্র গর্ব আর নাই,—তাহারই নাম ধর্মপ্রাণতা বা ধর্মান্ধতা।

একদিক হইতে বলিতে পারা যায় ভারতীয় জীবনধারায় ও সংস্কৃতি-ধারার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল—এই পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইসলামের আত্ম-সচেতনতার নিকটে। ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় পরাজয় নূতন নয়—সে তো বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে তাহার নিজ শক্তিকে বড় কেন্দ্রিত করিয়া তুলিত না—কৃষিসমাজের পক্ষে তাহা করা সহজও নয়। সেখানকার জীবন পল্লীগত, শক্তি সেখানে সংহত নয়, বিসর্পিত ; নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত হইত না, কেন্দ্রিত হইলেও বেশিক্ষণ টিঁকিত না। ইহার কতকগুলি কারণ ঐতিহাসিক, কতকগুলি ভৌগলিক। যেমন, যেখানে বহুজাতি আসিয়াছে, মিশিয়াছে, বহু ভেদ রহিয়াছে, বিভাগ চলিতেছে, সেখানে বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক, সেখানে 'ঐক্যের' শক্তি দুর্বল,—"এক জাতি, এক দেশ, এক রাষ্ট্র"—এইরূপ কথা উঠিতেই সেখানে পারে না—তাই, হিন্দু ভারতেও তাহা উঠে নাই। অবশ্য রাজারা একরাট্ হইতে চাহিয়াছেন, সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী

হইবার চেষ্টা করিয়াছেন—আর এত বড় দেশে বারেবারেই সেই অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গড়িবার চেষ্টা ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া যেখানে দেশ এত প্রকাণ্ড—রুশিয়াশূন্য ইয়োরোপের প্রায় সমতুল্য—সেখানে এই 'এক দেশ,' 'এক জাতি' কথাটা শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব হয় না। ইউরোপে 'হোলি রোমান এম্পায়ার'ও এক রাষ্ট্রে এমনি বড় এক ভূখণ্ডকে আনিতে পারে নাই,—ভারতবর্ষেও গুপ্ত বা মৌর্য-সম্রাটরাও তাহা পারেন নাই। পরে মুঘল সম্রাটদের চেষ্টা সফল হইল না। ভারতবর্ষের সেই রাষ্ট্রীয় খণ্ডতা তখন স্বাভাবিকই ছিল; তাহার ঐক্য ছিল সামাজিক ও জীবনযাত্রায়। কিন্তু যানবাহনের বর্তমান সুযোগ তখন ছিল না; তাই বিস্তৃত দেশে এই ঐক্যবোধ গভীরতর হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা সহজ কথা—ইহাতে বিজেতার সুবিধা হইয়াছিল। আর এই বিজেতারা দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধবিদ্যায় সত্যই কৌশলী ছিল। কিন্তু পূর্বাপর দেখিলে, সমসাময়িক কালের পট-ভূমিকায় দেখিলে, ইহাকে "ভারতবর্ষের পতনের যুগ" বলা চলে না। কারণ, সামরিক ও রাষ্ট্রীয় পরাজয়ে ভারত-সমাজ পরাজিত হইত না, সে সমাজ আহত হইত। দুইদিনেই সে ক্ষত শুকাইত—সমাজ নূতন রাষ্ট্রশক্তিকে অঙ্গীভূত করিয়া লইত। ক্ষতি দুইদিনেই পূরণ হইয়া যাইত।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরাজয়ই ঘটিল এইবার। তাহার বাস্তব জীবিকাপ্রণালী ও সামাজিক জীবনধারা যথেষ্ট নমনীয় ছিল, উদার প্রশস্ত ছিল। মুসলমানগণ নূতন জীবিকা-উপকরণ দাবী করিল না,—কিন্তু তাহারা এক উগ্র মানসিক ঔদ্ধত্য ও রাষ্ট্রীয় শক্তি লইয়া উহার উপরে বিরাজ করিতে লাগিল। এবার আর বিজেতারা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলাইয়া গেল না।

ইসলামের স্বাতন্ত্র্য

ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল না; তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ 'তত্ত্বের' বেশি পরোয়া করে না, কোনো বিচার বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না! ইস্‌লাম সেমেটিক্ গোষ্ঠীর ধর্ম,—তাহার হিসাবপত্রও সেই গোষ্ঠীর মতোই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুধর্ম বলিতে পারে—'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম'; আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু

দ্বিতীয় কেন—গাছ, পাথর, পশু, মানুষ যে কোন জিনিসকেই দৈবশক্তির আধার বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইস্‌লামে এইরূপ তত্ত্বকথার ও গোঁজামিলের স্থান নাই। তেমনি কোনো তর্কেই ইস্‌লাম মূর্তি-উপাসনাও সহ্য করিবে না। অথচ হিন্দুর জীবনে অনেকখানি জুড়িয়াই সেই মূর্তি, বিগ্রহ, মন্দির। তাহা ছাড়া, ইস্‌লামে এমন পুরোহিত-তন্ত্রের ও জাতিভেদের স্থানও নাই। কিন্তু হিন্দু বলিবে 'তত্ত্বমসি' এবং কার্যক্ষেত্রে সকলকেই অধিকারভেদে স্বতন্ত্র কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই দুই ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলন পূর্বাপরই দুর্ঘট রহিয়াছে। সেই দুর্ঘটত্ব আরও দুস্তর হইয়া রহিল আনুষঙ্গিক কারণে। প্রত্যেক ধর্মেরই জন্ম হয় অনেকাংশে পারিপার্শ্বিকের তাগিদে; অন্তত সেই পরিবেশের ছাপ তাহার নিজস্ব হইয়া যায়। স্থান ও কাল পরিবর্তিত হইলেও সেইগুলি সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। হিন্দুধর্মের পরিবেশ ভারতবর্ষ। তাহা এই ধর্মকে সত্যই "ভারতধর্ম"ও বলা চলে—এই দেশের নদ-নদী, গিরি-পর্বত আহার্য-পানীয় এবং ইহার ইতিহাসের উপলব্ধিই হইল সেই হিন্দুধর্মের দেহ ও প্রাণ। ইস্‌লাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্দ্ধা রাখে। তবু ইস্‌লামের জন্ম আরবে; সে যুগের সে দেশের ছাপ সে অস্বীকার করিবে কিরূপে? সেমিটিক প্রতিবেশীদের প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের ছাপ, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপ সে গ্রহণ করে না। এই কারণেই মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা ভারতে থাকিয়াও ভারতের হইতে পারিলেন না—ভারতের বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন। দিনে পাঁচবার তাঁহারা পশ্চিমে মুখ করিয়া নিজেদের সেই স্বপ্নের 'স্বদেশের' কথা স্মরণ করেন; মক্কা তাঁহাদের প্রাণভূমি, আরব তাঁহাদের ধর্মের জন্মভূমি, তাঁহাদের উত্তরাধিকার সেখানকার আরব্য সমাজের; ধর্মভাষাও তাঁহাদের আরবী; ধর্মনেতৃবর্গ আরব-সন্তান ফকির দরবেশ; সাহিত্য, শিল্প, দার্শনিক চিন্তা পর্যন্ত আরব, পারশ্য, মিশর, সিরিয়ার—ভারতের নয়। তাই ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও ইস্‌লাম নিমজ্জিত হইয়া গেল না। প্রথম দুই এক শতাব্দীতে তাহার গায়ে ভারতের দাগও যেন পড়িল না।

জেতা ও বিজেতার সংযোগ

সাধারণ ভাবে ইস্‌লাম শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে প্রাচীর এই ভাবে রচনা করিয়াছিল তাহাতে মধ্য যুগের এই দ্বিতীয় পর্বে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ও সংমিশ্রণের সুযোগ পায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনক্ষেত্রে ততদিন পর্যন্ত শাসক ও শাসিত তত স্বতন্ত্রও থাকিতে পারে নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, ইস্‌লাম কোনো জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। উহা অন্যকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টানিয়া লয়। তাই ইস্‌লামের বিজাতীয় ও বিজেতা প্রচারকের দল ভারতের জনগণকে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করিল না। হিন্দু সংস্কৃতি রাজা, সামন্ত, রাজসভা হারাইল; স্তব্ধ ক্ষুব্ধ অভিমানে 'ম্লেচ্ছকে' বর্জন করিয়া উহার কাণ্ডারীরা স্বয়ং-সম্পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্যের চর্চা করিতে লাগিল। বিজেতার সংস্কৃতিও দর্পভরে তাহাকে আঘাত করিতেছিল, তথাপি চূর্ণ করিতে পারিল না। হিন্দুর নির্বিরোধ অসহযোগিতা বা 'কমঠ-বৃত্তি' হিন্দু-সংস্কৃতিকে রক্ষা করিল—কোনো দেশে ইস্‌লাম রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া সমাজে ধর্মে এমনভাবে পরাজিত হয় নাই। এই বিরোধ কিন্তু চলিতেছিল সামন্ততন্ত্রের দুই শাসকদলের সংস্কৃতিতে—একদল শাসন-দণ্ড হারাইয়া ক্ষুব্ধ; আর একদল শাসনদণ্ড লাভ করিয়া দর্পিত। কিন্তু দেশের জনসমাজ দুই সংস্কৃতির শাসক দলের নিকটেই প্রায় সমান অপাংক্তেয়—তাহাদের পল্লী-জীবনে মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বড় কোনো সমাজগত পরিবর্তনের তরঙ্গও দেখা দিল না।

ইহার কারণ আমরা জানি, সেই কৃষি-সমাজের জীবন রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত নয়; পল্লীতে পল্লীতে সমাজের নানা সম্পর্কে তাহা বিধৃত ছিল। তাই, মোটামুটি জীবনযাত্রা তাহাদের অব্যাহত চলিল—জিজীয়ার ভারে, কোনো জায়গীরদারের অত্যাচারে মাঝে মাঝে তাহা শুধু প্রপীড়িত হইত। তেমনি আবার বাঙলার মতো কোনো অঞ্চলে সমাজের সেই নিম্নশ্রেণীর কাছে মুসলমান ধর্ম একটা উদ্ধারের পথ হইয়া দাঁড়াইল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়তো হিন্দুর উপর রাগ করিয়া তাহা বরণ করিলই ("শেখ শুভোদয়া" ও নিরঞ্জনের রুষ্মা" দ্রষ্টব্য), ফিরোজ শাহ-এর মতো সম্রাটদের চেষ্টায় হিন্দুরাও অনেকে রজতমূল্যে নিশ্চয়ই ইস্‌লাম কবুল করিয়াছিল। অবশ্য ইস্‌লাম প্রচারকের দল জনগণকে একবারও অবহেলা করে নাই; তাই বলিয়া যে ভারতবর্ষের

এই নূতন মুসলমানেরা খাঁটি ইস্‌লামকেই গ্রহণ করিল তাহা নয়। নামে মাত্রই তাহারা অনেকে মুসলমান হইল। কিন্তু এই ভাবেই একটা সংযোগ স্বদেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপিত হইল। যতই বিজেতা মুসলমান দিল্লী বা জৌনপুর ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল ততই এই জনসমাজ, এই পল্লী-জীবন ও এই জনসংস্কৃতির সঙ্গে তাহাদের সংযোগ বাড়িতে লাগিল। এমন কি উত্তর বাঙলার মত কিংবা চট্টগ্রাম আরাকানের মত সীমান্তক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান শাসকশ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও চলিল—শাসক-শ্রেণী হিসাবে উভয়ই নিজেদের সমশ্রেণীর বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। আবার যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এই যোগ ব্যাপকতর হইতে লাগিল। এবং আকবরের সমকালে পৌঁছিয়া অবশেষে মুসলমান যুগ সত্য সত্যই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল।

যোগাযোগের ফল

এই যোগাযোগের ফলে মুসলমান শাসকসম্প্রদায় ভারত-সভ্যতায় আবার আরও কয়েকটি নূতন জিনিস দান করিল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরে মুসলমান যুগের মধ্যে আমরা মুঘল যুগের দানই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছি। নানা রকমের সম্পদ সৃষ্টি হইতেছিল প্রথম হইতেই। পরবর্তী সময়ে তাহাও নানা ঘটনায় আবার পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার সেই পরবর্তী রূপই হয়ত আমরা পাইয়াছি। যেমন প্রথমত ফারসী ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণে রেখ্‌তা বা দেশী কথার উদ্ভব হইল, ইহাই উর্দুরও আদিরূপ। হিন্দু রাজাদের রাজকার্যে ইহার প্রাধান্য বরাবর রহিল। দ্বিতীয়ত, দূরদূরান্তের বিজেতার দল দেশীয় কথায় দেশীয় কাহিনী ও দেশীয় কাব্যগান শুনিতেন—সেখানে রেখ্‌তা কিংবা ফারসী জবান কে বুঝিবে? ইহাদের আসরে তাই দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল; ভারতবাসীর সাহিত্য-সৃষ্টি আর প্রধানত 'দেবভাষায়' আবদ্ধ রহিল না। এইভাবে বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুষ্টিলাভ করিল—ইহার প্রমাণ লস্কর পরাগল খাঁ ও ছুটিখাঁর মহাভারত লেখানো। বস্তুত হুসেনশাহের সভাতে বাংলা কাব্যের জন্ম; বাংলার আমলা মুনসি প্রভৃতি ফারসি জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের তাহা জন্মক্ষণ।

তাহার পরে আসে আকবরের পরবর্তী মুঘল যুগ, এবং চৈতন্য যুগ ও বৈষ্ণব-যুগ। এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দীতে আমরা পাই মালিক মহম্মদ জৈসীর "পদুমাবৎ", কবীরের দোহাবলী, আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস। মুঘলযুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকরূপ লাভ করিয়াছে। তৃতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমান সংযোগের প্রধান বাধা যেমন ছিল ধর্ম, তেমনি ধর্মের দিক হইতেও সেই বাধা যেভাবে অপসারিত হইতেছিল তাহাও এক প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিস। বিজয়ীর ধর্মের স্বভাবতই প্রাধান্য থাকে। নানাভাবে ইস্‌লামও সাধারণ জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর ইহাও আমরা জানি যে, এই নূতন ইস্‌লামকেও জনসাধারণ স্বভাবতই তাহাদের পূর্ব পরিচিত জিনিসের আধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল—নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লা, বৌদ্ধ দেবতারা হইতেছিলেন মুসলমান পীর, স্তূপ হইতেছিল দরগা, পুরাতন দেবলীলার কাহিনী নূতন পীরের কেচ্ছায় পরিণত হইতেছিল ; এসব আমরা বুঝিয়াছি। ইহাই ছিল ভারতীয় ইসলামের একটা জনগ্রাহ্যরূপ (popular form)। কিন্তু ইস্‌লামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি আর এক নূতন রূপও পরিগ্রহ করিল। তাহাই রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়া এক ভারতীয় রূপ ও বেশ লাভ করিল, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চস্তরের চিন্তার সহিত এইভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ফেলিল। মোল্লা ও ব্রাহ্মণের, দুইএরই বিরুদ্ধে ইহা এক বিদ্রোহ। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সমাজে, পারস্যে, এমন কি তুরস্কে এক অধ্যাত্ম প্রেমভক্তিবাদের বান ডাকে। হয়ত সেযুগের কৃষিসমাজ ও সেই সংঘাতক্লিষ্ট সামন্ততন্ত্রের মধ্যে মানব-প্রয়াস, মানব-মনীষা ও মানব-আবেগ বাস্তব ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রকাশের সহজ পথ পাইতেছিল না। তাই তাহা এক অবাস্তব, অতীন্দ্রিয় 'অধ্যাত্ম' রসে ও অধ্যাত্ম সাধনায় আপনার পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছিল। ইউরোপেও সে যুগে খ্রীষ্টান্ মিষ্টিকের অভাব ছিল না ; ঈরানের সুফীবাদ গোঁড়া ইস্‌লামের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া রূপে রসে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষেও হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের মধ্যে তেমনি এক 'অধ্যাত্ম' সাধনা দেখা দিয়াছিল। মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই ঈরানের সুফীবাদ তাহাকেও পুষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় সাধকদের প্রধান দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য : একদিকে প্রবল অধ্যাত্ম-বোধ, অন্যদিকে তেমনি প্রবল মানব-সাম্যের

ধারণা। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনস্বীরা মানুষের মৌলিক একত্বের সন্ধান পাইতেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছিলেন "সেই এক"-কে, বাস্তব-ক্ষেত্রের এই বিভিন্নতা যাঁহার অখণ্ডতাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইহার লৌকিক বাহন একদিকে ছিলেন কবীর, দাদু, নানক ও চৈতন্যের অনুবর্তী সাধকগণ; অন্যদিকে সমাজ-ছাড়া আউল বাউলের দল, ফকির দরবেশের সমাজহীন সম্প্রদায়; আর একেবারে উপরে, সুফী ও অনুরূপ মতাবলম্বী সুধীগণ, যাঁহাদের মধ্যে সম্রাট আকবর ও হতভাগ্য রাজকুমার দারা শুকোরও নাম করিতে হয়।

ইহা ছাড়াও লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কত ভাবে জমা হইতেছিল, তাহার ঠিকানা নাই। যেমন, হিন্দুরাজ্য ও রাজকর্ম-চারীর শাসন বিচার সবই ধীরে ধীরে মুসলমানরূপ গ্রহণ করিল। কৃষি-সমাজের পরিবর্তন হইল না বটে, কিন্তু তাহার সামন্ততন্ত্র জায়গীরদারীরূপে ক্রমপরিস্ফুট হইল। আর প্রথম দিকে জমিজমার বন্দোবস্ত, খাজনার হিসাবপত্র সবই অনেকটা পুরাতন ধারায় চলিল, কিন্তু চলিল মুসলমান কায়দায় ও ফারসী ভাষায়। বলাবাহুল্য—ভারতীয় মুস্‌লিম সংস্কৃতির রূপ এই ভূমি-ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হয়। উহাতে তাহা মৌলিক কোনো পরিবর্তন সাধন করে নাই। অথচ জীবনযাত্রায় তাই বলিয়া কি মুস্‌লিম সংস্কৃতির দান কম? শহরে বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে মুস্‌লিম দান বাড়িয়া উঠিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর কেতাবের কদর বাড়িল। খানাপিনায় নূতন বিলাসিতা দেখা দিল; মুস্‌লিম হকিম ও মুসাফিরেরা সমাদৃত হইল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরের মুসলমান যুগে—মধ্যযুগের এই দ্বিতীয়ার্ধে—এই সব লৌকিক পরিবর্তন ছাড়াও ভারতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনাও পরোক্ষভাবে জন্মাইতেছিল।

ঐক্য চেতনা

সংক্ষেপে মনে রাখিতে পারি:—প্রথমত, এই বাহিরের ধর্ম ও বাহিরের শাসকদলের চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে এই সময়ে বৃহত্তর জগতের আদানপ্রদান পুনঃস্থাপিত হইল (*Mughal Administration*, J. N. Sarkar, দ্রষ্টব্য)। ইহার দ্বারপথ পূর্ব উপকূলে নয়। ইহার দ্বারপথ ছিল

প্রধানত উত্তর পশ্চিমে, এবং পশ্চিম, এবং পশ্চিম সিন্ধুর উপকূলে। তাহা ছাড়া, এই বিজেতাদের দল অন্তত উত্তর ভারতে অনেকাংশ জুড়িয়া কতক পরিমাণে শান্তিও স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী যুগের রাষ্ট্র-কেন্দ্র-হীন ভারতীয় সমাজের উপর ইঁহারা স্থাপিত করেন নিজেদের এক শাসনব্যবস্থা। মুসলিম রাজ্যের উজীর, কাজী, মুন্সী প্রভৃতি আমাদের নাম ও পদবী, এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই দেশীয় শাসনের ধারা হইয়া উঠে,—হিন্দু রাজ্যেও তাহা গৃহীত হয়। ঠিক ঐরূপে রাজ-পুরুষদের ও অভিজাতদের আদব-কায়দা, খেতাব-খেলাৎ, উর্দি-কুর্তা প্রভৃতিও মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী সকলেই লাভ করিল—উহা আজও ভারতে হিন্দু মুসলমান সকলকার দরবারী পোষাক এবং কায়দা কানুন। এই দুই দিকেই ইঁহারা ভারতীয় ঐক্যের রূপকে তাই পুষ্ট করিয়া তোলেন। আর ইঁহাদের তৃতীয় দান—যুদ্ধবিদ্যায় নূতন কৌশল ও নূতন পরিকল্পনা,—যুদ্ধবিদ্যার এই জ্ঞানের অভাবেও ভারতীয়গণ এই বিদেশীদের নিকট বারবার পরাজিত হইত।

এই কৃষি-সমাজে মুসলমানগণের দান ছিল প্রধানত কারু-শিল্পে ও সওদাগরী কাজের উন্নতিতে। একদিকে শাল, কিংখাব, কার্পেট, মসলিন প্রভৃতি, অন্যদিকে নানারূপ অলঙ্কার, মিনার কাজ, বিদ্‌রির কাজ প্রভৃতিও তখন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনেক সময়েই মুসলমান কারু-শিল্পীর হাতে গড়িয়া উঠে। (দ্রষ্টব্য *India through the Ages*, J. N. Sarkar) মধ্যযুগের কারুকলার চরম নিদর্শন হিসাবে সেযুগের পৃথিবীতে এই সব কাজের তুলনা মিলে না। ইহাতে অবশ্যই জীবন-যাত্রার মৌলিক ভিত্তি পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু জীবনযাত্রার ঊর্ধ্ব শ্রেণীতে, শাসক শ্রেণীতে যে আহার-বিহার ও সাজ-সজ্জায় একটা রুচিবিকাশ ঘটিতেছে, তাহা বুঝা যায়। তেমনিতর রুচির উন্নতি তখনকার ভেনিসের, কিংবা লণ্ডনের, কিংবা ওলন্দাজ ধনী ব্যবসায়ী ও নাগরিকদলও দাবী করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

অবশ্য এই উন্নতি অনেকাংশেই জনগণের জীবনযাত্রা বা রুচির সহিত সম্পর্ক রাখিত না। প্রথম দিককার ভাষা, শিল্পকলা, সবই ছিল ঈরানী ও তুরানী, মধ্য এশিয়ার ও চীনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।[১] পরবর্তীকালে

১ ভারতীয় মুসলমানের ধর্মজীবনে ছাড়া আরবীয় প্রভাব যাহা আসিয়াছে, প্রধানত তাহা আসিয়াছে ঈরানের মারফৎ। আরব নাবিক মালাবার উপকূলে, যবদ্বীপে, মালয়ে

ক্রমশই ভারতীয় জীবনের ও শিল্পধারার সহিত মুসলমানী জীবনযাত্রার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবরের সময়েই এই ধারা প্রবল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মধ্যযুগের চরম সৃষ্টি ফুটিয়া উঠে নানা সৌধে, শিল্পে, চিত্রকলায়। এমন কি তানসেনের প্রেরণার ফলে সঙ্গীতে পর্যন্ত মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। বিপুল মুঘল স্থাপত্যের বিস্ময়কর ইতিহাস এখনো মুছিয়া যায় নাই, ভারতীয় সঙ্গীতের সেই ধারাও লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী-কালে যখন এই শিল্পকলা আবার দরবারেই সীমাবদ্ধ হইতে চলিল, তখন উহার সেই প্রশস্ততা ও সজীবতা নষ্ট হইয়া গেল। তখনকার মুঘলশিল্পের সূক্ষ্ম ও বিলাসী দিকটাই বাড়িয়া চলিল। সেই সূক্ষ্ম নিপুণতা, অলঙ্করণ, রঙের ও রেখার সুচিক্কণ নমনীয়তা তবু অপরূপ রূপদান করিয়াছে মুঘল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি (miniature) গুলিকে। আর সেই মুঘল শিল্পেরই অন্যদিকে একটা শেষ পরিণতি দেখি লক্ষ্ণৌর স্থাপত্যে ও সঙ্গীতে খেয়ালে ঠুম্‌রিতে।

কিন্তু এই সব শিল্পনিদর্শন হইতেই একদিকে যেমন উহার সূক্ষ্মতা সুস্পষ্ট, তেমনি অন্য দিকে সুস্পষ্ট এই কথা যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা হইতে ইহার রসজ্ঞ সমাজ আবার অনেক অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন, জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহারা আর বিচরণ করিতে পারিতেছেন না।

শ্রেণী বিরোধ

এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শোষিতের সহিত শোষক শ্রেণীর সংঘর্ষ যে বহু বহু বার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য। প্রধানত এই সংঘর্ষ সাধারণভাবে পূর্বাপর রূপ গ্রহণ করিয়াছে—প্রথমত কোনো হিন্দু রাজার (যেমন শিবাজী) নেতৃত্বে শোষিত (হিন্দু) সাধারণের বিদ্রোহরূপে। দ্বিতীয়ত নিশ্চয়ই বহুক্ষেত্রে মুসলমান সামন্তও এই জনতার নেতৃত্ব বা মুখপাত্র হিসাবেই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইত। মধ্যযুগের

সর্বত্র রাজ্য ও ব্যবসা ফাঁদিতেছিল। চট্টগ্রামেও কিছু কিছু আসিয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের উপকূলে—চট্টগ্রামের দিকেও—তাহাদের তেমন অধিক সংখ্যায় আগমনের বা ব্যবসাপত্র চালাইবার সঠিক প্রমাণ কতটা পাওয়া যায়? বাঙালী মুসলমানের জীবন-যাত্রায় যে 'আরবীয়' প্রভাব দেখা যায় তাহা ধর্মসূত্রেই প্রাপ্ত আর বিশেষ করিয়া পর-বর্তী কালে প্রাপ্ত; উহা জাতিসূত্রে অর্থাৎ আরবীয়দের সঙ্গে পরিচয়ে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় না।

অধিকাংশ সংঘাতই ধর্মের আবরণ গ্রহণ করিবে তাহা আবার বলা নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগের বহু সামন্ত-বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত এক মূক জনতা—যাহারা তখনো নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই। বিশেষত, বণিকশক্তি তখনো মোটেই আত্মসচেতন নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রাণের আসল বিদ্রোহ রূপ লাভ করিয়াছে তখনকার অধ্যাত্ম-বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে—কবীরের, নানকের, চৈতন্যের এবং শত শত মরমীয়া সাধকের সংঘে ও গোষ্ঠী গঠনে। ইহাদের সাধনায়, সংঘে ব্যক্তি-মন স্বাধীনতা পাইয়াছে। দুর্বলও পৃথিবীতে এক-আধটুকু স্বস্তি না পাইয়াছে তাহা নয়। সেদিনের গণকর্মীদের পক্ষে ইহার বেশি কিছু করা ছিল স্বপ্নাতীত। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে অবশ্য মারাঠা রাজপুত, শিখ পতনাকী প্রভৃতি প্রধান বিদ্রোহীরা নিজেরাই রাজশক্তিরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অত্যাচারও তাহারা অপরের উপর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু ইহাদের অভ্যুত্থানের পশ্চাতে যে সামন্ত তন্ত্রেরই অভ্যন্তরে নিষ্পেষিত জন-সমাজের বিদ্রোহই শক্তি জোগাইয়াছে তাই বলিয়া তাহা বিস্মৃত হইবারর কারণ নাই।

যুগান্ত

এই শাসকশ্রেণীর হাত হইতেও যখন রাজদণ্ড খসিয়া পড়িল জনগণ তাহাতে চমকিত হইল না; ভারতবর্ষও তাই আর একবার বিজেতার নিকটে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই, সে বিজয়ী আর রাজা নয়, একটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; আর রাজ্যও সে হস্তগত করিল তাহার বাণিজ্যের প্রয়োজনে। সমাগত ব্রিটিশ রাজত্বের এই প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল—ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে যে সব আগন্তুক শাসকদল আসিয়াছে তাহাদের সহিত এইখানে এই নবাগতদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে; পৃথিবীতে বণিগ্‌রাজের দিন আসিয়াছে, সামন্তযুগ শেষ হইয়াছে। এই সঙ্গেই স্মরণীয় এই কথা—ইহার পূর্বেও মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে সম্রাট আকবর বা আওরংজীব পর্যন্ত অনেকেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। নানা কারণে তাঁহাদের চেষ্টা বারে বারে নিষ্ফল হইয়াছে। ব্রিটেন ভারতবর্ষে একটা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে এই

সাম্রাজ্যের একটা গুণগত পার্থক্য আছে। তাহারাও শাসন করিত, জনসমাজকে শোষণ করিত ; ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীও তাহা করে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী যুগের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ছিল সামন্ততন্ত্র, এখনকার 'সাম্রাজ্যবাদ' বণিকতন্ত্রের উগ্ররূপ। এই কারণেই তখনকার সাম্রাজ্য 'দেশীয়' হইয়া উঠিত, 'নেশন' গড়িবার পথেও সহায়ক হইত ; এখনকার সাম্রাজ্যবাদ এদেশকে 'উপনিবেশ' মনে করে, নিজের শোষণের দায়েই এখানে 'নেশন' গড়িতে দেয় না, ঐক্যের চেষ্টা ব্যাহত করে।

সমাগত বণিগ্‌যুগের তরঙ্গাঘাতে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ক্ষয় হইয়া গেল। কিন্তু ক্ষয়ের জন্য নিজের অভ্যন্তরেই ভারতের সমাজও ততদিন প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্র যে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতে ছিল তাঁহাদের হাত তখন কাঁপিতেছে। সেই হাত হইতেই সেই রাজ্য টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। সুবায় সুবায় ক্ষুদ্র শাসকের দল তাহারই টুকরা লইয়া নবাবী নিজামতের খেলা খেলিতেছে। মারাঠার শক্তি লুণ্ঠনে দস্যুতায় আপনার রাষ্ট্রীয় সুযোগ বিনষ্ট করিতেছে। — আর জনগণ এই দুর্যোগের দিনে "সিং গর্দী, শাহ গর্দী, ভাউ গর্দীর" দৌরাত্ম্যে বারে বারে ত্রস্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে কোথায় ছিল দেশীয় বণিক জগৎশেঠ উমিচাঁদের স্বস্তি ? কোথায় ছিল দেশীয় অভিজাত রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির নিশ্চিন্ততা ? কোথায় বা ছিল এই রাজা-উজীর ও শেঠ প্রভৃতি রাষ্ট্র-শাসকগণের সততা বা আত্মপ্রত্যয় বা শ্রেণীগত স্বার্থবোধ ?

মুঘল রাজত্বও জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, মারাঠা রাজত্বও জনগনের দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। উভয়েরই ভরসা ছিল এই আমীর ওমরাহ ও সুবাদার জায়গীরদারের দল, তাহাদের আদায়ী খাজনা, তাহাদের পোষিত ফৌজ। যখন দেখি, এই শাসকের দল যে কোনো উপায়ে নিজ নিজ লাভ লইয়া ব্যস্ত, যে কোনো কর্মচারী ঘুষের বশ, ফৌজের বেতন রহে বাকী, আর সকলের বিশৃঙ্খলার চাপ গিয়া পড়ে অসহায় রায়তের উপরে, নিরুপায় কারিগরের উপরে, তখন বুঝি এই রাষ্ট্রের আর কোনো আশাই নাই (*India through the Ages, J. Sarkar.*)

সপ্তদশ শতাব্দের শেষ দিক হইতে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দ ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল। শাসকশ্রেণীর এই অধোগতি পূর্বেও ঘটিয়াছে, নূতন শাসকের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ বণিকের মতো

তাহারা কোনো শ্রেণীবিপ্লবের ফল নয়, মূলত কোনো নূতন ব্যবস্থাও তাহারা প্রবর্তন করে নাই। ভারতের কৃষি-সভ্যতা, তাহার পল্লী-রূপ, তাহার গৃহ-শিল্প প্রভৃতি পূর্বে অটুট ছিল; সহজ ভাবেই এই কৃষি-সমাজ বরাবর প্রসারিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসিল:

"All the civil war, revolutions, conquest, famines, strangely complex, rapid and destructive as the successive action in Hindustan may appear, did not go deeper than surface. England has broken down the entire framework of Indian society, without any symptoms of reconstruction yet (1853) appearing. This loss of his old world, with no gain of a new one, imparts a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindu and separates Hindustan ruled by Britain, from all its ancient traditions, and from the whole of its past history." (Marx in *N. Y. Daily Tribune*, June 25, 1538.)।

মধ্যযুগের সেই যুগান্ত সূচিত হইল—প্রথমত, ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তনে, জমিদারী ও রায়তোয়ারী প্রথার প্রবর্তনে। ইহাতে পুরানো সামন্তশ্রেণী লোপ পাইল, নূতন এক জমিদার তালুকদাদের দল সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয়ত শাসনকার্য হইতে গোড়ার দিকে দেশীয় শাসকশ্রেণীকে বর্জন করা হয়। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ বাণিজ্যের অবাধ প্রসারের জন্য আবার ভারতীয় গৃহশিল্পের ধ্বংস সাধিত হয়। ফলে সুতাকাটা, তাঁতবোনা লোপ পাইল, এতদিনকার পল্লীসমাজ যেরূপ সুস্থ, সম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল ছিল, উহা আর সেইরূপ রহিল না। পুরাতন সামন্তগণ নাই; পুরাতন পল্লীসমাজ ভাঙিয়া যাইতেছে, পুরাতন আর্থিক কাঠামো টুকরা টুকরা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তখন আপনারই অজ্ঞাতে নূতন শক্তিও সেই সমাজে সঞ্চারিত হইল—রাজকার্যের প্রয়োজনে ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; বিলাতের মালে বাজার ভরিয়া উঠিল; আর শেষে রেল, টেলিগ্রাফ, ষ্টীম শিপ প্রভৃতির যোগে ভারতবর্ষের এই আধুনিক যুগ আসিয়া গেল। বিলাতি মালের প্রয়োজনে চাই যানবাহন, যানবাহনের প্রয়োজনে চাই কয়লা, কয়লার পরেই লোহা। তখন আবার দেখা দিল কল-কারখানা,—আর বিদেশীয় পুঁজির মালিকানা।

এইরূপে ভারতের সুদীর্ঘ মধ্যযুগ এবার যুগান্তের মুখে আসিয়া ঠেকিল। এই যুগান্তের সন্ধ্যা বাঙলা দেশেই প্রথম ঘনাইয়া উঠে; বাঙলা দেশের মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ ক্রমশ প্রকাশলাভ করে, আর 'বাঙালার কাল্‌চার'ই, সেই বণিগ্‌রাজের বাস্তব ও ভাবগত প্রেরণার প্রধান প্রমাণ, নিদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান রূপের—তাহার রূপান্তরের ও রূপহীনতার।

গ্রন্থপঞ্জী

বৌদ্ধজাতক, অর্থশাস্ত্র (Tr. Ed. R. Shama Sastry).
অশোক অনুশাসন।
হিউএন সং (য়ুয়ান চাং) এর ভ্রমণ কাহিনী (Ed. Watters).
অল বেরুণীর ভারত বৃত্তান্ত প্রভৃতি।
A History of Indian Literature, M. Winternitz.
India and a New Civilization, Dr. Rajani Kanta Das.
A Short Cultural History of India, H. G. Rawlinson.
Indian Social Polity, Bhupendra Nath Dutt ; (ঐ ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি)
The Economic History, of Ancient India, S. K. Das.
Hindu Polity, K. P. Jayaswal.
History of Mediaeval India, C. V. Vaidya.
History of Bengal, Vol. I Ed., R. C. Majumder.
History of Aurangzib, J. N. Sarker.
Influences of Islam on Indian Culture, Tarachand.
Cambridge History of India.
রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'মানব সমাজ,' 'দর্শন দিগদর্শন' ও 'ভোলগাসে গঙ্গা'।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা—আধুনিক রূপ

বাঙলার কাল্‌চার—উপনিবেশিক সংস্কৃতি

"বাঙলার কাল্‌চার" কি ? সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়াছিলেন : "বাঙলার কাল্‌চার ? একটা কড়া পাকের সন্দেশ ও একটা ভালো পাকের পেড়া দাও দিকিনি কোনো তামিলকে ; খেয়ে বল্‌লেন, 'বোথা আর ইকুয়েলি সুইট্টা', দুইই সমান মিষ্টি। ঠিক কথাই,—অনেক কালের কাল্‌চার থাকলে বোঝা যায় সব মিষ্টিই এক নয়।" রসজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়ের মতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশও সায় দিবে,—বাঙলার কাল্‌চারের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধি আর কিছু নয়—রসগোল্লা ও সন্দেশ।

পৃথিবীতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া নাম রাখিতে পারা কম কথা নয়, ইতরজনেরা অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখে—এমনি দেখা যাইতেছে অধ্যাপকেরাও কেহ কেহ তৃপ্ত হন। কিন্তু নানা অধ্যাপকের নানা মত। শিল্পকলার অধ্যাপক শাহিদ সুরহাবর্দি বিলাতে নাকি তাঁহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেন : "বাঙলার বৈশিষ্ট্য ? পৃথিবীতে যা আর কারুর নেই—তার নাম আড্ডা"। —মনে হয়, এমন সত্য কথা আর কখনো বলা হয় নাই। ক্লাব, পার্টি, সভা-সমিতি, ব্যবসাপত্র—সবই আমাদের ঢিলে-ঢালা—আড্ডা না হইলে চলে না। কিন্তু জানি, অধ্যাপকেরা একমত নহে। নাম করিতে সাহস করি না, আর একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন : "বাঙলার বাইরে 'ভদ্রলোক' নেই—এ্যারিষ্টোক্র্যাসি আছে, আর আছে 'কিসান' ; কিন্তু এমন 'ভদ্রলোকের সমাজ' দেখেছ মেড়ো পাঞ্জাবীর দেশে ?"

তিনি একবারে মুঘল যুগের পূর্ব হইতে প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইবেন ; দেখাইবেন,—'সদ্-বৌদ্ধ-করণ-কায়স্থ-ঠাকুর' মহাশয়েরা কেমন করিয়া মানসিংহ, তোডরমল, মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রভৃতিদের যুদ্ধে হিম-সিম খাওয়াইয়াছেন, জমাবন্দির হিসাবপত্রে সকলকে সর্ষে ফুল দেখাইয়াছেন, অবশেষে ক্লাইভ-হেষ্টিংস্-এর দিনে রাজ্যে-বাণিজ্যেও আপনাদের আসন পাকা করিয়া লইয়াছেন।

এই দাবীতে অবশ্য ইতিহাস কতটা সায় দিবে তাহা জানি না। তবে

আমরা সবাই স্বীকার করিব যে,—বাঙলা দেশের বাহিরে 'ভদ্রলোক' নাই। 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বারে বারে, অবাঙালীদের না পারিলেও, আমাদের মনে করাইয়া দেয়—আমরাই অবাঙালীর দেশে মশাল জ্বালিয়াছি, আর আমাদের সাহিত্য আছে।

এই সত্যটা কিন্তু কাহারও উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। দেশী অধ্যাপকেরা যা'ন, একজন ইংরেজ অধ্যাপকও বলিয়াছেন: "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংরেজী ছাড়া আর একটিমাত্র ভাষায় এপর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে ভাষা বাঙলা।" সমাজের নূতন সংস্করণ কমনওয়েল্‌থ্‌ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য।

ভাষা ও সাহিত্য অবশ্যই মানস-সংস্কৃতির প্রধান বাহন। কিন্তু সাহিত্যই কাল্‌চারের এক বা অদ্বিতীয় মানদণ্ডও নয়। এবং সকল জাতির মানস-সম্পদের প্রকাশও সাহিত্যে হয় না। কাহারও বা সে জীবন রূপ লাভ করে কাব্যে-সাহিত্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে-গানে, কাহারও শিল্পে-চারু-কলায়, আবার কাহারও বা অপূর্ব কারু-নৈপুণ্যে। মোটামুটি ভাবে তবু কথাটা গ্রহণ করা যায় যে, যে জাতির সত্যই একটা সাহিত্য আছে সে কাল্‌চার অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অথবা ভারতবর্ষে বাঙালীর যদি এই দাবী থাকে, তবে সেই দাবী তুলিবেনা কেন?

একটা তর্ক উঠিতে পারে—'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে'র কথাটা আর না পাড়িলেই বা ক্ষতি কি? আর সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কি বাঙলা ভাষায়ই সাহিত্য রচিত হইয়াছে? অন্য ভাষায় হয় নাই? হিন্দীর সাহিত্য-সংসার সুবিশাল; উর্দুর জগৎ সুমার্জিত ও সুসংস্কৃত; মারাঠীর সাহিত্য সুদৃঢ় ও সবল; গুজরাতীর সাহিত্যও সচেতন। ইহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে পাঁচশত হইতে হাজার বৎসরের ইতিহাস। শুধু বাঙলার কথা বলিয়া লাভ কি?

কিন্তু কি হিসেবে কথাটা বলা হইয়াছে সে হিসাব মিথ্যা নয়—সত্যই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সহিত ঐ সব সাহিত্যের তুলনা হয় না। এই হিসাবে ছাড়াও আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বাঙালার সাহিত্যকে মোটের উপর মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সেই মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপটিও নিরূপণ করা চলে; দেখিতে পাই—ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কি রূপান্তর ঘটিল; সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে অর্ধ সামন্তের যুগে—পরাধীন

জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে—ভারতীয় সংস্কৃতি কোন্ পরিণতি লাভ করিয়াছে; বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দুনিয়াব্যাপী গণ-বিপ্লবের পরিবেশে ডোমিনিয়নী কালচারের গতি কোন্ মুখে?

এই হিসাবেই বাঙলার কাল্‌চার একবার বুঝিয়া দেখিবার মতো—সন্দেশ রসগোল্লা হইতে একেবারে কলিকাতার চায়ের দোকানের 'ডবল ডিমের মাম্‌লেট' পর্যন্ত সব কিছুই এই কাল্‌চারের পরিচয় দেয়। কারণ, বাঙলায় শুধু এই যুগে সাহিত্যই জন্মে নাই, আরও অন্যান্য জিনিসেরও উদ্ভব হইয়াছে।

এই যুগে বাঙালী একটা নূতন চিত্রকলা আবিষ্কার করিয়াছে, নূতন নৃত্যকলার উদ্বোধন করিয়াছে, এক নূতন সঙ্গীত-শৈলী রচনা করিয়াছে। বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে তাহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাঙলার এই নবজাগরণ রূপ লাভ করিয়াছে ধর্মান্দোলনে, সমাজসংস্কারে; আর শেষে বাঙালীর সেই আবেগময় প্রেরণা জন্ম দিয়াছে প্রবলতম বিপ্লবী প্রয়াসকে। বাঙলার কালচারের সর্বাপেক্ষা মহৎ সৃষ্টি মানসক্ষেত্রে সাহিত্য; কর্মক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলন। জীবনে এত ঐশ্বর্য আর ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি দাবী করিতে পারে কি?

"ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ" মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায় এই "বাঙালীর কাল্‌চারে।"

বাঙলার সংস্কৃতি

বাঙালীর এই 'কাল্‌চার' অবশ্য আধুনিক কালের জিনিস—এত অভিনব যে ইহাকে "বাঙলার সংস্কৃতি" বলিতে যেন বাধে। "বাঙলার কৃষ্টি" বলিয়াও ইহার অনুবাদ করিতে পারি না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারা বাঙলা দেশেও বহিয়া আসিতেছিল—এখনও মৃতপ্রায় বহিতেছে, একেবারে থামিয়া যায় নাই—বাঙলার কাল্‌চার যেন এই আধুনিক কালে (ইংরেজ আমলে) তাহার সহিত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, আর তাহা খুঁজিয়াও পায় না। অন্যদিকে 'কৃষ্টি' বলিতে আমরা যদি উহার মূলগত কৃষ্ ধাতু ও কৃষির উপর জোর দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি—'বাঙলার কাল্‌চার' কৃষি বা কৃষকের সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না—ইহা বাবুদের জিনিস, "বাবু কাল্‌চার"। এই জন্যই আমরা 'বাঙলার কাল্‌চার' বলিলেই

বুঝি ভদ্রলোকের জিনিস; এই কথা মনে মনে বুঝি বলিয়াই বলি, অন্য প্রদেশে 'ভদ্রলোক' নাই।

"বাঙলার কাল্চার" নূতন জিনিস, "বাঙলার সংস্কৃতি" কিন্তু বহুদিনের। আমাদের যে সাহিত্য, যে সঙ্গীত, যে নৃত্যকলা ও শিল্পকলা লইয়া আমাদের এই যুগের গর্ব—এমন কি যে "ভদ্রলোক" শ্রেণী লইয়া আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সমস্যা—তাহার জন্ম বেশি দিন হয় নাই। সে জন্মিয়াছে ইংরেজের বাঙলা জয়ের পর, সাম্রাজ্যবাদের আওতায়, প্রায় ইংরেজের তৈয়ারী কলিকাতা শহরে। কিন্তু "বাঙলার সংস্কৃতি"—বাঙলার মাটি, বাঙলার জল ও বাঙালার জন-জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে (দ্রষ্টব্য *History of Bengal*, Vol I, Dacca University)।

প্রায় হাজার বৎসর আগে "পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল।" তাহার পূর্বেকার ও পরেকার কাহিনী আমাদের জানাই আছে—তাহা ভারতীয় ইতিহাসের বড় জোর একটি গর্ভাঙ্ক মাত্র। অবশ্য পাল যুগে মোটামুটি বাঙালী নিজের একটা স্থান সেই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন সংস্কৃতে তাহার "গৌড়ী রীতি" গৃহীত হইল; তাহার ধীমন ও বীতপাল নূতন মূর্তি-শিল্পের প্রচলন করিল; বৌদ্ধগুরুদের হাতে মহাযান নূতন রূপ পাইল এবং সিদ্ধাচার্যরা দেশীয় ভাষায় গান রচনা করিয়া গেলেন (চর্যাপদ)। এইরূপে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা ভাষার জন্ম হইল। সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল বাঙালী জাতি। তারপর মধ্যযুগে তুর্কীবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের দিনে বাঙলার সংস্কৃতি ক্রমেই সেই ভাষার ভিত্তিতে আপনার রূপ আবিষ্কার করিতে লাগিল। বাঙলার সংস্কৃতির সেই মধ্যরূপও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনুচ্ছেদমাত্র—তখনও কৃষি-সমাজের সুদীর্ঘ মধ্যাহ্ন। তাই বাঙলায়ও তখন দেখা যায়—তেমনি সুযোগ ও সমন্বয়, সেই আউলিয়া, বাউল, সুফী, দরবেশ ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়া দল, সেই মুসলমান শাসক, ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ধর্মপ্রচার, বৈষ্ণব মহাজনদের চেষ্টায় বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ, আর তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচনা মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণব প্রেরণায় সেই সংস্কৃতিতে একটা প্রবল স্রোত বহিয়া যায়—বাঙলা সাহিত্য, বাঙলা জীবনযাত্রা একটা নিজস্বতা লাভ করে।

প্রধানত ইহার কেন্দ্র ছিল পল্লী। "বাঙলার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্যজীবনকে অবলম্বন করিয়াই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।" প্রাচীন ভারতে নগর ও নাগরিক রীতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ কম পাই না (বিশেষত বাৎস্যায়নে বা বা মৃচ্ছকটিকাদির মত সাহিত্যে); কিন্তু ভারতীয় সমাজ যে মুখ্যত ছিল পল্লীসমাজ, তাহা আমরা জানি। বাঙলী সমাজের সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিকতর সত্য—এই দেশে নগর বা রাজধানী বলিয়া যাহা সচরাচর উল্লেখিত হইয়াছে আসলে তাহা গ্রামেরই চিহ্নিত (হয়ত বা কল্পিত) সংস্করণ। ভারতীয় প্রধান প্রধান জীবনকেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইয়া বলিয়া এই গ্রাম্যসভ্যতা নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে আরও বেশি নিজের ধারায় নিজের নিয়মে নিজ নিজ বিচিত্র ও বহুবিস্তৃত আচার বিচার চিন্তা ধারণা লইয়া চলিতে পারিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য "মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিন্দুযুগের অবসানের পরে বাঙালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথমে কাটাইয়া নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল।" কিন্তু তখনো একদিকে ঢাকা মুর্শিদাবাদের মুসলমান দরবার, অন্য দিকে বিষ্ণুপুরের রাজসভা—ইহার বাহিরে মধ্যযুগের সেই মার্জিত সংস্কৃতির অনুশীলনের নিদর্শনই বা বেশি আমরা পাই কোথায়? (দ্রষ্টব্য *History of Bengal*, Vol II, Dacca University)।

প্রায় এক হাজার বৎসর হইল বাঙলা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ঐ সময়ে ভারতীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষাও জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। তাই ভারতীয় এই সব জাতিদের সংস্কৃতির (হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতির) নিজস্ব জীবনও প্রায় হাজার বৎসরের, তাহার পূর্বে তাহারা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির জঠরে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া। কাজেই জন্মিল যখন তখন বাঙালী সংস্কৃতি, মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি জন্মিল এতদিনকার (প্রাক্-মুসলিম্) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া—বাঙালী সংস্কৃতি উহার মগধ-মণ্ডলের রূপ ও ঐতিহ্যের বিশেষভাবে অংশীদার হয়; তাহার সঙ্গে অন্য বড় অংশীদার অবশ্য ছিল মৈথিল, আর প্রায় সেই সময়েই (১০০০, ১২০০ শতকের) পৃথক হইয়া অংশীদার হইয়া উঠিল ওড়িয়া, এবং একটু পরেই (চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই) অসমিয়া প্রভৃতি বাঙলা ভাষার নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির আদি যুগে (আনুমানিক খ্রীঃ ১,০০০-১,২০০ শতক) ও মধ্য যুগে (সাধারণ ভাবে মুসলমান আমলে) মোটামুটি এই সংস্কৃতির যে

ভিত্তি ও যে গঠন ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা সূত্রেই আমরা তাহার পরিচয় লইয়াছি—শুধু পূর্বপ্রত্যন্তবাসী বলিয়া বাঙলার অধিবাসীরা ছিল উত্তর ভারতের বা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে আরও বিচ্ছিন্ন, ঐ সব সংস্কৃতি দ্বারা ক্রম-প্রভাবিত, এবং ঐ সব উন্নাসিক শাসক ও শাস্ত্রকারদের চক্ষে (বেদ ও আরণ্যকের যুগ হইতেই) একটু অবজ্ঞাত ; আচার-বিচারে শিথিল, ধ্যান-ধারণায় 'পাষণ্ডী' (heretic), ভাষায় সৃষ্টিতেও হয়ত অনিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্র সংগঠনেও কেন্দ্রানুগ নয়,—বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র প্রভৃতি বিবিধ অঞ্চলে অনেকাংশে স্বতন্ত্র, আবার উহারই মধ্যে আদিম বা অতি প্রাচীন ঔপজাতিক (tribal) কৌম-বন্ধন ও রাষ্ট্র-বন্ধনের অথবা ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, শ্রেণীভেদের মধ্যে একেবারে তলাইয়া যায় নাই—ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের সমাজ চাপিয়া বসিয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা (যেমন কর্ণাটাগত সেনেরা) উহার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে ; কৈবর্ত, বাগদী, ডোম, ও ব্যাধ, নিষাদ জাতিরা বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তুচ্ছ নয়। বাঙলার কাল্‌চারকে বুঝিবার জন্য তাই বাঙলারও আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, মোটামুটি উৎপাদন-শক্তির ও উৎপাদন-পদ্ধতির কোনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই ; তাই উৎপাদন-সম্পর্কেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লব ঘটে নাই ; ঘটিয়াছে রাজা-রাজ্যের পতন-অভ্যুত্থান, শাসক-শ্রেণীর কোনো এক বংশের পতন, ও তাহার পরিবর্তে অন্য এক বংশের উত্থান। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া এখানে তাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে অব্যাহত রহিয়াছে "ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারা"—উহার প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিই মুসলমান আমলে আরও সুদৃঢ় হয়। আকবরের পরে (জাহাঙ্গীরের সময়ে) সেই জায়গীরদারী প্রথা বিলোপের চেষ্টা হয়, তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যবিস্তারে ক্রমে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূলক বিনিময়ের (money economy) প্রসার ঘটিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বণিগ্‌যুগের প্রথম সূচনা হয় ; সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল একদিকে তাহার সামন্ত, অন্যদিকে বণিক-ব্যাঙ্কারদের (ক্লাইভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ) চক্রান্ত।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকাল এখানে যে সামন্ততন্ত্র চলে তাহার রূপ কি ? ভারতের

অন্য প্রদেশের অপেক্ষাও বাঙলাতে অধিক ছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য-জীবন, তাহার স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবন, সেই ভারতীয় কৃষিপ্রধান সমাজ, গ্রামের কারিগর, বৃত্তিধারীদের গ্রামের শস্যে জীবনযাপন; গ্রামের তন্তুবায়, কুম্ভকার, রজক, নাপিতের কাজে গ্রামের অভাব পূরণ; কৃষি-সমাজে ভূমির অধিকার ও উহার তারতম্য দিয়া সামন্তকালীন পীঠিকা-(status) নির্ণয়—ভূমিহীন কারিগর, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির শূদ্র অনাচরণীয় জাতিতে (caste) পরিণতি; দখলী স্বত্ববান্ কৃষকদের 'আচরণীয়' (তুলনীয় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত; ধোবা ও চাষা ধোবা) নবশাঁখ জাতিতে স্থানলাভ; উচ্চবর্ণের জাতিদের সামন্ত ভৌমিকত্ব ভোগ, আর ভূমির সর্ব স্বামিত্ব রাজার একচেটিয়া অধিকার। ইহার পরিবর্তন ঘটে নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়াছে বিরোধ।

তৃতীয়ত, এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে শ্রেণী-বিপ্লব না ঘটিলেও শ্রেণী-সংঘাত ছিল, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে আপোষের মধ্য দিয়া, সংস্কারের মধ্য দিয়া। সেই শ্রেণীবিরোধের প্রমাণ রহিয়াছে কোথাও অর্ধপ্রকাশিত কোথাও প্রচ্ছন্ন। প্রধানত সেই শ্রেণী-বিরোধ (ক) মধ্যযুগের সাধারণ নিয়মে রূপ লইত ধর্ম বা সম্প্রদায়গত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা বিরোধের আড়ালে (বৌদ্ধ ও হিন্দু, কিংবা বৈষ্ণব ও শাক্ত, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতির মধ্যে এই মূলসূত্র লক্ষ্য করা যায়)। (খ) ধর্মমত ও দেবদেবীর পূজা লইয়া এই শ্রেণীবিরোধ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, যেমন, ধর্মমতের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীর পৌরাণিক অবতারবাদ (রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি) ও সাধারণ শ্রেণীর লৌকিক গুরুবাদ ('নাথ গুরু'দের হইতে একেবারে আউল-বাউলের ও কর্তাভজাদের গুরু-বাদ পর্যন্ত) এবং নির্বাণ ও মুক্তির আদর্শেও লৌকিক মহাসুখবাদ; এবং বৈদিক যজ্ঞ ও সংস্কারকর্ম এবং লৌকিক পূজা ও তন্ত্র (বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, শৈব, সহজিয়া ও শাক্ত তন্ত্র পর্যন্ত) ইহার মধ্যে রহিয়াছে মতাদর্শের বিরোধ। এই বিরোধের মধ্যখানে একটা আপোষপথ বৈষ্ণব অবতারবাদ ও গুরুবাদ এবং বৈষ্ণব সদাচার, দয়িত সম্পর্ক, পরকীয়া তত্ত্ব ও সাধনা নির্মাণ করে। আবার অন্যদিকে দেবদেবীর ব্যাপারে সাধারণ লোক পৌরাণিক দেবদেবীদের গ্রহণ করিলেও গ্রহণ করিল নিজেদের শ্রেণীজীবন ও ধারণা অনুযায়ী (ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ ও ধামালির

শ্রীকৃষ্ণ; পৌরাণিক শিব ও চাষী শিব ও গাজনের শিব; চণ্ডী ও বনদেবী চণ্ডী; দুর্গা ও অন্নপূর্ণা); কখনো বা লৌকিক দেবদেবীরা উচ্চ দেবদেবীর বিরোধ সত্ত্বেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেন (যেমন মনসা), কখনো বিনা বাধায় তাহারা প্রতিষ্ঠিত হয় (যেমন, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, কিংবা ধুন বা কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুর)। (গ) ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেষ সৃষ্টি যে-জাতিভেদ (caste) সেই জাতিগত (caste) দ্বন্দ্ব, বৈষম্য, প্রভৃতির আকারে শ্রেণীসংঘাতই আসলে রূপলাভ করিয়াছে (বিশেষতঃ সেন রাজত্বে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি ও সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বেণে বা বৈশ্য সমাজের—সম্ভবত সদ্ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ বলিয়া,—অধোনয়ন প্রভৃতি স্মরণীয়)। সেকালের বিরোধ বৈষম্যরই ফলে বাঙলায় বৌদ্ধ নাই এবং মুসলমান এত সংখ্যাধিক্য এবং বৈষ্ণবধর্ম এত বিস্তৃত।

বাঙলার এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ধারা হইতে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বিশ্লেষণ করিলে যাহা মনে জাগে তাহা এই—

প্রথমত, যে-বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচলন দশম শতাব্দীতেও দেখি—সে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাঙলায় মধ্যযুগে কোথায় লুপ্ত হইল?

মোটামুটি ভাবে মৌর্য যুগ হইতে বাঙলা দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতি-স্থাপন আরম্ভ হয়, সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন, বৌদ্ধ ও (বৈষ্ণব) শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার প্রমাণ হইতে বুঝি এই সব ধর্ম কত প্রসারিত; পাল ও সেনরা বাঙলায় সেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় (গৌড়ীরীতি, পাল-সেন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি) সুদৃঢ় করে। কিন্তু তথাপি বিজিত সাধারণ বাঙালী জনসমাজ সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার-নিয়ম সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া লইতে পারে নাই; তাহারা তাহাদের আদিম তন্ত্রমন্ত্র, যোগ প্রক্রিয়া, লৌকিক দেবদেবী, ছাড়ে নাই। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা বাঙলাদেশ মহাযানী তন্ত্রের (বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতির) ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের (ইঁহারা অনেকেই ছিলেন হাড়ি, ডোম, জেলে) প্রধান কেন্দ্র হয়—লৌকিক ভাষায় (বাঙলায়) ধর্ম প্রচার এই সিদ্ধাদেরই কীর্তি,—ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নয়। এই বাঙলা রচনাই ইহাদের একটা বিদ্রোহের প্রমাণ। বলা কর্তব্য, এই লৌকিক ধারা, তন্ত্রের মূলস্থিত এই গুহ্যসাধন ও যোগ প্রক্রিয়া হয়ত মৌর্য যুগের পূর্ব হইতেই আদিম জনসমাজের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল—যদিও শাস্ত্রকাররা তাহাকে মানিত না; এবং এই লৌকিক ধারাই সিদ্ধাদের বৌদ্ধতন্ত্র ও

শৈবতন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের তন্ত্রাচারের (বামাচার, সহজিয়া) মধ্য দিয়া সহজিয়া, আউল-বাউল, (দেহতত্ত্ব, কর্তাভজা, নানা ভজন) প্রভৃতি ও রামপ্রসাদের কালী কীর্তনে আসিয়া পৌছিয়াছে—চর্যাপদ হইতে বাউলের গান, দেহতত্ত্বের গান, সুফী মারফতি গান, গীতি কবিতার ঐতিহ্য এবং লৌকিক সঙ্গীত ও লৌকিক কাব্যের এক বিশিষ্ট এবং সরস ধারা। বৈষ্ণব "পদাবলী" এই ধারারই লৌকিক রস ও ভাগবত মধুর রসে মিশাইয়া এক অপরূপ সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে—কীর্তন রূপে এক সংগীত শৈলীও দান করিয়াছে—বাঙলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বিবর্তন মানস-সম্পদের দিক হইতে এই ভাবে ঘটিয়াছে।

বাস্তবপক্ষে বৌদ্ধ জাতিগুলি সেন যুগে অপমানিত ও অধিকার-বঞ্চিত হইয়া মুসলমান বিজয়ের পরে সহজেই মুসলমান হয় (নিরঞ্জনের 'রুষ্মা' ইহারই আভাস); যাহারা তাহার পরেও বৌদ্ধ ছিল তাহারা নিত্যানন্দ ও গোস্বামীদের প্রয়াসে 'নেড়া-নেড়ী' রূপে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ত মুসলমান রাজশক্তির বিজয়লাভে হিন্দু শাসক শ্রেণী যে দেড় শত দুই শত বৎসরের মত (খ্রীঃ ১২০০ - খ্রীঃ ১৪০০) মুহ্যমান হইয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে 'বাস্তুত্যাগী' হইয়া পুঁথিপত্র, ধনজন লইয়া নেপালে ও বঙ্গে আশ্রয় লয় এবং নিম্নস্তরের মত উচ্চ স্তরেরও কিছু কিছু তখন বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু বা বৌদ্ধ নিম্নবর্ণের পক্ষে ধর্মান্তর গ্রহণে অবশ্য শুধু জাতিগত (caste) পীঠিকা (status) ভাঙিয়া ফেলা চলিল, কিন্তু সামন্ত সমাজের শোষণ তাই বলিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিল না; উচ্চস্তরের পক্ষে অবশ্য শাসক-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইতে হইতে দেখি—শাসক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের শ্রেণীগত নৈকট্য ও শোষক স্বার্থের ঐক্য বুঝিয়া লইয়াছে—পুরাতন হিন্দু শাসক শ্রেণী তখন মুসলমান সুলতান ও তাঁহাদের শাসকশ্রেণীর সহিত বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছে—ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, না করিলেও হিন্দু শাসকশ্রেণী অনেকাংশে আবার শাসকশ্রেণী রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। গণেশ ও যদুর (সম্ভবত মুসলমান শাসকশ্রেণীর সমর্থনের জন্যই 'জালালুদ্দিন' হন) পূর্বের সেনাপতি রায় রাজাধর, আচার্য বৃহস্পতি মিশ্র প্রভৃতিকে আমরা আমরা দেখিতে পাই মুসলমান গৌড়েশ্বরের সহকারীরূপে; সনাতন-রূপ

(ব্রাহ্মণ), মালাধর বসু 'গুণরাজ খাঁ', লস্কর রামচন্দ্র খাঁ (কায়স্থ), মহাকবি দমোদর (বৈদ্য), কুলধর শুভরাজ খাঁ (বণিক)—প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। হোসেন শাহ ও নসরত শাহের সুশাসনকালে (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে) এই হিন্দু-মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহযোগ সুনিশ্চিত হইয়া যায় —কর্মচারী ও ভৌমিক "ভদ্রলোক" সমাজের বিকাশ চলিতে থাকে। আর উহারই আওতায় একদিকে মুসলমান শাসকদের প্রয়োজনে আর অন্যদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের স্বধর্মরক্ষার চেষ্টায় বাঙলা ভাষার পৌরাণিক কাব্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণকথা ও মঙ্গল-কাব্য প্রভৃতি) রচিত হইতে থাকে—সামন্ত রাজাদের সভায়ও কোচবিহারে, রোসাঙ্গে, ভুলুয়ায়, পরাগল খাঁ'র সভায় এই বাঙলা রচনার ধারা উৎসাহ পাইতে থাকে—বলিতে গেলে মধ্য যুগের বাঙলার ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিরও এক প্রধান পরিচয় বাঙলা রচনায়, উহারই অন্য পরিচয় সংস্কৃতচর্চায়—নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতির পণ্ডিত সমাজে; বিশেষত মিথিলা হইতে ন্যায়চর্চা বিজিত করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে 'নব্যনায়ের' আসন প্রতিষ্ঠায়, রঘুনন্দন প্রভৃতির নূতন স্মৃতি প্রণয়ণে; ব্রাহ্মণ্যবাদী ভদ্র সমাজ মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই—মুসলমান ধর্ম হইতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদকে রক্ষা করিতে লাগিল।

অবশ্য মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় এই সব শাস্ত্রে নয়,—নব্য ন্যায়েও নয়, বৈষ্ণব শাস্ত্রেও নয়,—সেই পরিচয় বৈষ্ণব আন্দোলনে,—বিশেষ করিয়া বাঙলায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে, পদাবলীতে, জীবনী গ্রন্থে, এবং বাঙালী হিন্দু সমাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের নূতন করিয়া সংগঠনে—বৌদ্ধ জাতিচ্যুত নেড়ানেড়ীদের দীক্ষা দান, নিপীড়িত সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সসম্মানে স্থান লাভ; ও প্রবীর প্রতাপ রুদ্র ও বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীরের রাজ্যে বৈষ্ণব জীবন-চর্যার প্রতিষ্ঠা—ইহার মধ্য দিয়া যে সত্য স্পষ্ট হয় তাহা এই যে, হোসেন শাহ নসরৎ শাহের রাজত্বে আপেক্ষিক স্বস্তি লাভ করিয়া বাঙালী পণ্ডিত ও অভিজাত গোষ্ঠী এক ভক্তি-প্রধান ও রস-প্রধান আন্দোলনে সমাজের আপামর সাধারণকে 'কোল' দিতে চাহিলেন—এটি বুদ্ধদেবের মত সংস্কারবাদী (অরাজনৈতিক) প্রয়াস—এক বাহু রাজা ও অভিজাতের দিকে আর বাহু লোক-জীবনে প্রসারিত; ইহারই অনুরূপ একটি সংস্কারবাদী প্রয়াস

করেন তন্ত্রাচার্যরা—সেই লোকসমাজের আদিম তন্ত্রচারকে খানিকটা শোধন করিয়া, খানিকটা বৈদিক আগম-নিগম ও পৌরাণিক দেবতা শিব ও শক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া।

চতুর্থত, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও সাধারণ পল্লীজীবী বাঙালী মুসলমান শরিয়তি ইস্‌লামকে গ্রহণ করিতে থাকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে। তৎপূর্বে শরিয়তি জীবনযাত্রা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, একমাত্র শহর ও রাজধানীর নিকটস্থ মুসলমানদের উপর, দূর পল্লীগ্রামের জনতার উপর নয়। কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমান ধর্মের জাতিভেদহীন বিরাট আবেদন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করে নাই, তাহা নয়।—কবীর নানকের মত চৈতন্যেরও চেতনায় উহা নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবার মুসলমান বৈষ্ণব কবি পদাবলীও লিখিয়াছেন। এবং মুসলমান সূফী ধর্মের আলোকে বাঙলার লৌকিক রস-প্রধান সাধনা যে নূতন কাব্য-সম্পদ (মারফতি গান, মরশেদি গান) লাভ করিল তাহাও স্মরণীয়। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের প্রধান এক ফল আরব্য রম্যন্যাস ও ফারসী (জিনপরী প্রভৃতির) কল্পনা-কাহিনীর প্রসার; অন্য প্রধান লাভ ঐহিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধে কাব্যচেতনা। মুসলমান কবি দেবতার গান গাহেন না,—শুধু জিনপরীর কথা বা জঙ্গনামাও তাহার গান নয়,—তাহার গান মানুষের কথা—পদ্মাবতীর (আলাওলের), লোরচন্দ্রানীর (দৌলত কাজীর) আর অনেকাংশে এই মানবীয় চেতনাই 'ময়মনসিংহ গাথার' মত গাথা-সাহিত্যের ধারাকেও পুষ্ট করে। বলা বাহুল্য, লৌকিক কাব্যেরই একটি ধারা এই গাথার মধ্যে প্রবাহিত—আর বাঙলা সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকার' তুলনা নাই। 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', রামায়ণ ও মহাভারতের চিরনূতন কাহিনী, কবিকঙ্কণের চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতা, এবং পরম মধুর বৈষ্ণব পদাবলী ও ভাব-গম্ভীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত', শেষে রামপ্রসাদের ও কলানিপুণ ভারতচন্দ্রের কাব্য—উচ্চ গোষ্ঠীর ন্যায় ও স্মৃতি আর সংস্কৃতি, কাব্য রচনা কিংবা পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য প্রচার,—ইহা কম নয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনে হয়, আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতি বড় বৈচিত্র্যহীন,—এক ঘেয়ে,—প্রায়ই বিষয়বস্তু এক; রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কিংবা চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা। প্রায়ই কাব্যকলা বৈশিষ্ট্যহীন, নিরর্থক পদ মিলানো, অধিকাংশ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। বলা বাহুল্য, এই বৈচিত্র্যহীনতা

ও একঘেয়েমি বাঙলার সমতল ক্ষেত্রের প্রতিলিপি নয়। (শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহারই আভাস একস্থলে দেখিয়াছেন), উহা অতি-দীর্ঘায়িত সামন্ত যুগের মন্থরতার প্রতিলিপি ও অতি-বিচ্ছিন্ন এক পল্লী-প্রধান কৃষি-সভ্যতার বর্ণহীনতার প্রতিচ্ছবি। আর ইহার মধ্যেও যাহা প্রধান কীর্তি, তাহা লৌকিক প্রেরণার,—ও লৌকিক সংযোগে প্রবুদ্ধ এক সংস্কারপন্থী লৌকিক ধর্মান্দোলনের।

কিন্তু যে বাঙালী সংস্কৃতি এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ক্রমশ নানাদিকে বিকশিত হইয়াছে, সেই পল্লীপ্রধান বাঙালী সংস্কৃতি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এখনো তাহা লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমরা তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া ভাবিতেও যেন কুণ্ঠিত হই। কিন্তু তথাপি দুই এক জন সংস্কৃতির সন্ধানী বাস্তবদৃষ্টিতে উহার এই রূপ দেখিতে অগ্রসর হন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি অবশ্য মোটেই বস্তুবাদী নহেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ; সেই হিসাবেই তাঁহার বিবরণ বস্তুবাদীর পক্ষে আরও মূল্যবান্। তাঁহার কথিত বাঙালার সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শনীটি তাই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—আদি ও মধ্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতিকে আমরা কি কি সৃষ্টিতে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে এখনো দেখিতে পাই, ইহা হইতে তাহা সংক্ষেপে জানিতে পারি।

বাঙলার লোক-সংস্কৃতির রূপ

"[১] বাঙলার বাস্তব সভ্যতা—বাঙলার খড়ের চালের কুটীর, পূর্ববঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ; ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটী, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল); ইটের মন্দির; পোড়ামাটির ভাস্কর্য—ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)—ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা—পুথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্যপ্রকারের খাঁটি বাঙালী চিত্র-পদ্ধতি, যথা পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরায় ছবি আঁকা—ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত ; মাটীর ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র আঁকা, মাটীর সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে ; রঙ্গীন মাটীর পুতুল, কাঠের পুতুল, গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প—জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেনা।

দাঁইহাট কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তিশিল্প ও অন্য ভাস্কর্য ; মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাঁতের কাজ—মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙলার হাতীর দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্যন্ত পঁহুছিয়াছে) ; বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙলায় সোলার কাজ—খেলনা, ঠাকুরের সাজ, ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন ঢাকার রূপার তারের কাজ (filgree work) ; কলিকাতার রূপার নকাশীতোলা কাজ (repousse work) ; কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলঙ্কারশিল্প, এতে বিলাতী ধরণের মীনার কাজ—এগুলির প্রভাব বাঙলার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙলার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ-খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরণের বাসন, দাঁইহাট কাটোয়ার, বলপাস বর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের নানাস্থানের পিতলের বাসন ; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি ঢালাই, শাসপুর কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ।

বাঙলার খাদ্যদ্রব্য—বাঙলাদেশের বিশিষ্ট শাকশুক্তানি ঘণ্ট প্রভৃতি, নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তরকারী ; বাঙলার বিশেষত পূর্ব-বঙ্গের মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি , বাঙলার কাসুন্দী, ছড়াতেঁতুল, আচার, খেজুরে গুড়, পাটালী, মুড়ী, মুড়কী, চালের গুড়া নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা

পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী মিষ্টান্ন, বাঙলার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানাপ্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা।

বাঙলার পরিধেয়—মিহি মলমল, ঢাকার জামদানী (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও শাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর, বীরভূম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম, রাজশাহীর মটকা; বীরভূম তাঁতিপাড়ার কড়িধার তসর; বিষ্ণুপুরের রেশম—কেটে, চেলী, নকশাদার ও বুটিদার সাড়ী; অধুনা বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালুচরের সাড়ী; হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল; অধুনা প্রচলিত বাঙলার ছাপা রেশমের সাড়ী।

মেদিনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর; কুমিল্লা, নওয়াখালি ও শ্রীহট্টের শীতল পাটি; বাঙলার নিজস্ব কৃষি-শিল্প—নানাপ্রকারের ধান, পান, পাট; বাঙলার মাছের চাষ।

বাঙলার নৌ শিল্প—বিভিন্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌ শিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত); বীরভূমের বুহিতাল এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

[২] বাঙলার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি—বাঙলার সামাজিক বিধি ও ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙলার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি—দায়ভাগ; বাঙলার সামাজিকতা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি এবং জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও মিত্রসম্মেলনের বিশেষ রীতি; বাঙলার পূজা, —দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ এবং বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকাব্রত; পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী, পৌষপার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা আঁকা, কাঁথা সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙলার লাঠিখেলা ও অন্য ক্রীড়া-কসরৎ; রায়বেঁশে নাচ; পূজার সময় ঢাকী-ঢুলীদের নাচ; পূর্ববঙ্গের আরতি নৃত্য; মেয়েদের ব্রতনৃত্য; অন্য নানাপ্রকারের নৃত্য

বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ্-মাদারের অনুষ্ঠান; ও নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

[৩] বাঙলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—টোল চতুষ্পাঠী; বাঙলার সংস্কৃত বিদ্যা—জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীর্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙলার আধ্যাত্মিক পদ; বৌদ্ধ চর্যাপদ; বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত; ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলী সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ, শাক্তপদ— রাম প্রসাদ; রামায়ণ মহাভারতের বাঙলা রূপ; দেশে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান—বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা, লাউসেন কথা (অধুনা কম প্রচলিত); পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা; বাঙলার কথকতা; কীর্তন গান—কীর্তনের অভিব্যক্তি,—গড়েরহাটি বা গরাণহাটি, মনোহরশাহী, রাণীহাটি প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও ভাটিয়াল গান; বাঙলার শ্লোক-পড়ার সুর? কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রাম্যগীতি; পাঁচালী, বাঙলার যাত্রা, জারিগান; মুসলমান মারফতী গান, মর্সিয়া গান; বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান পুথিপড়ার সুর, বাঙলার পয়ার। পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দীগানের বাঙলায় প্রচার—বাঙলার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, ঢপ, খেমটা।

বাঙলার সাহিত্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী সাহিত্য, প্রাচীন বাঙালীর কাব্যাবলী (মঙ্গল কাব্য) ইত্যাদি; ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ, বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু—গীতি-কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া ইংরাজদের আগমন পর্যন্ত বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।" ("জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৩৯-৪৩)।

এই হিসাব সর্বাংশে সম্পূর্ণ না হোক, মোটামুটি বেশ বিশদ। কিন্তু লক্ষ্য করিবার মত কথা এই যে, ইহাতে মানস-সম্পদের উল্লেখ আছে,

পণ্যেরও উল্লেখ আছে; উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন প্রথার, সমাজ-সংস্থানের। তাই এই সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের সহায়ে আমরা কিছুটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু সর্বাংশে বুঝিতে পারি না।

সংস্কৃতি বনাম 'কাল্চার'

তথাপি অবশ্য বুঝি, যাহাকে আজ আমরা 'বাঙলার কাল্চার' বলি তাহা নিশ্চয়ই এইসব জিনিস লইয়া নয়। সেই 'কাল্চারের' দৃষ্টিতে বাঙলার এই জীবনযাত্রা মনে হইবে 'সেকেলে' এবং 'পাড়াগেঁয়ে' তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মনে রাখা দরকার—বাঙালী আধুনিক যুগেও গ্রামেই থাকে। শতকরা ৯১'৫ জন বাঙালী গ্রামবাসী; বাঙালীর অপেক্ষা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের (বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রদেশগুলি বাদ দিলে দেখিব) অধিবাসীরা তাহাদের শহরে বেশি বাস করে। সভ্যতার "শহুরে মাপকাঠিতে" (standard of urbanisation) বাঙালী উচ্চে নয়। তাই, এই উপরের চিত্রকেই বাঙলার চিত্র, বাঙালার সংস্কৃতি, না বলিয়াও উপায় নাই। কিন্তু 'বাঙলার কাল্চার' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই যে এই বাঙলার সংস্কৃতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে তলাইয়া দিতেছে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। আর তাহাতে আমাদের দুঃখও নাই। দুঃখ থাকিলেও ফল হইত না,—কারণ 'বাঙলার কালচার' আধুনিক কালের বাঙলার সামাজিক অবস্থার ও ব্যবস্থার ফল।

বাঙলার কাল্চার-বিলাস

'বাঙলার কাল্চার' 'সেকেলে'ও নয়, 'পাড়াগেঁয়ে'ও নয়। তাহা অন্য জিনিস। তাহা কি জিনিস, সে বিষয়ে অধ্যাপকগণ কিন্তু একমত নন, শুধু এই বিষয় তাঁহারা একমত যে, উহা 'পাড়াগেঁয়ে' নয়, 'সেকেলে'ও নয়। দরকার হইলে 'বাঙলার কাল্চার' বলিতে অবশ্য আমরা বৈষ্ণব কবিতার নাম করিব; ফ্যাশান হিসাবে কীর্তনের উচ্চাঙ্গতা প্রমাণ করিব; এমনকি রেডিওতে ভাটিয়ালী চালাইব; ড্রয়িংরুমে পল্লী-সঙ্গীতের চর্চা করিব; পুরানো কুলা, কাঁথা, পিঁড়া কলিকাতায় বহিয়া আনিয়া 'বাঙলার কৃষ্টির' জন্য প্রাণপাত করিব; আর কলম-ধরা আঙুলে আমাদের কন্যারা পর্যন্ত

কলিকাতার সিমেণ্ট-বাঁধানো সভাতলে আলপনা আঁকিতে বসিবেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, উহা আমাদের স্বাভাবিক ও জীবন্ত অভ্যাস নহে, একটা 'কৃষ্টি-চর্চা'—ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র আর নাই, তাই এই প্রাণপাত পরিশ্রমেও সেই পল্লীপ্রাণ 'বাঙলার কৃষ্টি' বাঁচিয়া উঠিবে না। যে সামন্ততন্ত্র ও পল্লীসমাজে এইসব জীবন-উপাদান ও এই জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল সেই সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া গিয়াছে, সেই পল্লীসমাজ ম্রিয়মান—কৃষি-সংস্কৃতির সেই স্তর আজ শিল্প-প্রধান সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে পরিবর্তিত হইতেছে। তাই সেই স্তরে যেসব সৃষ্টি সহজ ও সম্ভব ছিল, আজ তাহা সহজ ও সম্ভব নয়। জনগণও তাই ঐসব উপাদান অনুষ্ঠানকে সহজ রূপ দিতে পারে না, আর তাহাকে বিকাশ করিতে পারে না। আমরা 'ভদ্রলোকেরা' ত তাহা হইতে আরও দূরে—আমরা উহাকে জীবন্ত রূপ দিব কি করিয়া? ফ্যাশন হিসাবে চেষ্টা করি তাই এসবকে বাঁচাইয়া তুলিবার। অবশ্য আমাদের এইরূপ 'কৃষ্টি-চর্চা'ও এই 'বাঙলার কাল্‌চারের' একটা অঙ্গ—যেমন, বিলাতী শিল্পীদের চক্ষে নিগ্রো আর্ট আদরণীয়, যেমন আমাদেরই শিল্পীদের চক্ষে সাঁওতাল-জীবন ও বৌদ্ধযুগ একটা রোমাণ্টিক বিষয়-বস্তু। আমাদের পুরাতন আচার অনুষ্ঠান আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর জীবনযাত্রার পক্ষে এতই দূরবর্তী ঠেকে যে, আজ বিদেশী অতিথিকে সংবর্ধনা করিবার কালে প্রথমেই মনে পড়ে আয়োজনটা 'ওরিয়েণ্টাল' হওয়া চাই। তারপর অধ্যাপকের বাড়িতে পাঁতি লইতে ছুটি, "স্যর, চন্দন 'ওরিয়েণ্টাল' হবে ত?" অর্থাৎ, কি আমার দেশীয়, কি আমার দেশীয় নয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি; মনে শুধু একটি খাঁটি দেশীয় ভাবই তবু নিজের অজ্ঞাতে জাগিয়া আছে—পাঁতি লওয়া।

ইহাই বিংশ শতকের বাঙলার কাল্‌চারের পরিচিত রূপ—উহা ৯৩'৫ জনের জিনিস নয়; অথচ উহা ৯৩'৫ জনের সেই পাঁতি লইবার মনোবৃত্তি ছাড়িতে পারে নাই; উহার আসন শহর, বলিতে পারি একটিমাত্র শহর—কলিকাতা; উহার জন্মও এই শহরের সঙ্গে, অর্থাৎ ইংরেজের কর্তৃত্বে।

বাঙলার কাল্‌চারের কেন্দ্র

ভারতবর্ষে ইংরেজের অভ্যুদয় তিনটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়—মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই। ইহাদের গায়ে ইংরেজ রাজত্বের তিন যুগ, ইঙ্গ-

ভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তিন স্তর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। (লেখকের 'শহরের রূপ ও স্বরূপ', আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসর, পৌষ, ১৩৪৮ ; লেখকের *History of Madras*, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 9, 1940 ; লেখকের *Bombay : Where it beats Calcutta*, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 30. 1940 ; লেখকের *This Calcutta Culture*, Calcutta Municipal Gezette, Nov. 25, 1939 দ্রষ্টব্য।) যেমন, মাদ্রাজে এখনো প্রথম ইংরেজ যুগের সেই আব-হাওয়া রহিয়া গিয়াছিল ; নূতন শিল্পযুগের হাওয়া ঠিক বহে নাই। বোম্বাইতে নবজাত 'জাতীয় ধনিক-তন্ত্র' (national bourgeoisie) 'স্বাজাত্য' ও স্বদেশীতে (শব্দটি বিশেষ অর্থযুক্ত) প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। আর কলিকাতায় খাঁটি ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদের মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও শেষ হয় নাই—বণিক ও ধনিক ইংরেজ পুঁজিপতিরূপে এক বিলাতি পুঁজির এবং ঔপনিবেশিক জীবন-যাত্রার পত্তন করিয়াছে।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তাহাতে দেশী মাড়োয়ারী ভাটিয়া ভাগীদার জুটিতে থাকে। মোটের উপর ইংরেজের প্রথম উদয় বাঙলায় : তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠা বাঙলায়। ইংরেজের রাজত্বের ফলেই বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে "আধুনিক যুগ" আরম্ভ হয়। ইংরেজ যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ নিদর্শনও এই 'বাঙলার কাল্‌চার'; "আধুনিক যুগের" প্রথম পীঠস্থানও তাই ইংরেজের শহর এই কলিকাতা। এখান হইতেই আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইত, প্রধানত বাঙলাতেই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ লাভ করে,—তারপর অনুরূপ ঢেউ অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া যায়।

ইংরেজি আমলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আপন-আপন চেতনা ইংরেজ রাজত্বে যাহা জাগিয়া উঠিতেছিল, প্রাগ্‌গামী বাঙলার জীবন ও চিন্তা হইতে তাহা প্রেরণা সঞ্চয় করে, তাহারই অবশ্য 'আপন-আপন' ছাঁদে, ভঙ্গিতে—আধুনিক হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতীভাষী জাতিগুলি আপনাদের অনুরূপ কালচারও সৃষ্টি করিতে যত্নপর হয়। এই আধুনিক কালের ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য প্রতিনিধি 'বাঙলার কাল্‌চার'। যাহা বাঙলার কাল্‌চার সম্বন্ধে প্রধানতম সত্য, তাহা ঐ সব আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধেও প্রধানতম সত্য ;—গৌণ বিষয়ে পার্থক্য,

অবশ্য সুবিদিত। ভারতীয় সংস্কৃতিকে যে পূর্বযুগের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ মাত্র বলিলে চলিবে না, তাহা আমরা দেখিতেছি। তাহার কারণ, এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের ভারত আগমনও সেই পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের পরিচয় দেয়—তাহা হইতেই সভ্যজগতে সামন্তযুগের অবসান ও বনিগ্‌রাজের অভ্যুদয় বুঝিতে পারা যায়। আর সেই বণিক্‌তন্ত্রের বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন ভারতবর্ষের ইংরেজ বণিকের রাজত্ব লাভ হইল, তেমনি প্রধানত ভারতের ঐশ্বর্যে খিলাতে ব্রিটেনের শিল্পযুগের পত্তন হইল। আবার ভারতেও সেই শিল্পযুগের আক্রমণ ফলে লোপ পাইল কৃষি-সমাজের গৃহশিল্প ও পল্লী-সমাজের পুরানো ছাঁচ; এই কারণেই সেই পুরানো জন-সংস্কৃতির পুরানো ধারা আজ শুকাইয়া উঠিতেছে; জন-জীবনও নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—কিন্তু অহার একালের উপযোগী রূপ ঠিক আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। জন-সংস্কৃতির এই সঙ্কটের সূচনা হয় সাম্রাজ্যেবাদের বণিকতন্ত্রের আবির্ভাবে আমাদের পুরাতন শিল্প ও কারুশিল্পের ধ্বংসে। তখন দেখা দিল নূতন শাসক ও তাহার তাঁবেদার আমলা দালালের দল; দেশীয় সামন্ত রাজ, জমিদার ও তালুকদার, ফড়ে, ব্যবসায়ী ও উপজীবিকাবলম্বী 'মধ্যশ্রেণী'। ইহা শুধু বাঙলা নয়, ভারতীয় জীবনের প্রধান সত্য; ইহার সম্মেলন-ফলে ফুটিয়া উঠিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে, বিশেষ বাঙলা দেশে, এক নূতন 'ভদ্রলোকে'র জীবনযাত্রা; উহারই শ্রেষ্ঠ কীর্তি "বাঙলার কাল্‌চার"।

বাঙলার কাল্‌চারের পর্ববিভাগ

এই কাল্‌চারেরও অবশ্য পর্ব বিভাগ করা হয়। যেমন, প্রথম পর্ব, 'রামমোহনী পর্ব' (১৮০০-১৮৪০)। রামমোহনের যুক্তিবাদ (rationalism) সেদিনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিল; কারণ তখন ফরাসী বিপ্লবের পরস্তরে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় গণ-তন্ত্রের (Democracy), ব্যক্তি-স্বাধীনতার (Individualism) ও জাতীয়তার (Nationalism) বোধন চলিয়াছে। সতীদাহ নিষেধ, একেশ্বরবাদিতা, স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন ইংরেজের সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার চোখে ইংরেজের সংস্কৃতি এক নূতন

সম্ভাবনার বাহন রূপে দেখা দিল; ইহাই রামমোহনের যুগাবতার গণ্য হইবার শ্রেষ্ঠ দাবী এবং উহা একমাত্র দাবীও। ইউরোপের সভ্যতা যে যুগান্তরকারী হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—ইহার অপেক্ষা বড় তাঁহার প্রতিভার প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না। কারণ, ইংরেজি শিক্ষার অর্থ তখনকার বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া বা. বনিকতন্ত্রের শিক্ষার ফল লাভ করা। পৃথিবীতে তখন পর্যন্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা উন্নত শিক্ষা। উহার সংস্পর্শে আসিলে ভারতীয়গণের পৌরাণিক ও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা ও দৃষ্টি পরিবর্তিত হইবে; যে সব সংস্কার রামমোহন প্রবর্তিত করিতে চাহেন, ইংরেজি শিক্ষায় তাহা ধর্মে, চিন্তায়, আচরণে, অনুষ্ঠানে আসিতে বাধ্য, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। মেকলে ও লর্ড বেন্টিংকের প্রথম শিক্ষা প্রস্তাবে ও নানা সংস্কারে এই রামমোহনী পর্বের জয় ও অবসান ঘটে ১৮৪০এর পূর্বেই। দ্বিতীয় পর্বে আসিল ফোর্ট উইলিয়মের শিক্ষিত আমাদের 'ইয়ং বেঙ্গলের' পর্ব। ইঁহারা একেবারে ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে নিজেরাই ডুবিয়া গেলেন, দেশকে নোঙ্গর-ছাড়াও করিতে পারিলেন না। কারণ, তাহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় নাই—ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজি সমাজের উপকরণ ইংরেজের সমাজ-সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা হইতে উঠিয়াছে। আর এই দেশের সমাজ, ইহার জীবনের উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইংরেজের রাজ্যাধিকারে ভাঙ্গিতেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের ছাঁচে গঠিত হইতেছে না,—গঠিত হইতেছে "ঔপনিবেশিক" (colonial) ছাঁচে। এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ হইল ওয়েলেস্‌লি ডালহৌসির সময়ে—যখন বণিকের রাজত্ব রেল লাইন পাতিয়া ব্যবসায় ফাঁদিতে ও বাড়াইতে আরম্ভ করিল। একবার যেখানে রেল লাইন বসিল, সেখানে আর শিল্পযুগের আবির্ভাব ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না—বিশেযত যখন আবার সেই দেশে সস্তা মজুর, প্রচুর লৌহ ও কয়লা (Letters—Marx and Engels)। অতএব, তৃতীয় পর্বে দেখা দিল ভারতীয় সমাজের সত্যকার সামাজিক পরিবর্তন; এবং দেখা দিলেন মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশব, (দয়ানন্দ), ও সর্বশেষে সেই পর্বের সর্বপ্রধান ভারতীয় নেতা বিবেকানন্দ। রেল.ও শিক্ষা সংযোগের ফলে প্রথম ভারতীয় স্বাজাত্যের আরম্ভ আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে খাঁটি সামন্ততন্ত্রের অবসানও ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই সময়েই দেখা দিল। তাহার পর চতুর্থ পর্বে

ভারতের চক্ষে বিংশশতাব্দীর উদ্বোধন ঘটে বুয়ার যুদ্ধে ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে। তাহার স্বরূপ ক্রমপরিস্ফুট হইয়া উঠে বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ও তাহার পরে গত ১৯২৯এর পৃথিবীজোড়া অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যে; সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েতের জন্মে ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। আর গৃহমধ্যে বঙ্কিমের মধ্যে (১৮৮৪) সে প্রেরণা আসিয়া পৌছায়, (তিলক)-অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথে (১৯০৫) উত্তীর্ণ হয়, (গান্ধী)-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথে (১৯২০-৩০) মূর্ত হয় এবং সর্বশেষে ১৯৩০এর পরে তাহাই আর এক নূতন পর্বের দিকে (পঞ্চম ?) অগ্রসর হয়—একরূপে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, (অস্পষ্টত পণ্ডিত জহরলালেও), অন্যরূপে প্রধানত সাম্যবাদী চিন্তায়।

দ্রষ্টব্য এই যে, ইঁহাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। ভারতীয় মুস্‌লিম জীবনযাত্রা শহুরে; মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ও সিপাহী বিদ্রোহের আঘাতে সেই শাসকের সংস্কৃতি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—যেমন তুর্কী আগমনে হিন্দুশাসকের সংস্কৃতি একদিন মুর্চ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমানের সংস্কৃতি পল্লীগত অর্থাৎ জনগণের জিনিস। আমাদের শহুরে কাল্‌চারের উদ্বোধনে সেই পল্লীকেন্দ্রিত জনসমাজের কেহই আহূত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সবে নূতন কাল্‌চারের শিহরণ জাগিতেছে।[১]

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই চার পাঁচ পর্বের 'বাঙলার কাল্‌চার'কে প্রায় আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চারও বলিতে পারা যায়, বন্ধনী মধ্যস্থ নাম কয়টি শুধু অবাঙালীর। এই কাল্‌চার যতই অগ্রসর হইতেছে ততই অবাঙালী সেই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রাধান্য পুনর্লাভ করিতেছে। প্রথম

---

১ বাঙালর নূতন জাগ্রত মুসলিম শিক্ষিতদের পক্ষে সত্যসত্যই বাঙলার নিজস্ব জনসংস্কৃতির বাহন হওয়া তাই সহজতর—কারণ তাহারা এখনো জন-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারায় নাই। অবশ্য তাহার অর্থ—তাহাদিগকে বাঙলার এই যুগের জন-জীবনকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার যুগোপযোগী রূপ অধিকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রথমত শরিয়তি ইস্‌লাম কথিত সমাজ ও সভ্যতা গড়িবার মোহ—অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব সভ্যতাকে বাঙলা দেশে বিংশ শতাব্দে প্রবর্তিত করিবার মোহ—ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, এই নূতন মুস্‌লিম চেতনারও পঁচাত্তর বছর আগেকার হিন্দুচেতনার মত ভুল করিলে চলিবে না। নোকরশাহীর আওতায় হিন্দুদের বাঙলার কাল্‌চার চাকরের কাল্‌চার হইয়াছে। তাই মুসলমান চেতনাও যদি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে আবদ্ধ থাকে, তাঁহারা যেরূপ চাকুরী ও মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার লোভে মাতিয়া উঠিয়াছেন তাহাতে তাহাদের প্রয়াসও চাকরের কাল্‌চার হইয়া থাকিতে পারে। 'বাবু কাল্‌চারের' পার্শ্বে বাঙলাদেশ তাহা হইলে দেখিবে এক 'মিঞা কাল্‌চারের' উদ্ভব।

দিকে এই প্রাধান্য বাঙালীরই ছিল,—কেন ছিল তাহার ঐতিহাসিক কারণই আমাদের বেশি অনুসন্ধানের বস্তু। তাহাই আসলে বাঙলার কাল্‌চারের স্বরূপ, অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ, আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া দিবে।

বাঙলার কাল্‌চারের দশদিক

তাহার পূর্বে এই বাঙলার কাল্‌চারের নানা দিক কয়টি আবার একবার এক নিমেষে আমরা দেখিয়া লই ('জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।) ভারতবর্ষে বণিক ইংরেজ রাজা হইলেন ১৭৫৭ হইতে। তারপর কাল্‌চারের নানাপর্বের মধ্যে আমরা দেখি—(১) ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ:—ইহার প্রবক্তা রামমোহন হইতে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপের Reformation ও Protestantism—যেদেশে উহাতে এক হিসাবে ইউরোপীয় বনিকতন্ত্রের অঙ্কুরোদ্গম হয় বলা চলে। (২) হিন্দু জাগরণ:—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ও হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত এই স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় ক্যাথোলিক ধর্মের Counter-Reformation. (৩) সংস্কৃত চর্চা—রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রয়াস, বাচস্পতির অভিধান, মহাভারতের অনুবাদ হইতে এই ধারা একেবারে বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশের অধ্যায় পার হইয়া একালে জীবিত পণ্ডিতদের মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও তৎকালীন গ্রীকচর্চা। কিন্তু স্মরণীয় এই যে, সত্যকারের রেনেসাঁস বাঙলা দেশে যদি হইয়া থাকে, সংস্কৃত চর্চায় হয় নাই, হইয়াছে ইংরেজি শিক্ষায়,—মানে, বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায়। (৪) সমাজ-সংস্কার:—রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ইহার প্রবক্তা। বর্তমানে ইহার ঐতিহ্য ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য-সমাজ ও হিন্দুমহাসভার সম্বল। কিন্তু সমাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নাই, বৈপ্লবিক সংগঠনের যুগ আসিয়াছে। এই দিকে শিল্পপ্রবর্তক ও সাম্যবাদাবলম্বী জনসমাজই সেই প্রেরণার উত্তরাধিকারী। (৫) সাহিত্য:—ঈশ্বরচন্দ্র (শিক্ষা-প্রবর্তক), মধুসূদন ও বঙ্কিম প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষিতদেরই ইহা সর্বাংশে কীর্তি। ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যের সম্পর্ক সাহিত্য হিসাবে প্রায় নাই। বরং ইহার প্রেরণা—ইহার সহিত তুলনীয়ও—ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে যে সাহিত্য জন্মে তাহাই। নব শিল্প-পদ্ধতি:—

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল হইতে স্বদেশী যুগের পরে ইহার জন্ম। ইহার সহিত ভারতীয় প্রাচীন শিল্পধারার বা বাংলার পটুয়াদের ধারার যোগসূত্র অবাধ ছিল না—যোগসূত্র আছে নিবেদিতার, ওকাকুরার, হ্যাভেলের এবং কুমার-স্বামীর সহিত। (৭) সঙ্গীত :—ওস্তাদের আসরে বাঙালীর স্থান ছিল গৌণ; তাই এইখানে যে নূতন সঙ্গীতের ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন তাহা নূতন। উহাতে কথা ও সুরের সমন্বয় স্থাপিত হয়। ইহার রহস্যটুকু বুঝিবার মত। লোক-সঙ্গীত সাধারণত কথাপ্রধান। বাঙলার লোক-সঙ্গীতও তাহাই। বাঙলার কীর্তন এই জন-সমুদ্র হইতে জন্মে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সেই কথার সঙ্গে সুরের নূতন সমন্বয়ে ইহা একালের বাঙলায় জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু ঠিক এই বিশেষ একটি ভাষার কথার জন্যই মনে হয় তাহা এক নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত-শৈলীরূপে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' ছাড়াও একটা বাঙালী সঙ্গীত-ধারা ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতেছে, কবি নজরুলের দানও সেই দিকে স্মরণীয়। (৮) নাট্য ও নৃত্যকলা এবং 'টলিউডী' সবাক্‌চিত্র :—বলাবাহুল্য ইহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক, ইহার প্রেরণা ও আদর্শ প্রথমত আধুনিক ইংরেজী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির, ও তাহার মার্কিণ বিকৃতির। এই সিনেমাশিল্পের নিকট সোভিয়েট সিনেমা-শিল্পের আদর্শ বা টেক্‌নিক্ আশা করা যায় না। ইহারও সেদিকে কোনোরূপ দৃষ্টি নাই। মুনাফাই এই শিল্পের লক্ষ্য, শিল্প-সৃষ্টি বা মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা সে হিসাবে ইহার গৌণ আদর্শ। (৯) সাংস্কৃতিক গবেষণা :—ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্বে, নৃতত্ত্বে বাঙালীর দান আদর লাভ করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণই ভারতীয় গবেষকের দ্বার মুক্ত করেন। (১০) রাজনৈতিক আন্দোলন :—উহার উদ্বোধন প্রধানত ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা হয়, আর উহার দুইটি ধারা অন্তত আছে। যেমন, একদিকে ডব্লিও-সি-ব্যানার্জি (নামেই তাঁহার স্বাজাত্যের আদর্শ পরিস্ফুট), আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ হইতে একালের ন্যাশানালিষ্টরা; আরদিকে বঙ্কিম-অরবিন্দের প্রেরণাপ্রসূত বাঙলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ধারা,—আজ যাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক চিন্তায় ও সামাজিক কর্মক্রমে বিশ্বাসী, ও গণবিপ্লবের দিকে যাঁহারা অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন, মোটামুটি যাঁহারা সাম্যবাদের পক্ষপাতী।

বলা হয়ত প্রয়োজন যে, যাহাকে আমরা 'বাঙলার কাল্‌চার' বলি

প্রধানত তাহা সম্ভব হইয়াছে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য :—উহা ইংরেজ অধিকারেরই অবশ্য ফল। কাজেই ঐ শিক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা অবশ্য তখনকার 'বুর্জোয়া' শিক্ষা-পদ্ধতি; তাহার ফলে আমরা গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, স্ত্রীশিক্ষা সংবাদপত্র, সভাসমিতির মূল্য বুঝিব, ইহা না বলিলেও চলে। দ্বিতীয় একটি কথা, এই বাঙলার কাল্‌চারের দিক কয়টির মধ্যে মানসিক সম্পদগুলিরই হিসাব লওয়া হইয়াছে—পাট, কয়লা, চা প্রভৃতির কথা নাই। 'বাঙলার কাল্‌চার'-বাদীদের চোখে কাল্‌চারের সেই হিসাব গৌণ।

বাঙলার কাল্‌চারের বনিয়াদ

মোটামুটি এই যে নানাদিকে বাঙলার কাল্‌চার বিকাশ লাভ করিল তাহার মূল কোথায়, আর সমস্ত জড়াইয়া তাহার কোন্ রূপটি প্রকাশিত হইল—অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি—এইবার সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতে বোধ হয় অসুবিধা নাই। পুনরুক্তির দোষ ঘটিলেও বলিতে হইবে—(১) ইহা ৯৩.৫ জনের কাল্‌চার নয়; (২) ইহা পুরাতন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নয়; (৩) ইহা কৃষি-প্রধান পল্লী জীবনের সংস্কৃতি নয়; (৪) ইহা মাত্র মধ্যবিত্ত ও ইংরেজি শিক্ষিতদের সৃষ্টি (এবং যেহেতু ইহারা অধিকাংশেই প্রায় হিন্দু, অতএব মুসলমানগণ ইহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই); (৫) ইহা শহরে জাত এবং শহরেই প্রায় সমাসীন; (৬) ইহা বাহিরের বণিক সংস্কৃতির আঘাতে আমাদের ক্রম-পরাস্ত কৃষি-সংস্কৃতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; (৭) ইহা প্রধানত বাঙালীর মানস সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে, এবং তাহার আর্থিক জীবনকে ভুলিয়া থাকিতে চায় বা অবজ্ঞা করে; (৮) এবং সর্বশেষে, ইহা মাত্র সামান্যাংশে আভাস দেয় সমাজগত পরিবর্তনের (রাষ্ট্রকর্মে ও সামাজিক সংস্কারে), আর জীবিকাগত বা বাস্তব উপকরণগত সংস্কৃতির (যাহা ৯৩.৫ জনের কিংবা শহরের বাকী জনগণের, মজুরের, ফেরিওয়ালার, দোকানীর, পশারির, জীবনযাত্রা, জীবন-দৃষ্টি, এই সবের) প্রায় খোঁজই রাখিতে চায় না।

ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন

মানস-সংস্কৃতির উপর যে এত বেশি জোর পড়িল, এবং উহার যে এরূপ অসাধারণ বিকাশ ঘটিল তাহার কারণ ঐতিহাসিক। ইংরেজ বণিক রাজা

হইলেন। ১৭৬৫ সালে তাঁহারা দেওয়ানী লাভ করিলেন। ১৭৯৩তে দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন এবং তাহাই পরে জমিদারী প্রথায় 'চিরস্থায়ী' রূপ লাভ করিল। অর্থাৎ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙ্গালার ভূমি-ব্যবস্থার এত বড় একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল যাহা পূর্ব পূর্ব যুগে আর কখনো ঘটে নাই। প্রথমত, বিলাতী কায়দায় খাজনা (rent) ধার্য করা হইল, শস্যের পরিবর্তে 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনের চেষ্টা চলিল। পূর্বে রাজস্ব অজন্মা-অনাবৃষ্টিতে বাড়িত-কমিত, কৃষকের উহাতে সুবিধা ছিল। 'মুদ্রা কর' সেই অবস্থার হিসাব রাখে না, জমির উপর 'খাজনা' দিতে হইবে—এই তাহার হিসাব। উহা পূর্বেকার মত 'রাজস্ব', উৎপাদনে রাজার অংশ, বলিয়া পরিগণিত হয় না। দ্বিতীয়ত ,জমির মালিকানা আর কৃষকের কিংবা পল্লী-গোষ্ঠীর রহিল না। ইংরেজী থিওরি মত, উহা রাজার হইল। ইহাই বিলাতী নীতি—এই নীতি অনুযায়ী কৃষক খাজনা না দিলেই উৎখাত হয়। তৃতীয়ত, বণিক রাজা আবার মালিকানা ইজারা দিয়া দিলেন নানা খাজনা-জোগানদারদের হাতে—ইহারাই জমিদার। কার্যত জমির মালিক আজ ইহারাই।[১] সত্য বটে, আজ প্রজার খাজনা প্রায় ১৮ কোটি টাকা (আব্ওয়াব কয় কোটি টাকা তাহা না বলিলেও চলে), আর সরকার পান ৩ কোটিরও কম ; বাদবাকী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য। কিন্তু ১৭৯৩এর বন্দোবস্ত অনুসারে কথা ছিল সরকারী পাওনার (যেমন এখনকার হিসাবে ৩ কোটির) এক দশমাংশের (অর্থাৎ এখনকার হিসাবে ৩০ লক্ষের) বেশি জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিবেন না। কিন্তু আজ জমিদারের নিজ আদায় মোট ৯ কোটির কম নয়—কাহারো কাহারো মতে ১৭।১৮ কোটি। অতএব 'জমিদারী' যে দেশের সম্পন্নদের নিকট একটা প্রকাণ্ড লাভের ও লোভের জিনিস হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আজ মনে হইবে, জমিদারী প্রথায় ইংরেজ বণিগ্‌রাজের বুঝি লাভ ছিল না। কিন্তু ১৭৬৫এর পরে দেশে যে 'খাজনা নিলামের' অত্যাচার চলে আজও তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এই দেশের

১ ভারতবর্ষের যেখানে 'তালুকদারী' ও রায়তোয়ারী প্রথা প্রবর্তিত হয় সেখানেও 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনে কৃষক নিঃস্ব হইল। সেখানেও মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইল। সেখানেও ক্রমশ গৃহশিল্পের বিনাশে শিল্পীরা আসিয়া কৃষকের সংখ্যা বাড়াইল। কিন্তু রায়তোয়ারী প্রদেশে 'জমি' মুনাফার এতবড় বস্তু হইল না ; ব্যবসায়ীরাও তাই জমিদার হইতে চাহিল না।

Black Death ! ১৭৯৩তেও ইংরেজ বণিক লাভের অঙ্ক কিছু মাত্র কমাইয়া এই ভূমি-ব্যবস্থা করে নাই। তাহাদের হিসাব মতে মুঘল রাজত্বের শেষদিকে ১৭৬৪-৬৫এ রাজস্ব ছিল ৮১৮,০০০ পাউণ্ড; কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার সঙ্গে ১৭৬৫-৬৬তে উহা বাড়িল ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ডে; আর ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেই সরকারী ভূমি-রাজস্ব স্থির হইল ৩০,৯১,০০০ পাউণ্ড। আর যাহাই হউক, বণিকেরা মুনাফা ছাড়িয়া দেয় নাই, ইহা না বলিলেও চলে।

তাহা ছাড়া, কয়েকটি প্রধান কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হয়—প্রথমত, বৎসরে বৎসরে বন্দোবস্ত যাহারা লইত তাহারা রায়তের উপর শত অত্যাচার করিয়াও সেইরূপ উচ্চহারে খাজনা আদায় করিয়া উঠিতে পারিত না। কাজেই সরকারী বাজেটের আদায়ী খাজনা বাকী পড়িত। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিস্ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন, তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেশে ইংলণ্ডের অনুকরণে একদল ভারতীয় ভূস্বামী (landholder) গঠন করিবেন। ইহার এক কারণ তাহারা জমির উন্নতি করিবে—জমিদারেরা অবশ্য ইহার কিছুমাত্র করিলেন না। কর্ণওয়ালিস্ চাহিয়াছিলেন—এইভাবে জমিদারদের ঘাড়ে ভারতবর্ষে চিরদিন যাহা রাজার কর্তব্য ছিল—যেমন কৃষির প্রয়োজনে বড় বড় খালবিল খনন ও সংরক্ষণ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পথঘাট প্রভৃতি—তাহা চাপাইয়া দিবেন, কোম্পানি শুধু জমির মালিকানা ও রাজস্ব ভোগ করিবে। ইহার ফলে দুইশত বৎসরে এসব জিনিস একেবারে ধ্বংস হইল, নদীনালা বন্ধ হইল, রাজা বা জমিদার কেহই দৃকপাত করিল না (*Public Works in India*, Sir Arthur Cotton, 1854 ও *Bengal Irrigation Committee Report*, 1930 দ্রষ্টব্য)। এই ভূস্বামী সৃষ্টি করার তৃতীয় কারণ—কর্ণওয়ালিস বুঝিয়াছিলেন, তাহারা সরকারের নূতন প্রতিষ্ঠিত শাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইবে। পরে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক আবার এই কথাই মনে করাইয়া দেন : (Lord William Bentinck—Speech on Nov. 8, 1829 ; quoted from *Speeches and Documents on Indian Policy*, Vol. 1, p. 215, Ed. A. B. Keith দ্রষ্টব্য।) "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রুটি আছে সত্য; তবু ইহার দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী বড় একদল ধনী ভূস্বামী সম্প্রদায় তৈয়ারী হয়। ইহাতে এই একটি বিরাট সুবিধা হইয়াছে যে—যদি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে

শাসনকার্যের নির্বিঘ্নতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকিবে।"

পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনে কিন্তু কৃষি-সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইল। কারণ (১) মুঘল রাজত্বের শেষদিকে জায়গীরদাররা প্রায় আধা-স্বাধীন সামন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেই সব বনিয়াদী বংশের এইবার পতন হইল। (২) টাকাওয়ালা 'দেওয়ান' 'গোমস্তারা' কোম্পানির প্রভুদের কৃপায় এই মুনাফার ব্যবসায়ের মালিক হইয়া নূতন জমিদার গোষ্ঠীর পত্তন করিলেন। ইহাদের অর্থলোভ স্বভাবতই ছিল অপরিমিত। কারণ অনেকেই ছিলেন কোম্পানির সাহেব সুবার অনুচর, দালাল, বেনিয়ন, মুৎসুদ্দি; বাজারে বন্দরে সেদিন ইহারা ভাগ্যান্বেষণে জুটিয়াছিলেন। সেদিনকার ইংরেজি 'কুঠি'র কাঞ্চন মানদণ্ডই ছিল ইহাদের নিকট প্রধান। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর পদবীতে উন্নীত হইবার আশা তাঁহাদের ছিল না, সেই আভিজাত্যের মানদণ্ডও তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। শোভারাম বসাক, রতু সরকার, গোবিন্দ মিত্র প্রভৃতি (১৭৫৭) প্রধানগণ পোষ্য অনুচর ও বাইজীর নামে টাকা মারিতে দ্বিধা করিতেন না—তাঁহাদের নীতিজ্ঞানে উহা দোষাবহ ছিল না। (*Long's Selection form the Records of the Government*, No, 354-358 ও 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের কৃপায় একবারে সেই অভিজাত পর্যায়েই এই শ্রেণীর স্থান পাইবার সুযোগ হইল জমিদার রূপে, অথচ মুনাফার হিসাবেও জমিদারী তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয় রহিল।

ইহারও আবার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বুঝিবার মত। প্রথমত যে সব পুরানো ঘর পুরানো সমাজ ও বাস্তব সংস্কৃতি পোষণ করিতেন তাঁহারা লোপ পাইলেন। নূতন জমিদারেরা শিক্ষায় (অথবা উহার অভাবে), রুচিতে (উহারও অভাবে) সেই পল্লী সংস্কৃতিকে পালন করিতে পারিলেন না। খালবিল, নদীনালা মজিয়া চলিল, পথঘাট, জল সংরক্ষণের ও নিষ্কাশনের নালা-গুলি, এই সবের দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা শহরের মানুষ, কাজেই পল্লীসংস্কৃতির সমাদর বুঝিতেনও না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দূরে দূরে গ্রামে জমিদারীর মধ্যে বাস করিতেন—যেমন বরেন্দ্র ভূমির জমিদারেরা—তাঁহাদেরও ক্রমেই চোখ পড়িল সাহেবদের ও কোম্পানীর কায়দার দিকে। সর্বত্রই কৃষিসংস্কৃতির ক্রমশ দুর্দিন আসিল। কারণ, প্রথমত ছিল নূতন নিষ্ঠুর

করভার, দ্বিতীয়ত, পূর্তাভাবে কৃষির অব্যবস্থা। তৃতীয়ত, কৃষকের সহিত ব্যবহারে নূতন জমিদারেরা কোনো পুরাতন সম্পর্কের মর্যাদা রাখিলেন না। 'খাজনা দেও, নজরানা দেও, আব্‌ওয়াব দেও, না হইলে উৎসন্নে যাও'—অর্থাৎ বিলাতী বণিকরাজের যেমনিতর নীতি, তেমনিতর তাহাদের দালাল দেশীয় জমিদার বেনিয়নদেরও নীতি হইয়া উঠিল। পরবর্তীকালে ইঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ অবশ্য আবার পূর্বপুরুষের সেই দালালী-মনোবৃত্তি ছাড়িয়া নূতন আভিজাত্যের চর্চা করেন। ফলে তাঁহারা আবার দেশে নানা পর্যায়ের তালুকদার, জোৎদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর ও মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইংরাজ যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় ১৮০০ সনের পূর্বেই যে আঘাত পল্লীকেন্দ্রিক কৃষি-সমাজ লাভ করিল তাহা প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নয়—আর কাহারও সে ইচ্ছাও ছিল না।

এই সঙ্গেই এই ভূমি-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলটিও উল্লেখযোগ্য : কোম্পানীর এই বেনিয়ন, মুন্সী, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান—ইঁহারা দেশের নূতন ব্যবসায়ীরূপে দাঁড়াইতেছিলেন। ইহারাই স্বাভাবিক বিকাশের পথ পাইলে বাণিজ্যে-ব্যবসায়ে লক্ষীলাভ করিতেন—বণিকে পরিণত হইতেন। পূর্ব যুগের সওদাগরী পুঁজি ইহাদেরই চেষ্টায় 'বণিক পুঁজি' হইবার কথা। কিন্তু বিদেশী বণিকরাজের আওতায় ইহারা প্রথমত রহিলেন দালাল শ্রেণীর ব্যবসায়ী হইয়া। তারপর দেখিলেন—দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির একচেটিয়া, দেশীয়দের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ ; অথচ বহির্বাণিজ্যেই আসল লাভ। অন্যদিকে অন্তর্বাণিজ্যে, অর্থাৎ ব্যবসায়পত্রেও তাঁহারা আবার দেখিলেন, কোম্পানির রাজত্বে তাহার জুলুমবাজ সাহেব কর্মচারীরা বড় বড় দিকগুলি দখল করিয়া লইতেছেন। অতএব, বাধ্য হইয়াই দেশীয় ব্যবসায়ীরা অনেকটা ব্যবসায়পত্র ছাড়িয়া বাড়িঘর, জমিজমায় টাকা খাটাইতে লাগিলেন। পরের দিকে কোম্পানির কাগজও তাই ইহাদের নিকট একটা লোভের জিনিস হইল। এমনি অবস্থায় যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' তাঁহাদের একই কালে মুনাফা ও আভিজাত্যের পথ করিয়া দিল তখন দেব, মিত্র, সিংহ, বসাক, শেঠ, মল্লিক, শীল সকলেই জমিদার হইতে চলিলেন। ইঁহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিলি ও সাহা ব্যবসায়ীরাও পরবর্তী সময়ে 'জমিদারবাবু' হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে প্রদেশান্তরের ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বাঙলার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন ;—তাঁহাদেরও দুই চারিজন অবশ্য জমিদার হইলেন। বাঙলার ব্যবসাপত্র আজ এই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে। সেই ব্যবসা ক্ষেত্র হইতেই অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানকার সেই অবাঙালী ধনবান্ ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে শিল্পপতি ও পুঁজিপতি হইতে চলিয়াছেন—অন্য দিকে বাঙলার জমিদার-শ্রেণীর পক্ষে আজ তদুপযোগী শিক্ষাও নাই, পুঁজিও নাই।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি-ব্যবস্থায় দেড়শত বৎসরে বাঙালী ব্যবসায়ী আর রহিল না, বাঙলার ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যান্বেষীরা—বাঙালী হাইকোর্টের জজ হইতে বাঙালী পশ্চিমের কমিসেরিয়েটের জোগানদার এবং পূর্ববাঙলার ব্যবসায়ী মহাজন সকলে—শিল্প-প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া রহিলেন। বাঙালী 'স্বদেশী' আন্দোলন করে, 'স্বদেশী' শিল্প গড়িতে পারে না —ইহাও 'জমিদারী প্রথার' ফল।

নূতন ভূমি-ব্যবস্থার ফল একটু বিশদ করিয়াই বলা হইল। বাঙালীর পক্ষে তাহা অন্যায় নয়। কারণ, ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা জমিদার হইল, বাণিজ্যের ও শিল্পের পথে পা'ও বাড়াইল না ; অর্ধ-সামন্ত জমিদারের সৃষ্টিতে পুরাতন কৃষি-সম্পর্ক পরিবর্তিত হইল, সৃষ্টি হইল মধ্যস্বত্বের। আর করভারে ও নদীনালার অভাবে, বাঙালার কৃষক-সাধারণ একটা চরম দুর্দশার দিকে চলিল। তাহারই ফলে আবার প্রভাবশালী হইল মহাজন বা সাউকার ও মহাজন-জমিদার শ্রেণী ; উহাদেরও টাকা ব্যবসায়ে খাটে না, খাটে শেষ পর্যন্ত জমিতে বা জমির উপস্বত্বভোগীদের মধ্যে।

পল্লী-শিল্পের ধ্বংস

এক কথায় জমি ছাড়া টাকা খাটাইবার আর কোনো উপায়ই ইংরেজ বণিগ্‌রাজ দেশীয় বিত্তবান লোকদের হাতে রাখিলেন না। ইহাই সাম্রাজ্য-বাদের সনাতন নিয়ম। ইহার সঙ্গে আবার স্মরণীয় আরও ভয়ঙ্কর কথা—জমি ছাড়া দেশীয় শ্রমজীবীদের জীবিকারও আর কোনো পথ তাঁহারা উন্মুক্ত রাখিলেন না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বণিগ্‌রাজ এখানকার শিল্পীদের ধ্বংস-সাধন করিতে আরম্ভ করেন। এই দিকে তাঁহাদের তখন পর্যন্ত সহায় ছিল—নিজেদের সংগঠনশক্তি এবং নবলব্ধ রাষ্ট্রশক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ আরম্ভ হইতেই বিলাতের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিলাতের ব্যবসায়ীদের তাড়নায় শিল্পযন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিল ; সেই পাদ উত্তীর্ণ না হইতেই

বিলাতের 'শিল্প-বিপ্লব' সম্ভব হইল। বণিগ্‌রাজ তখন ধনিকরাজ রূপে ভারত-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন—রাষ্ট্রশক্তি ও যন্ত্রশক্তির যুগপৎ প্রয়োগে আমাদের কৃষি-সমাজের পল্লী-শিল্প দেখিতে না দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল। এই কাহিনী আজ এতই সুপরিচিত যে বাড়াইয়া বলিয়া লাভ নাই। এই দেশের শতসহস্র নিপুণ শিল্পী দেখিতে না দেখিতে জীবিকা হারাইল—পুরানো শিল্প-কেন্দ্র শ্মশান হইল—শিল্পীর দল গ্রামে গিয়া কৃষি সম্বল করিল, জনগণের জীবিকার পক্ষে একমাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল—কৃষি। আর সেই কৃষিও রাজা ও জমিদারের অবহেলায় ক্রমশই চরম দুর্দশায় পৌছিতে লাগিল, তাহাও আমরা জানি।

এইরূপে জমির নূতন ব্যবস্থায় ও শিল্প-বিপ্লবে—এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবে—কৃষি-সমাজ বিনষ্ট হইতে লাগিল, অথচ এদেশে বণিক-সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিল না।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ

গড়িয়া উঠিল যাহা তাহারই নাম "বাঙলার ভদ্রলোক"। তাঁহাদের জন্ম ও ইতিহাসই "বাঙলার কালচারে"র জন্ম ও ইতিহাস। পূর্বে তাঁহাদের শিকড় ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গীরদার ও রাজাদের সভায় এবং আসরে। এইবার তাঁহাদের নূতন শিকড় আঁকড়াইয়া ধরিল নূতন মুনিবের নূতন সৌভাগ্যকে;—কুঠিতে, কাছারিতে, আপিসে, আদালতে এবং জমিদারিতে বা জমিদারের অধীনে নানা মধ্যস্বত্বে উহার আশা ও আশ্রয় মিলিল। চোখের উপর যখন কোম্পানির রাজত্ব জাঁকিয়া বসিল, তখন পূর্বেকার আমলা-কর্মচারীরা ফারসী ছাড়িয়া নূতন ভাষা ও কায়দা-দস্তুর শিখিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। কোম্পানিরও প্রয়োজন ছিল এই কর্মচারীদের। এত বড় দেশ বিলাতী কেরানীতে চলিবে না; তাই মেকলে না বলিলেও সৃষ্টি করিতে হইত নূতন বাঙালী কেরানী। অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত ভাগ্যান্বেষীদের জন্য উন্মুক্ত হইল। আর যেভাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাদ-প্রার্থীরা "বাবু"রূপে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই দেশের ভাগ্যান্বেষীরা বুঝিতে পারিলেন—উন্নতির পথ ইংরেজের কুঠি ও কাছারির আনাচে-কানাচে; উন্নতির উপায় যে করিয়াই হউক ইংরেজের প্রসাদলাভ, আর উহার একটা সহায় ইংরেজি বাৎ, ইংরেজি কায়দা।

অবকাশের বিলাস

একদিকে বাবুর যুগ ও অন্যদিকে অবকাশরঞ্জনের প্রয়াস, উহাই "বাঙলার কাল্‌চারের" প্রাথমিক নমুনা। বেনিয়ন-মুৎসুদ্দির যুগটা তাহার অবতরণিকা স্বরূপ। সে পর্বের ইতিহাস বিশদ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। 'ময়না', 'বুলবুল', 'আখড়াই গান', আর সর্বশেষে 'কানন ভোজন' ইহাই বাবুদের বিলাস; আর তাঁহাদের উপজীব্য ব্যবসায় কিংবা চাকুরি কিংবা শহরের জীবিকার নানা রকমের সুরঙ্গ-পথ,—বাঙালার 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' আজ সেই সব সকলের গোচর করিয়া দিয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার চিত্র তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য "বাবুর যুগ" চিরস্থায়ী হইয়া আছে 'নববাবুবিলাসে' (১৮২১-২৩), 'কলিকাতা কমলালয়ে' (১৮২৩) আর বাঙলার সাহিত্যের চিরগৌরব 'হুতোম প্যাঁচার নকসায়' (১৮৬১-৬৪; ইহার চিত্রিত কাল একটু পূর্বেকার হইতে পারে—১৮৪৬-৬০)। রামমোহনী পর্ব ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-পর্ব জুড়িয়াও এই বাবুদের দিনই চলিয়াছিল।

তখন কেহবা কোম্পানির কর্মচারীরূপে নানাভাবে অতুল বৈভবের মালিক হইয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন), কেহবা কোম্পানির সাহেবদের হৌসে বেনিয়ন হইয়া ধনে মানে বড় হইয়াছেন। কিন্তু সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধায় সকলেই জমিদারী জাঁকাইয়া বসিয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন)—সুখের ও সখের মধ্যে তখন তাহাদের অকর্মণ্য বংশধরদের "বাবু-বিলাস" ছাড়া আর কী-ই বা করিবার ছিল?

অবশ্য যাঁহারা গুণবান্ তাঁহারা এই অলস দিনরাত্রি অন্যভাবে সার্থক না করিতেন তাহা নয়। তাঁহাদের 'অবকাশ-রঞ্জনী' জীবনযাত্রার হিসাব লইলে দেখিব, উঁহাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন বিলাতের হুইগ্‌গণ (Whig)। টাকা-কড়ি, বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, একটু শহরের উপকণ্ঠে নিভৃত নিবাস, আর নানাবিধ অবকাশ-রঞ্জনী অনুশীলন,—পাল্‌কী, বেয়ারা, চোপদার, হলঘরে বড় তৈলচিত্র, ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি—ইঁহারা যেন এই সব দিয়া ইংরেজ শাসকদের নিকট প্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন, 'আমরা তোমাদের হুইগ্ ভূস্বামীদেরই সগোত্র।' মিথ্যা নয়,

বিলাতের 'হুইগ্' অভিজাতরাও অনেকেই এমনি বণিগ্‌বংশের বংশধর ছিলেন। কিন্তু বিলাতের হুইগ্‌রা ছিলেন সমাজের বিপ্লবী-শক্তি; তাঁহারা তাঁহাদের সমাজে শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন। ধনিক সভ্যতায় তাঁহারাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন; সমাজে তাঁহাদের দায়িত্বও ছিল, অধিকারও ছিল। আমাদের অবকাশ-কুশল অভিজাতের পক্ষে ইহার কোনোটাই খাটিত না—ব্যবসায় ছাড়িয়া এক আধাসামন্তযুগে তাঁহারা ঠেকিয়া গিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় হুইগ্‌দের অনুরূপ দায়িত্বও তাঁহাদের ছিল না, অধিকারও ছিল না। এ শুধুই 'নকলের নাকাল।'

অথচ অবরুদ্ধ জীবন-চেতনা অবকাশ ক্ষেপণের আর কোনো পথই পাইল না—হয় 'বাবু-বিলাস', নয় 'অবকাশ-বিলাস।' এই অবরোধের পীড়ায়ও কিন্তু ইঁহারা স্বদেশ-প্রীতিতে উদ্‌বুদ্ধ হন নাই। কারণ ইঁহাদের নিকট ব্রিটিশ শাসনই সৌভাগ্যের মূল,—কর্ণওয়ালিসের আশা তাই সফল হইতেছিল! রাজা রাধাকান্ত মোটের উপর রক্ষণশীল (= Tory); তিনিও 'ব্রিটিশ রাজের বিশ্বস্ত প্রজা' বলিয়া গর্ব করিতে ব্যস্ত। সিপাহী বিদ্রোহের দিনে ভারতের পুরাতন সামন্ত অভিজাত শ্রেণী শেষবারের মত আপনাদের অধিকারের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন; তখন বাঙলার এই ইংরেজ-সৃষ্ট নূতন অভিজাত দল গোলাপ মল্লিকের বাড়িতে সভা করিয়া বলিতেছেন—অবশ্য 'হুতোমের' ভাষায়—আমরা 'ম্যাড়া বাঙালী', আমেরিকান হইতে চাই না।

পাশ্চাত্য মানস-সম্পদ

জীবনে যাহা তাঁহারা হারাইয়াছেন—যে সামঞ্জস্যহীন জীবনের মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন—সাম্রাজ্যবাদের সেই দেহ-প্রাণ-বিনাশী পীড়া এই অবকাশ-বিলাসীদের বুঝাও সম্ভব হয় নাই, আর তাহা তাঁহারা বুঝিলেনও না। বুঝিল তাঁহারাই যাঁহাদের মেকলে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহাদের কোম্পানি নিজের কেরানীশালার তাগিদেই তৈয়ারী করিতেছিল। ইঁহারাই 'ভদ্রলোক' ও 'শিক্ষিত সমাজ'; ইঁহারাই শহরের এই বদ্ধজলের 'বিলাস'কে একবারের মত বিকাশের ক্ষেত্রে পরিণত করেন। আর ইঁহাদের সে প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য

দিয়া—যে শিক্ষা এই দেশের সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কিত নহে, যাহা ইউরোপীয় বিকাশশীল ধনিকতান্ত্রিক জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভূত।

যাহাকে আমরা 'পাশ্চাত্য শিক্ষা' বলি, তাহা আসলে বণিকতন্ত্রের দ্বারা পরিশোধিত শিক্ষা—পশ্চিমের 'বুর্জোয়া' সভ্যতার প্রণয়ণ। আমাদের দেশে বাস্তবত অর্ধসামন্ত যুগ কায়েম হইয়া আছে, বুর্জোয়া-যুগ বিকাশের সুযোগ পাইতেছে না।—তথাপি পশ্চিমের সংস্পর্শে আসাতে এই সময়ে আমাদের লাভ হইল এই পাশ্চাত্য শিক্ষা। ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ নাই; আর ইহার প্রবর্তনের জন্য প্রধান কৃতিত্ব মেকলে ও রামমোহনের। ইহার একমাত্র বাস্তব তাড়না ছিল—সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কেরানী প্রয়োজন; আর আমাদের পক্ষে প্রয়োজন—জীবনে জীবিকা—বিষয়, বিত্ত, মান।

সম্পন্ন ঘরের ব্যক্তিমাত্রেই ততদিনে বুঝিয়াছে—জীবনে উন্নতি করিতে হইলে ইংরেজি শিখিতে হইবে। 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিভীষিকা মোটেই তাহাদের সেই বৈষয়িক উন্নতির আশাকে দাবাইয়া দিল না। তাই, বাস্তব ক্ষেত্রে যে ধনিকতন্ত্রের দিকে আমাদের 'প্রবেশ নিষেধ' ছিল, শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা সেই ধনিকতন্ত্রেরই মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলাম। আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত এই শিক্ষার কোনো নিকট সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি এই শিক্ষায়, এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির রসাস্বাদনে আমরা মাতিয়া উঠিলাম। শুধু মাতিয়া উঠিলাম না, যেন একেবারে জীবনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, আমাদের মন যেন ইউরোপীয় বুর্জোয়া-মনের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন হইয়া গেল। আমরা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হইলাম—জন্মিল 'বাঙলার কাল্চার'।[১]

---

১ বাঙলার মুসলমানদের ও ভারতবর্ষের অন্য মুসলমানদের মনোভাব কিন্তু একরূপ ছিল না—এই কথাটি এই ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয় নাই, কারণ বাঙলার কাল্চারে প্রধানত তাঁহাদের দান গৌণ বলিয়া। কিন্তু হিন্দুরা যেমন ইংরেজ রাজাকে পাঠান-মুঘল রাজার বদলে সহজে মানিয়া লইতে পারিল, মুসলমান ভারতবাসী তাহা পারিল না। তাহারা শুধু দূরে বসিয়া রহিল না, যথাসাধ্য ইংরেজের বিরোধিতা করিল, ইংরেজের আনীত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাকে ছুঁইতেও চাহিল না। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া উত্তরাপথে ওহাবী Puritanism এর বিদ্রোহ ও প্রভাব থাকে—উহা শেষ হয় স্যর সৈয়দ-আহমদের অভ্যুত্থানের পরে। বাঙলায়ও ওহাবী আন্দোলন প্রবল ছিল। তাহারা এখানেও বিদ্রোহ করিয়াছে, সন্ত্রাসবাদের পথ তখন গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যাহা বড় কথা—ইস্লামের আসল প্রভাব তখনই বিস্তৃত হইয়াছে জনগণের মধ্যে।

এই বাঙলার কাল্‌চারের পর্বগুলি নানাদিক দিয়া আবার মনে করিবার দরকার নাই। পূবাপর ইহার অসামঞ্জস্যটা এখন সহজেই আমরা বুঝিতে পারি। যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়া আহরণ করিয়াছি, জীবনক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না,—যে সংস্কৃতির প্রেরণা শুধুই মানস-গত, বস্তুগত

বাঙলার মুসলমান-সাধারণ, বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমান, ওহাবী আন্দোলনে, উহার প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় দুই ভাবেই, বিশেষ রকমে শরিয়তনিষ্ঠ মুসলমান হইয়া উঠেন। তাহার ফলে তাহাদের ধর্মানুরাগ বাড়িয়াছে, মাদ্রাসা, মক্তব ও তাহাতে কোরাণ হাদিসের চর্চা বাড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মুসলমান জনসাধারণ নিজেদের জন-সংস্কৃতির কোনো কোনো রূপকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী হিন্দুদের মত পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণেও উদ্যোগী হন নাই। অবশ্য একটি কথা ভুলিবার নয়—বাঙালী মুসলমান পল্লীবাসী, উত্তরাপথের মুসলমানের মত শহরে থাকে না। এখানে উত্তরভারতের মত কোনো দরবারী কায়দা-কানুন, আদব-আচার, শিক্ষা-দীক্ষা (ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া অন্যত্র) গড়িয়া উঠা সম্ভব ছিল না। কাজেই সাধারণভাবে, সাধারণ বাঙালী মুসলমান উত্তর ভারতের মুসলমানের মত ইংরাজ রাজা হইলে কোনো একটা দরবারী সংস্কৃতি হারাইয়াছিল, তাহা বলা বোধহয় ঠিক নয়। তবু নিশ্চয়ই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল—যখন তাহাদের 'আয়মা' সম্পত্তি বাতিল হয়, উহার দ্বারা পালিত মসজিদ-মাদ্রাসা অচল হয়। আর, যতই দিন গিয়াছে ততই নবাবী আমলকে নিশ্চয়ই তাহারা বেশি আপনার বলিয়া মনে মনে ধারণা করিয়া লইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের শিক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকার আসল কারণ, লেখকের বিবেচনায় অত্যন্ত বাস্তব : তাঁহারা অধিক দরিদ্র,—বরাবরই তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন। কারণ তাঁহারা অধিকাংশই শোষিত শ্রেণীর লোক। মুসলমান হইয়া মুসলমান আমলে কতকগুলি ধর্মগত অত্যাচার হইতে তাঁহারা মুক্ত হন, কিন্তু জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহারা শোষিতই রহিয়া যান। কাজেই, দরিদ্র তাঁহারা বরাবর ছিলেন। তাহার উপর তাঁহারা ছিলেন পল্লীবাসী। ইস্কুল কলেজ থাকিত শহরে। এই কারণেও তাঁহারা আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই—ঠিক যেমন এরূপ শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ এখনো গ্রহণ করিতে পারেন না ভারতের হিন্দুপ্রধান প্রদেশের হিন্দুরা—মুসলমানদের তুলনায় সেখানে তাঁহারা অনগ্রসর। এই কারণেই বাঙলার মুসলমান-সাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। গ্রামে-গ্রামে মসজিদ-মাদ্রাসায় তবু তাঁহারা ইসলামী শিক্ষা বেশি লইয়াছেন, আর তাহাতে আবার ইংরেজি শিক্ষার আরও বিরোধিতা করিয়াছেন। যে মুষ্টিমেয় বাঙালী মুসলমানা জনকয় অভিজাতদের বংশধর বা বড় সওদাগর বণিকের বংশধর ছিলেন তাঁহাদের অবশ্য বরাবরই আদর্শ 'নবাবী'—মানে, মৃত সামন্ততন্ত্রের আদব কায়দা গোলাম-বাঁদী, বেগম-জেনানা লইয়া তাঁহারা এমনই একটা জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়া বসেন যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। ইহাকে 'ওহাবি প্রতিবাদ' বলিয়া ভুল করা ঠিক নয়। মোটামুটি তবু এই 'ওহাবি প্রতিবাদ' 'নবাবী আয়েস' ও দারিদ্র্য এবং গ্রামীণতার ফলে বাঙলা মুসলমানের মধ্য হইতে তেমন 'মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী' তখন উঠিতে পারে নাই। আজ তাহার উত্থান ঘটিতেছে—নানা সুবিধা লাভে তাড়াতাড়িই এই উত্থান ঘটিতেছে। সেই নূতন মুসলমান মধ্যবিত্ত এই 'বাঙলার কাল্‌চারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইতেছেন (দ্রষ্টব্য মৌঃ মুজিবর রহমান খাঁ ও আবুল মনসুর আহমদ সাহেবদের 'পাকিস্তান রেণেসাঁ সোসাইটির' অভিভাষণ), তাঁহারা 'মিশ্র কাল্‌চারের' ভুল না করিয়া বসিলেই ভালো।

নয়—তাহার স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। একটা আত্মবিরোধ তাহাতে রহিয়াই গিয়াছে। প্রেরণা হিসাবে ইহা সত্যই আন্তরিক, কিন্তু ইহার গোড়ায় মাটি নাই। সেই গোড়ায় একটা প্রাগ্-ধনিক দিনের বালুর চড়া পড়িয়াছিল—তাহা হইতেও আমরা রস সংগ্রহ করিতে চাহিলাম, নূতন 'জাতীয়তাবোধে' (প্রথম হিন্দু এবং পরে মুসলমান) ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করিতে গেলাম, কিন্তু রসের আসল উৎস ছিল শুধু মনে। প্রাণবান্ মনীষা যেন তাই এই জীবনযাত্রায় আর কিছুতেই স্বস্তি পায় না। বিবেকানন্দ তাহারই আঘাতে দরিদ্র নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করিলেন। "বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল অসন্তোষে, জীবনে গভীর অতৃপ্তিতে, ধর্মের সূচনা হয়।" "Religion begins with a tremendous dissatisfaction with present state of things, with our lives…" (Vivekananda)। তাই সেদিন ধর্মের পথই ছিল প্রাণবান্ পুরুষের পথ। কেশবচন্দ্র উহারই মধ্য হইতে একদিকে সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আর দিকে সামন্ততন্ত্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন—সমসাময়িক বাঙালী কাল্‌চারের শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপি ইহাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও এই বিলাতী পিউরিটান সংস্কৃতিকে সেই ধর্মের পথ দিয়াই বাহিত করিয়া দিল। আর পরবর্তী হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া করিয়া ভিক্টোরীয় যুগের যুক্তিবাদ ও স্বাজাত্যবোধ এবং বিবেকানন্দের প্রেরণা প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া এই ব্রাহ্ম-সমাজের আসল দাবীই অঙ্গীকার করিয়া ফেলিল।

সামাজিক স্থান

একবার বাঙলার কাল্‌চারের নানাদিককার রথীমহারথীদের নামগুলি স্মরণ করিলেই এবার বুঝিতে পারিব—ইহা তাহাদেরই কাল্‌চার যাহারা ইংরেজী বুর্জোয়া শিক্ষার রসাস্বাদন করিল; আর তাহাদের আসনও আমাদের বাঙলার অর্ধসামন্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই; আর এই মানসিক ঐশ্বর্যের জন্যই এই অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তাহাদের স্থান হইল সেই সম্মানিত পংক্তিতে। মধুসূদন পাইকপাড়া ও জোড়াসাঁকোর জমিদারদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। হেমচন্দ্রেরও সে মর্যাদালাভ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। আর রবীন্দ্রনাথের কথা ত উঠেই না। জীবনে ইঁহারা কেহ ডিপুটি, কেহ উকীল, কেহ ব্যারিষ্টার,—দুই একজন

মাত্র জমিদার শ্রেণীর ;—মোটের উপর মধ্যবিত্তের উপজীবিকা ইঁহাদের প্রধান সম্বল। তথাপি এই বুর্জোয়া-প্রেরণাকে বাঙালী মধ্যবিত্ত আপনার করিয়া লইলেন আপনাদের মানসিক চেষ্টায়। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলার সাহিত্য পরিষদ্, বাঙলার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, কলেজ, হাসপাতাল সব কিছুই সেই উপজীবিকালম্বী বাঙালী উকীল-ব্যারিষ্টার ও দুই একজন অর্ধসামন্ত জমিদারের সৃষ্টি। বাঙলার শিল্পপতিরা সাহেব, তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন বিলাতের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। তাই বাঙালীর এই কাল্‌চার, এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণা পর্যন্ত মানসিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙালী শিক্ষিত সমাজের বাস্তব বিকাশ-পথ এত রুদ্ধ হয় নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের মানসিক সম্পদ এবং তৃতীয়ত আপন পারিবারিক ধারারও তদনুরূপ দান—এই সকলের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথে। তাই তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ মানবধর্মী কবি —ব্যক্তি-সত্তার শ্রেষ্ঠ মহিমা তাঁহারই কণ্ঠে উদ্‌গীত হইল। কিন্তু তবু তাঁহারই জীবনকালে স্পষ্ট হইয়া উঠে—কত সামান্য বনিয়াদের উপর বাঙালীর এই কাল্‌চার গঠিত। উহার গোড়াকার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার' মৃত্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় এত বাড়িল যে কেরানীশালায় স্থান হইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরে বাঙালী শিক্ষিতদের শ্রেণীতে বেকার-দশা গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল—'ভদ্রলোকের' জীবিকায় প্রবল দাবীদার হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল নব্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও মুষ্টিমেয় নিম্নবর্ণ শিক্ষিত হিন্দু), এই মধ্যবিত্তের চাকুরীর কাড়াকাড়িই মূলত বাড়িতে বাড়িতে দাঁড়াইল সাম্প্রদায়িক মারামারিতে। কিন্তু ১৯২১এর পর হইতে বাঙালী 'ভদ্রলোকের' মনে মধুসূদন-বঙ্কিম যুগের সেই প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায়? সবল মানসিকতা আর তখন টিঁকে না— তাহার পল্লীসভ্যতা তখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার আসন ধ্বসিয়া যাইতেছে, এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশপথও তাহার অগোচর। যে কাল্‌চারের গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার পরিবেশে সমাজগত পুষ্টি নাই,—শুধুমাত্র একটা মানসিক আবেগকে

সম্বল করিয়া মাত্র জনকয় চাকুরের প্রয়াসে যাহা রূপ পাইয়াছিল, সেই 'বাঙলার কাল্‌চার' কি উনিশ শত ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে আসিয়াই পৌছায় নাই?

কারণ ইতিমধ্যে তাহার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রা' ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে এক বিদেশী-পুষ্ট শিল্পযুগের (Industrialism) পত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষ শুধু কৃষি-প্রধান নয়, ১৯২০ এর পরে পৃথিবীতে সে শিল্পেও অগ্রসর দেশ হইতে চাহিল। অবশ্য সেই শিল্পেরও সর্বপ্রধান উদ্যোগকেন্দ্র বোম্বাই নয়, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ। এইখানেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি 'লগ্নী পুঁজি' (Finance Capital) শতবাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে; এণ্ড্রু ইয়ুল, শ'-ওয়ালেস্, বেগ ডান্‌লপ, অক্টোবিয়াস্ স্টিল প্রভৃতি ট্রাস্ট, কার্টেল পৃথিবীময় তাহার সম্পর্ক পাতিয়াছে। তাহার প্রসারে বাঙলার মধ্যবিত্ত বা বিত্তবানদের কোনো প্রসারের পথই হইল না। এদিকে ভূমি-সমস্যার ও ঋণভার সমস্যার জটিল আবর্তে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই এক প্রকাশ দেখা দিল বাঙলার কাল্‌চারের বিরুদ্ধে মুসলমান বাঙলার বিদ্রোহে, আর এক প্রকাশ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তায়। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই বাঙলার জমিদারী যাইতে বসিল, মধ্যবিত্তের অদৃষ্টে বেকারত্ব ছাড়া কিছুই নাই; শতকরা পঞ্চাশজন কৃষকের তখন জমি নাই—বাঙলার কাল্‌চারের ভবিষ্যৎ তবে কোথায়? পৃথিবীব্যাপী ধনিকতন্ত্রের সঙ্কটের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের এই হিংস্র অন্ধকারে ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রায় তৈলহীন স্তিমিত শিখা নিবিয়া আসিতেছে—'ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের' আয়ু আর কোথায়?

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট আসিল কি বাঙলার শুধু বিরোধ ও বিভাগের লিপি লইয়া,—না এই মধ্যবিত্ত বাঙলার কাল্‌চারের মৃত্যুলিপি লইয়া?

গ্রন্থ-পঞ্জী

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী, বিশেষত, বঙ্গদেশের কৃষক, সাম্য, অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র।
মধুসূদনের জীবনী (যোগীন্দ্রনাথ বসু) ও মধুস্মৃতি (নগেন্দ্রচন্দ্র সোম)।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা, বক্তৃতা প্রভৃতি।
রাজনারায়ণ বসুর লেখা।
সংবাদপত্রের সেকালের কথা—সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
কৃষি-ভারতের নগ্নরূপ—সুধীপ্রধান।
ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (ইংরাজি)।
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন।
India Today—R. Palme Dutt ('আজিকার ভারত')।
Modern Indian Culture—D. P. Mukerjee.
Imperialism—Lenin.
Empire of the Nabobs—Hutchinson.
India in the Victorian Age—R. C. Dutt.
A sketch of the History of India—Dodwell.
Cambridge History of India—Vols V, VI.
'Fifth Report'—Ed. by Firminger.
History of Bengal, Vols I & II, (Dacca University).

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা

'কালোবাজারী কাল্‌চার'

১৯৪৭ এর "পনেরই আগস্ট" ভারতবর্ষের আধুনিক জীবনে এক পর্বান্তর সূচনা করিয়াছে। পরিবর্তনটা এখনো পর্যন্ত প্রধানত রাজনৈতিক। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝা যায়, নিতান্ত এক রাজবংশের স্থলে অন্য রাজবংশের ক্ষমতা লাভ নয়; জনগণের বিপুল ও সুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক প্রয়াসের সহায়ে এক নূতন শাসক-গোষ্ঠীর রাজ্যাভিষেক; একটা সামাজিক আলোড়নের রাজনৈতিক প্রকাশ—সম্পূর্ণ না হউক, ভারতীয় সামাজিক শক্তির আংশিক প্রতিষ্ঠালাভ। বলা বাহুল্য, ইহার সামাজিক ফলও ফলিতে বাধ্য; আর তাই 'পনেরই আগষ্টের' পরিবর্তন আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে নূতন পর্ব সূচিত করিবে। আপাত দৃষ্টিতে দেখিলেও মনে হইবে—পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া দেশের প্রায় সমস্ত প্রান্তের ছোট বড় সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক—এমন কি পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও ইঁহাদের দেশপ্রাণা স্ত্রী-কন্যারা পর্যন্ত নানা বাণীতে, নানা উপলক্ষে অক্লান্ত ভাবে দেশবাসীকে এই কথা বুঝাইতেই লাগিয়া গিয়াছেন—আমাদের "নবলব্ধ স্বাধীনতা"য় ভারতীয় সংস্কৃতি (যাহার প্রতীক গান্ধীজী) এইবার জগৎ-উদ্ধারে বাহির হইতেছে—অবশ্য যদি না—ইত্যাদি। সত্যই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দাবা-দাবি এইবার সজ্ঞানে আরম্ভ হইয়াছে, সংস্কৃতিবান্‌রাও সজ্ঞানে মাতামাতি শুরু করিয়াছেন —হয়ত নানাবিধ দক্ষিণার আকর্ষণও এই দিকে কম নয়। কিন্তু যাহা তথাপি সত্য, তাহা এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছাপ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে না পড়িয়া পারে না। এবং বাগ্‌বাহুল্য সত্ত্বেও সেই ছাপের মধ্যে ফুটিবে সত্যকারের রাজনৈতিক-সামাজিক বিন্যাসের রূপও।

'পনেরই আগস্টের' রাজনৈতিক-সামাজিক সেই স্বরূপ কি, তাহাই তাই আজিকার দিনের ও কালিকার দিনের ভারতীয় সংস্কৃতির কথা ভাবিতে বসিলে প্রথম ভাবিয়া দেখিতে হয়। কথাটা হয়ত এখন (১৯৪৯-এর জানুয়ারীতে) আর ততটা বিতর্কমূলক নয়—দেড় বৎসরে পনেরই আগস্টের

'স্বাধীনতার' স্বরূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সত্য পরিষ্কার যে, 'পনেরই আগস্ট' ভারত বিভাগ যতটা সম্পূর্ণ করিয়াছে, বিভক্ত ভারতের দুই খণ্ডের স্বাধীনতাকে ততটা সুনিশ্চিত করে নাই। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ তাহার "ভেদ-বিভেদের নীতিকে" পনেরই আগস্টের আবরণে,—বর্তমান দুনিয়ায় ও নিজের বিপদে ও ভারতীয় জনগণের বিপ্লবের মুখে—যতটা কার্যে পরিণত করা সম্ভব, তাহা করিয়াছে—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের শেষ দশায়ও, ব্রিটিশ দুর্বলতার সুযোগে ও ভারতীয় গণ-বিপ্লবের সহায়তায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা দেশের স্বাধীনতা যতটা আয়ত্ত করিবার তাহা করিতে পারে নাই।—ভারতবর্ষ "স্বাধীন" হয় নাই—আর্থিক স্বাধীনতা পায় নাই ইহা সর্বস্বীকৃত; আর আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয় না, ইহাও এই যুগে পরিষ্কার। হইলে "স্বাধীন" মিশর বিশ বৎসর আগেই 'স্বাধীন' হইয়াছিল। কমনওয়েলথ-অন্তর্ভুক্ত স্বাধীনতা যে কোনো কালেই স্বাধীনতা নয়, এই কথা নেতারা যাহাই ঘোষণা করুক, ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনায় স্বতঃ-সিদ্ধ। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে থাকাই যদি 'বিচ্ছিন্নতা' (isolation) হয় তাহা হইলে চীন জাপান হইতে ফ্রান্স-জার্মানি ইতালি সকলেই কেন কমনওয়েলথে ঠাঁই নেয় না? ভারতীয় চিন্তায় স্বাধীনতার অর্থ শুধু শাদা শাসক-গোষ্ঠীর স্থলে কালো শাসক-গোষ্ঠীর অভিষেক নয়; স্বাধীনতার অর্থ—জনগণের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের বিজয়। আর সেই গণতান্ত্রিক বিজয় বলিতে ১৯১৭-এর পর হইতে বুঝায় সমাজতন্ত্রী সমাজের উপযোগী বনিয়াদ রচনা। বলা বাহুল্য, কি আর্থিক স্বাধীনতা, কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা—সব জিনিসের সত্যকারের প্রতিষ্ঠা আজ সম্ভব সমাজতন্ত্রে—অন্তত তদুপযোগী নব্য গণতান্ত্রিক "পাদপীঠ" রচনায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফাদারী

জিজ্ঞাস্য এই, পনেরই আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কোনো মূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি? ভারতের সুদীর্ঘ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও গত দেড়শত দুইশত বৎসরের ঔপনিবেশিক অর্ধসামন্ত যুগের অবসান এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণেই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও সমাজ-বিপ্লব ভারতীয় জীবনযাত্রার মূল অভীষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ এই বিপ্লবী প্রয়োজন আরও ঘনাইয়া তোলে। এই মহাযুদ্ধকালে যে সামাজিক বিপর্যয় সংসাধিত হইয়াছে বাঙালীর পক্ষে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য নয়—যুদ্ধ ও মন্বন্তরের মধ্যে পড়িয়া যে কৃষি-নির্ভর বাঙালী সমাজ ১৯২০ হইতে ভাঙিয়া যাইতেছিল তাহা এই সময়ে একেবারে গুড়াইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভারতীয় সমাজের শ্রেণীগত বিপর্যয় যাহা ঘটে তাহা সমগ্র ভারত জুড়িয়াই ঘটে :—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে স্বদেশী ধনিকতন্ত্র জন্মিয়াও সাম্রাজ্যবাদের চাপে সবল ও সক্রিয় হইতে পারিতেছিল না, এইবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সেই খর্বকায় ভারতীয় ধনিকতন্ত্র একেবারে "লুঠ" পাইল। যুদ্ধকালে মোটের উপর ভারতীয় শিল্পের বা কলকারখানার যে প্রসার ঘটিল তাহা নয়—কলকব্জা নাই, যুদ্ধকালে তাহা আসেও নাই শিল্পের প্রসার ঘটিবে কোথা হইতে? (দ্রষ্টব্য Jurgen Kuezynski রচিত *A short History of the Labour Conditions in the British Empire,* 1800 to Present Day, P 16).

অবশ্য এই যুদ্ধকালে অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়, মার্কিন মুলুকের শিল্প দেড়গুণ হয়, ব্রিটেনের শিল্প সোয়া গুণ হয়। ভারতে কিন্তু সত্য সত্যই 'শিল্প-বিপ্লব' তখন ঘটে নাই ; উৎপাদনশক্তি বিকাশের মত সুযোগ পায় নাই—যুদ্ধ সম্পর্কিত কারখানাগুলিতে তিন শিফটে কাজ চলিয়াছে ; কিন্তু শিল্পের প্রবর্তন বেতালা নিয়মে হইয়াছে ; 'গুরু শিল্পের' গোড়াপত্তনও হয় নাই, তাই ভারতীয় শিল্পযুগের সত্যকারের বনিয়াদও স্থাপিত হয় নাই। যুদ্ধকালে সমস্ত দেশ জুড়িয়া যাহা ঘটিল তাহা আমরা জানি—যুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধের ঠিকাদারী, পণ্যের ও খাদ্যের মজুতদারী, চোরা-কারবার, অকল্পনীয় চুরি ও জোচ্চুরির বিকৃত পথে ভারতীয় ধনিক-তন্ত্রের মুনাফা-শিকার অবাধে বাড়িয়া গেল। মুনাফার তৎকালীন হিসাব লেখাজোখা নাই—অথবা সে হিসাব জানে শকুনি-শৃগালে—দুর্ভিক্ষে মহামারীতে বাঙলারই ৩০।৩৫ লক্ষ নারীপুরুষ যাহাদের আহার জোগাইয়াছে। খাতায়-পত্রে যেইটুকু হিসাব শিল্পপতিরা রাখিয়াছে—বলা বাহুল্য, বর্ধিত আয়-কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে এই সব হিসাবেও মুনাফা যথাসম্ভব কম করিয়াই প্রদর্শিত হইয়াছে—সেই শিল্পপতিদের অঙ্ক হইতে সরকারী হিসাব স্থির হইয়াছে ; তাহা হইতে আমরা জানি—সমস্ত মুনাফার গড় হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২৮এ ব্যবসাপত্র বাড়ে ও

মুনাফা বাড়ে; সেই ১৯২৮এ যদি মুনাফা ধরা হয় ১০০, তাহা হইলে ১৯৩৯এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে সেই মুনাফা ছিল ৭২.৪ এ; ১৯৪০এ তাহা ৯৯.৯ এ দাঁড়ায়; তারপর ১৯৪১এ উহা চড়ে ১৩৫.৪ এ; ১৯৪২এ তাহা বাড়িয়া দাঁড়ায় ২৬৯.৪ এ। কিন্তু ইহার পরেই আসিল লুঠের যুগ; চোরাবাজার ও কণ্ট্রোলের ধাপ্পা; আর তখনকার মুনাফার হিসাব আর নাই। কাগজেপত্রে দেখানো মুনাফার দুই-একটি হিসাবের কথা জানিতে পারা যায়:—যেমন, তাঁত-শিল্পের মুনাফা ১৯৩৯এও উচ্চ ছিল, ১৫৪.৪; ১৯৪২এ তাহা হইয়াছে ৭৬০.৭। ইহার পরে লুণ্ঠনের যুগ। চটকলে ১৯৩৯এ লাভ ছিল ১ হাজারে ১০৮; ১৯৪৩-এ ১ হাজারে ১০০২, ইঞ্জিনীয়ারিংএ মুনাফা সর্বাপেক্ষা বেশি বাড়ে—১৯৩৯এ তাহা ছিল ১ হাজারে ৪ হাজার টাকা, ১৯৪৩এ হয় ৯ হাজার ৬৩৭ টাকা। শিল্প হিসাবে দেখিলে দেখিব এই (১৯৩৯-৪৫) ছয় বৎসরে মালিকের নীট্ মুনাফার হার পাটশিল্পে হয় ৯ গুণ, বস্ত্রশিল্পে হয় ৬ গুণ, চাএ ৩ গুণ, চিনিতে ১.২৫ গুণ (দ্রষ্টব্য সরকারী হিসাব: *Recent Social Economic Trends in India*; লেখকের 'সোনার দেশ', শতাব্দীর লেখা, ১৩৫৩)। ইহার উপরে চোরা-বাজারের ও অন্যান্য চুরির কথা মনে রাখা দরকার।

ভারতীয় পুঁজির "সিদ্ধি"পথ

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার এই মুনাফা মৃগয়ার মূল। প্রথমত, তখন শিল্পোন্নতি ঘটে নাই, কৃষিরও উন্নতি ঘটে নাই। দ্বিতীয়ত, এই মুনাফার বহর দেখিয়া পূর্বকার রাজা-জমিদাররাও ব্যবসায়ে নামিয়াছে; সামন্ততন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের মধ্যে স্বার্থগত যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারতের এই সামন্ত-ধনিক শোষক শ্রেণীর সহিত ব্রিটিশ ধনিক শোষক শ্রেণীরও তখন বুঝাপড়া হইতে থাকে, বিদেশীয় পুঁজিপতিরা অবস্থান্তরে দেশীয় পুঁজিপতিদের নিজেদের অংশীদার করিয়া লইতে থাকেন (দ্রষ্টব্য অরুণ বসুর *The Indian Bourgeoisie in War and Post-war Crisis* নামীয় পুস্তিকা,—এণ্ড্রু উইল ও ওঙ্কারমল জেঠিয়া, অক্টোবাস ইঞ্জিনীয়ারিং, বি. আই. সি. ও-তে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রভৃতি; টাটা ও ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল, বিড়লা ও ন্যুফিল্ড প্রভৃতির অংশীদারীত্ব)। ইহার অবশ্য

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণ আছে: যুদ্ধকালে ব্রিটিশের পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিনষ্ট হয়, ভারতীয় মহাজন হইতে তাহারা ভারতের ১৫০০ কোটি টাকার খাতক (টাকাটা প্রধানত বাঙালার ৩৫ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারীরই প্রাণ ও মানসম্ভ্রমের বিনিময়ে ভারতবর্ষ অর্জন করিয়াছে—যদিও পাওনা ষ্টার্লিং ব্যালান্‌স্‌ রূপে এখনো বাকীই পড়িয়া আছে)। দ্বিতীয়ত, এই বিকৃত মুনাফা লাভে ভারতীয় পুঁজিপতিও যথেষ্ট সবল হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারতের প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বিদেশী শোষণকে সংরক্ষণ করিতে হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আর শুধু রাজা-মহারাজার "দালালিতে" তাহা করা সম্ভবপর নয়, ভারতীয় পুঁজিপতি ও তাহাদের মুখপাত্রদেরও লুণ্ঠনের বখরা দিয়া মুখ বন্ধ করিতে হয়। অতএব একদিকে শোষণে অংশীদারত্ব দিয়া বিদেশী ধণিকতন্ত্র যেমন স্বদেশী বনিয়া যাইতে থাকে, শাসনেও তেমনি এই 'স্বদেশী' মালিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারা "সাম্রাজ্যবাদের স্বদেশী বেনামদার" (collaborationist) তৈয়ারী করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষ কথা, এই মহাযুদ্ধকালে ভারতের এই বিকৃত ধণিকতন্ত্রের পুঁজিও আবার অন্যান্য দেশের ধণিকতন্ত্রের পুঁজির মতই ক্রমশ স্ফীত ও কেন্দ্রীভূত (concentration of capital) হইতে থাকে; অর্থাৎ পুঁজি ক্রমশই মুষ্টিমেয় মহামালিকচক্রের (প্লুটোক্রাট্‌সদের) হাতে আসিয়া জমে। এতদিন ভারতবর্ষে এইরূপ "লগ্নী পুঁজি" (finance capital) ছিল প্রধানত বিদেশী; শ' ওয়ালেস্‌, জার্ডিন স্কিনার প্রভৃতি কোম্পানীও তাহাদের ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট প্রভৃতি। এখন দেখা দিল টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, ইস্পাহানি, জে. কে. ইণ্ডাষ্ট্রীজ ও তাহাদের গঠিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি, যুদ্ধকালের মুনাফায় গঠিত বড় বড় অন্য ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্ট, প্রভৃতি। যুদ্ধ শেষেই দেখা যায়—৮০০ প্রধান প্রধান ব্যবসার (চা-বাগান, খনি, কারখানার) কর্তা মাত্র ৩০টি পুঁজিচক্র। ৭৫ জন পুঁজিপতি নানা কোম্পানির মোট ১ হাজার ডিরেকটরি ভাগ-যোগ করিয়া লইয়াছে—ইহার মধ্যে ১৫ জন (লগ্নী পুঁজির কর্তা) ৬০০ ডিরেক্টরির অধিকারী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাই বিকৃত পথে হইলেও ভারতীয় মালিকতন্ত্র সাবালক হয়, শিল্পবৃদ্ধি ছাড়াই মুনাফার "সিদ্ধিপথ" আবিষ্কার করে; এবং পৃথিবীর নূতন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সে অংশীদারত্ব লাভ করে—

সাম্রাজ্যবাদী ও মুনাফাতন্ত্রী শাসনের বেনামদার সৃষ্টির উপযোগী সামাজিক বনিয়াদও তাই এই সময়ে রচিত হয়।

অবশ্য বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় মালিকতন্ত্রের এই ঐক্যের পথ রচিত হয় আন্তর্জাতিক কারণেও—এই মহাযুদ্ধে পৃথিবীজোড়া ধনিকতন্ত্রের শক্তি নাশ হয়, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হয়। শোষণের দায়ে মার্কিণ ব্রিটিশ নেতৃত্বে পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রীদের একত্র হইবার তাগিদ বাড়িয়া যায়—নিজেদের স্বার্থবিরোধকে সাময়িকভাবে উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে সচেষ্ট হয়।

কৃষি-বিপর্যয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ধনিকতন্ত্রের বিকাশের মতই বৃহৎ সত্য ভারতে বিপ্লবী শক্তির জাগরণ। এই জাগরণ প্রধানত "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন" রূপে প্রকাশ হইয়া উঠে; তাহার অন্তরবস্থিত গণশক্তিকে সচেতন ও বেপরোয়া করিয়া তোলে মহাযুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের লুণ্ঠন—মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, মন্বন্তর, মহামারী। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কৃষিসংকট এই সময়ে রুদ্রভাবে প্রকট হয়—কর্ষিত মোট জমির পরিমাণ দিনে দিনে কমিয়াছে (১৯২১-২২এ ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ একর জমিতে চাষ হইত; সেই স্থলে ১৯৪১-৪২এ ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়); উৎপন্ন খাদ্যশস্য কমিয়াছে (দ্রষ্টব্য W. Burns রচিত *Technological Possibilities about Agriculture in India*), ১৯২১-২২এ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টন; সেই স্থলে ১৯২১-২২এ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইল ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টন)—যাহা উৎপন্ন হয় তাহার সামান্য অংশই পায় উৎপাদক কৃষক, অধিকাংশই যায় খাজনায়, ট্যাক্সে, সুদে শোষিত শ্রেণীর উদরে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় কৃষির আর কোন উন্নতি সম্ভব নয়—সেচ, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি, বাজারের ব্যবস্থা, সমবায়ের রীতি প্রবর্তনের পরিবর্তে বরং মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার, ইত্যাদিতে মিলিয়া চলিল কৃষক-সংহার। যুদ্ধের কালে তাই দরিদ্র কৃষক নিঃস্ব হইয়াছে। মধ্যাবস্থার কৃষক দরিদ্র হইয়াছে, অবস্থাপন্ন কিছু কৃষক মধ্যাবস্থায় নামিয়াছে। কিছু এই দুর্দশাগ্রস্তদের জোতজমি কিনিয়া সম্পন্ন জোতদার বা "কুলাকে" পরিণত হইয়াছে—খাদ্যের মজুতদারী ও চোরাবাজারের সাহায্যে গ্রাম-

অঞ্চলে এই শোষক কুলাকশ্রেণী (পুরাতন জমিদারদের অপেক্ষাও) ক্ষমতাশালী হয়। রাষ্ট্রেও তাহাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। মোটের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ একটু মাত্রও কমে নাই—বরং যুদ্ধকালীন আঘাতে গ্রামাঞ্চলেরও শোষক ও শোষিতের মধ্যে বৈষম্য অধিকতর হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে কৃষি-ব্যবস্থাও যুদ্ধের আঘাতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাহার অর্থ গ্রাম্য-সমাজও আর নাই, ভারতবাসী বাধ্য হইয়াই এবার শহরমুখো হইয়াছে।

শ্রমিকের দুর্দশা

অথচ সাধারণ শ্রমজীবীর সংখ্যা যত বেশি হউক, যন্ত্রশিল্পের প্রসার না ঘটায় সেই অনুপাতে কলের শ্রমিক ভারতবর্ষে বেশি বাড়ে নাই। যুদ্ধকালে যুদ্ধের নানা বিভাগে ও কারখানায় তিন শিফটে কাজ চলায় শ্রমিকের সংখ্যা সাময়িক বৃদ্ধি পায়—অনুমান তাহা প্রায় ৭০ লক্ষে দাঁড়ায়; কিন্তু বুঝা যায়, কল-কারখানা না বাড়িলে যুদ্ধশেষে ইহারা অধিকাংশই বেকার হইবে (হইয়াছেও)। যুদ্ধ-কারখানার মজুরদের জন্য যুদ্ধকালে রেশন ও মাগ্‌গী ভাতার ব্যবস্থাও ছিল—অবশ্য কোনো সময়েই দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে শ্রমিকের আয় বর্ধিত হয় নাই। 'টাকার বেতন' কিছুটা বেশি হইলেও শ্রমিকের 'আসল মজুরী' (রিয়েল ওয়েজ) কোথাও প্রায় বাড়ে নাই, যুদ্ধের পূর্বেও অবশ্য ভারতীয় শ্রমিকের 'আসল মজুরী' ছিল 'জীবিকা ব্যয়ের' (লিভিং ওয়েজ) তুলনায় কম। যদি ১৯০০ সালে এই জীবিকাযোগ্য ব্যয়, 'টাকার বেতন' ও 'আসল মজুরী' তিনের সমতা ছিল (আসলে ছিল না) এইরূপ ধরিয়া লইয়া হিসাব করা যায় (ধরিয়া লই তখন এইসব সংখ্যা ছিল ১০০৲), তাহা হইলে যুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় শ্রমিক সাধারণের গড়ে 'টাকার বেতন' ছিল ১৭৮৲, 'জীবিকাযোগ্য ব্যয়' ১৩৯৲, কিন্তু 'আসল মজুরী' ১২৮৲ মাত্র। ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত পূর্বাপর প্রায় এই 'জীবিকাযোগ্য ব্যয়ের' অপেক্ষাও কম চলিয়াছে শ্রমিকের প্রকৃত আয়—অর্থাৎ তখনো ভারতীয় জেলের কয়েদীরাও (অবশ্য খাতাপত্রে) যদি ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকের অপেক্ষা বেশি খাইতে-পরিতে পাইবার কথা (দ্রষ্টব্য KUCZYNSKI রচিত পূর্বোল্লেখিত *Labour Conditions,*

'Labour Conditions in India' পৃঃ ২৫-৪৯)। যুদ্ধকালের মুদ্রাস্ফীতিতে ধনিকস্ফীতি ঘটে শ্রমিককে (এবং সাধারণ দেশবাসীকেও) ভাত-কাপড়ে মারিয়া। তবু যে শ্রমিক তখনো কতকটা বাঁচিয়াছে তাহার কারণ সে তখন 'রেশন' পাইত, খাদ্যের জন্য চোরা-কারবারীর কবলে পড়ে নাই। না হইলে সমস্ত ভাতা কুড়াইয়া-কাড়িয়াও তাহার আয় যুদ্ধকালেও কোনো শিল্পেই টাকায় এক টাকাও বাড়ে নাই, অথচ ১৲ টাকার দ্রব্য তখন প্রায় গড়ে ৩৲ (কলিকাতায় সামান্য কম, কানপুরে সামান্য বেশি) হয়। মুনাফাখোরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রধান শিল্পের মজুরের 'মূল বেতনের' (বেসিক ওয়েজ) হিসাব লইলে দেখি :—

চটকলে মুনাফা হইয়াছে শতকরা ৯০০ হারে; আর চটকলের ৩।০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে আধা-দক্ষ শ্রমিকের মজুরী ছিল ৩৫৲; অ-দক্ষের মজুরী ২০৲; আর মাগ্‌গী ভাতা সকলের ৮৲।

কাপড়ের কলের মুনাফা হয় শতকরা ৬০০এর মত—মজুরী বিভিন্ন কেন্দ্রে ও এলাকায় বিভিন্ন রূপ, ন্যূনতম মজুরী ৩০৲, আর সর্বাধিক মজুরী (বোম্বাই-আহমদাবাদে) ৬০৲।

লৌহ-ইস্পাতের কারখানায় মুনাফা হয় শতকরা ২০০ হিসাবে। টাটার কারখানাতেই সর্বাধিক মজুরী দেওয়া হইত, সেখানে গড়ে শ্রমিকের মাসিক ছিল ৩৫।৶০। শতকরা ২৫ জন শ্রমিকের অবশ্য মাসিক আয় ২৫৲।৩০৲, আরও ২৫ জনের ২০৲।১৫৲ টাকা।

খনির মালিকেরা লাভ করিয়াছে শতকরা ৩২৫ হিসাবে। আর খনির মজুরের আয় ভাতাশুদ্ধ মাসে ৩৭৲; ইহাদের জীবন পশুর মত।

চা-বাগানে মালিকদের আয় হয় শতকরা ৩০০ হিসাবে। ভালো বাগানে পুরুষের বেতন ১২৲, মেয়েদের ৯৷০, বালকের ৪৷৶০। পুরুষ ও মেয়েরা সস্তা রেশন বাবদ পাইত ১৷০।

রেলের ও ডাকের কেরানী-কর্মচারী হইতে সাধারণ শ্রমিক-পিয়াদার বেতনের হিসাবও ইহারই অনুরূপ।

এই হিসাবপত্রে শ্রমিকের জীবনযাত্রার চিত্র, অভাব ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। (যে-কেহ যুদ্ধান্তের Rege Committee-র বিভিন্ন শিল্পের অনুসন্ধান রিপোর্টের খণ্ডগুলি বা যুদ্ধপূর্বকার লীগ্ অব্ নেশন্‌সের *Report on Industrial Labour in India.* I. L. O. বা Whitley

Commission-এর রিপোর্ট এই জন্য আলোচনা করিতে পারেন)। কিন্তু মুনাফার বহর ও শ্রমিকের মজুরীর পারস্পরিক হিসাব হইতে মূল সত্য পরিষ্কার হইয়া উঠে—মুনাফাভোগী মালিকশ্রেণীর ও মুনাফা-স্রষ্টা মজুর শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য কত উগ্র ও কত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে। তাহা হইলে কত বেশি শ্রেণী-সচেতন হইবার কথা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীরও এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে।

মোটকথা, এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অচল সাম্রাজ্যবাদ বিকৃত ভারতীয় পুঁজিপতিদের জন্ম দিয়াছে; অবশ্য পল্লীপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গী বিনষ্ট করিয়াছে, শিল্পে কারখানায় মানুষের আকর্ষণ বাড়াইয়াছে, কিন্তু অচল সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করে নাই,—বরং তাহারই অভ্যন্তরে নিঃস্ব ও 'কুলাকের' বৈষম্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে;—এবং সর্বত্রই দরিদ্রকে করিয়াছে আরও দরিদ্র, ধনীকে করিয়াছে আরও বেশি ধনী;—শোষণের রূপ পরিবর্তন হয় নাই, শোষণের মাত্রাই শুধু অনেক বাড়িয়াছে। আর এই যুদ্ধবিকৃতির ফলে চোরা-বাজার, মুনাফাদারী, মন্বন্তর, মহামারীর আঘাতে মানুষের মন হইতে সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী-মমতা, মোহ, চক্ষুলজ্জা দূর করিয়া ফেলিয়াছে,—আনিয়া দিয়াছে ধনিকতন্ত্রের বিকৃতির দিনে এক বিকৃত মুনাফা-শিকারের লোভ। অবশ্য ইহারই পার্শ্বে সৃষ্টি করিয়াছে এক সচেতন শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী, বিদ্রোহী নিম্নমধ্যবিত্ত।

ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের রাজনীতি

যুদ্ধান্তের বিপ্লবী আন্দোলন যখন তাই ভারতবর্ষের পথে-ঘাটে আকাশে-সমুদ্রে শতমুখে ফাটিয়া পড়িল—কলিকাতায় আই-এন-এ'র ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলনে, রসিদ আলি দিবসের হিন্দু-মুসলমান জনবিদ্রোহে, বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহে, সমস্ত ভারতের বিমান সৈনিকের ধর্মঘটে আগুন জ্বলিতে লাগিল—তখন ভারতের ধনিকতন্ত্র গান্ধীজীর ও জিন্না সাহেবের পরিচালনায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, প্রত্যেকটি পদ-ক্ষেপে আপোষের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিকে; আর বিক্ষুব্ধ জনগণের সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ভারতের শ্রমিক শক্তি ও তাহাদের সহকারীরূপে ছাত্র, কৃষক, দরিদ্র কেরানী, কর্মচারী।

যুদ্ধান্তের রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে উল্লেখ নিরর্থক। স্মরণীয় শুধু সামাজিক আলোড়ন।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক সামাজিক দর্শন ও গান্ধীজীর পরিচালিত সমস্ত কংগ্রেসী আন্দোলনের ইতিহাসই (১৯২০-৪৭ পর্যন্ত) এই আপোষকামী জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সংস্কারমূলক আন্দোলন ছাড়িয়া কোনো সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে নাই —তাহারা বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের চাপও নিজের আয়ত্তে রাখিয়া সংস্কার-বাদী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে। তাহাদের এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে পূর্বাপর গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃত্বেই প্রধান মুখপাত্র ছিল। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই মাঝে মাঝে, বিশেষত পণ্ডিত জওহরলালের মত বাক্-নিপুণ, ভাব-প্রবণ নেতাদের মুখে, বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের ও সমাজ-বিপ্লবের বক্তৃতাও ফুটিয়াছে। কিন্তু যখনি গণশক্তি বিপ্লবের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে, তখন এই বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় মালিক-শ্রেণী সর্বরূপে তৎপর হইয়াছে (দ্রষ্টব্য পামে দত্তের 'আজিকার ভারত')। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২-এর আন্দোলনেও মালিকশ্রেণীর এই প্রতিবিপ্লবী প্রয়াস ফুটিয়া উঠে। ১৯৪২-এ ভারতীয় মালিকশ্রেণী ও তাহাদের মুখপাত্র কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধনীতি (ওয়ার পলিসি) পরিষ্কার হয়। ইহাতে প্রথম দেখি—ভারতীয় মালিকতন্ত্রের প্রধান অংশ তখন ফ্যাশিস্তদের সমর্থক; হিটলার মুসোলিনি তোজোকেই তাহারা দুনিয়ার মুনাফাতন্ত্রী শ্রেণীর প্রধান রক্ষাকর্তা হিসাবে আত্মীয় বলিয়া জানে, হিটলার তোজোর বিজয়েও তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ আস্থাশীল হয়। দ্বিতীয়ত দেখি—ভারতীয় মালিকতন্ত্রের নেতৃত্ব তখন মনে করে—দ্রুত, ক্ষিপ্র ও স্বল্পস্থায়ী ('সর্ট এণ্ড সুইফট্') আন্দোলনের চাপ-দিলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপোষ করিতে চাহিবে—সর্ট এণ্ড সুইফ্ট ষ্ট্রাগ্লের অর্থই হইল চাপের দ্বারা আপোষ করা—বিপ্লব করা নয়। কিন্তু ভারতীয় মালিকতন্ত্রের তখন সর্বসম্মত নীতি হইল এই, যে-ই হারুক বা জিতুক, যত পার মুনাফা লুণ্ঠন করো,—দেশের লোক মরুক বাঁচুক, যায় আসে না। কার্যত এই তৃতীয় নীতিটিই সার্থক হয়। বিয়াল্লিশের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ফ্যাশিস্তরাও পরাজিত হয়। তার ফলে ভারতীয় মালিকতন্ত্র দেখিতে পায়, হিটলার-তোজোহীন জগতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে কোনো মালিকতন্ত্রী আর তাহাদের সহায় নাই; দুনিয়ায়

মালিকতন্ত্রের প্রধান রক্ষাকর্তা এখন ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মূঢ়তা, এবং মালিকতন্ত্রের পক্ষে তাহা আত্মবিদ্রোহ :— পৃথিবীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ তাহাতে সুপরিসর হইবে; ভারতেও তাহাদের মুনাফার রাজত্ব শেষ হইবে। অতএব, ১৯৪২-এর অনুসৃত নীতির পক্ষেই মালিকতন্ত্র ও কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ও মাউণ্টব্যাটন প্ল্যানকে মানিয়া লইল—যুদ্ধের মুনাফা লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য লুণ্ঠনের অংশীদারত্ব লাভে তাহাদের সন্তোষ লাভ ঘটে। লক্ষণীয় এই, ইহাই ভারতীয় মালিকতন্ত্রের পূর্বাপর নীতি; ইহাই পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদী সংকটের কালে ধনিকতন্ত্রের পক্ষে স্বাভাবিক পথ,—এবং এই গণবিপ্লব-বিরোধিতা মূলত ধনিকতন্ত্রের চিরন্তন স্বার্থ ও নীতি। এই জন্যই ইতিহাসে ধনিক শ্রেণীর নাম 'ট্রেটর ক্লাশ' বা "বিশ্বাসঘাতক শ্রেণী",—জনগণের চাপে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া ইহারা শেষে জনগণের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে।

উপনিবেশিক উপপুঁজিবাদ

কিন্তু যুদ্ধান্তের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে যদি বা তর্কের অবকাশ থাকে,—তাহা থাকিবেও; কারণ যেখানে এত বড় শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছে সেখানে রাজনীতিতে একমততা হইবে কি করিয়া?—যুদ্ধান্তের সামাজিক-আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথাপি তর্কের স্থান বেশি নাই। সংস্কৃতি বিচারে উহারই মূল্য অধিক। সেই পরিস্থিতি এখনো জীবন্ত, এবং আরও ঘনায়িত। তাই এখানে এই যুদ্ধোত্তর কালের (১৯৪৬, জুন—১৯৪৮, ডিসেম্বর) আর্থিক পরিস্থিতির মূল লক্ষণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

যুদ্ধ থামিতেই বন্ধ হইল যুদ্ধের 'বাজার'—যুদ্ধপণ্যের উৎপাদন থামিল; অবশ্য যুদ্ধকালের অন্নহীন, বস্ত্রহীন নরনারীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন রহিল,—খাদ্য, বস্ত্র, প্রভৃতির উৎপাদনে অবশ্য কল-কারখানা পুরা দমে চলিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে উৎপন্ন খাদ্যের ও বস্ত্রের মূল্য হ্রাস প্রয়োজন, না হইলে যুদ্ধকালীন দরে তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু উৎপন্ন খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতির মূল্য হ্রাস করিতে হইলে চোরা-কারবার, ঘুষ, চুরি ত বন্ধ করিতে হয়ই, যুদ্ধকালীন মুনাফা-শিকারও বন্ধ করিতে হয়। অবশ্য ইহাতেও লোকের পুঞ্জিত অভাব মিটিত না—দরকার

হইত ভূমি-সমস্যার সমাধান ও কৃষি-সংকট দূর করার,—জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষককে জমির স্বত্ব দান। সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান, বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির প্রয়োগ, নানারূপ "উন্নয়ন ব্যবস্থার" দ্বারা দশের সাধারণ সুখ-স্বাস্থ্যের ভিত্তি স্থাপন করা, ও দেশের পরিশ্রমক্ষম লোকদের ফলপ্রসূ কার্যে নিয়োগ করা। আর উহার সঙ্গে সঙ্গে দরকার হইত অন্তত "জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির" নির্ধারণানুযায়ী কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, তাঁতশিল্প প্রভৃতি মূল শিল্পোগুলিকে মুনাফার আকর না রাখিয়া "জাতীয় সম্পত্তিতে" পরিণত করা; ষ্টার্লিং ব্যালান্‌সের আংশিক আদায় হিসাবে এদেশস্থ ব্রিটিশ কল-কারখানা প্রভৃতি (প্রায় ৮০০৲ কোটি টাকার সম্পত্তির) ঐরূপে দেশবাসীর জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা; চুক্তি করিয়া কল আনিয়া গুরু শিল্পের পত্তন করা, শ্রমিক সাধারণের উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে কল-কারখানার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালকদের সহযোগী করিয়া লওয়া; সাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়ানোর জন্য তাহাদের মজুরী দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে বাড়াইয়া দেওয়া, শ্রমিকদের চাকরির স্থিরতা, স্বাস্থ্য, বাসাবাস, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ন্যূনতম ট্রেড্ ইউনিয়ন দাবিগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া; এবং সর্বোপরি 'জাতীয় শিল্পে' মুনাফা বন্ধ করা, আর মালিকী শিল্পেও নিয়ন্ত্রিত নিম্নহারে মুনাফা বাঁধিয়া দেওয়া—ইত্যাদি। ইহা হইত সত্যকার গণতান্ত্রিক শিল্প-বিপ্লবের পথ। সত্য বটে, ইহা সহজ নয়, রাতারাতিও ইহা ঘটে না; কিন্তু কত অল্প সময়ে ইহা ঘটানো যায় তাহার প্রমাণ যুদ্ধশেষে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে এখনো মিলিতেছে। আর, এই দেশে কার্যত যাহা ঘটিল তাহা একেবারেই উল্টা দিকে—কারণ, মুনাফাদারী পথে শিল্প-বিপ্লব এই যুগে আর সম্ভব নয়, এবং শিল্প-বিপ্লবের পথে ছাড়া ভারতীয় সমস্যার সমাধান নাই। কিন্তু যুদ্ধকালে যে মুনাফার স্বাদ ভারতীয় মালিকতন্ত্র লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের রক্ত-পিপাসা আর তৃপ্ত হইবার নয়। আর সেই মালিকতন্ত্র যখন কার্যত রাষ্ট্রেও প্রাধান্য লাভ করিল তখন তাহার এই মুনাফা শিকারে আর কোনো বাধাই রহিল না।

যুদ্ধশেষেও মালিকতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শিল্পের প্রসার ঘটুক বা না ঘটুক, উৎপাদন বাড়ুক বা কমুক, কালোবাজারে ও কালোকানুনে অতি-স্ফীত মুনাফার হার অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে। যুদ্ধের বাজার নাই, কাজেই দু-তিন

শিফ্‌টে কাজ বন্ধ হইল, যুদ্ধশেষের আংশিক সংকট দেখা দিল। হাজার হাজারে মজুর ছাঁটাই চলিল—অর্থাৎ সাধারণভাবে পণ্য ক্রেতার সংখ্যা ও পণ্য-ক্রয়-শক্তি আরও কমিতে লাগিল। মুনাফার হার বজায় রাখিবার জন্য তখন মজুরদের যুদ্ধকালীন ভাতা কাটার চেষ্টা চলিল, রেশন কাটা আরম্ভ হইল, সম্ভব হইলে মজুরী কাটা ও ঘণ্টা বাড়ানোরও চেষ্টা হইল, নূতন যন্ত্র বসাইয়া (রেশানালিজেশন) শ্রমিকের শ্রমের তোড় (intensification) বাড়ানো গেল। আর ইহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিল (কাশ্মীর ও বাস্তুহারার নামে) মুদ্রাস্ফীতির দ্বিগুণ জোয়ার (১৯৪৯ এর গোড়ায়ও তাহা চলিতেছে)। চলিতে লাগিল দ্রব্যমূল্যের দাবানলের মত আকাশস্পর্শী বৃদ্ধি (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ১৯৪৯-এর 'বাঙলা বাজেটে' দেখা যায়—১৯৪৭ সনে খাদ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল ২৯২.২; ১৯৪৭ সনে তাহা উঠে ৩৭৪.৭এ; আর ১৯৪৭ সনে সাধারণ দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল ২৯৭.৪, ১৯৪৮এ তাহা ওঠে ৩৬৭.৭এ। মজুরের মজুরী অবশ্যই বাড়ে নাই। কিন্তু কত কমানো হইয়াছে তাহার উল্লেখ নাই।) এই দুর্মূল্যত ও মুদ্রাস্ফীতির নামেই ১৯৪৮ হইতে শ্রমিকের মজুরীকে কমাইয়া রাখাই হইয়া উঠিয়াছে নিয়ম (মজুরের মজুরী বাড়ে মূল্যবৃদ্ধির পরে; আর সেই মজুরী বাড়ে মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় কম। কাজেই মূল্য হ্রাস না করিয়া মজুরী হ্রাস হইল বিপরীত পথ). সেই উল্টা দিকেই দ্বিগুণ তেজে চলিয়াছে চোরা-বাজার—চলিয়াছে ঘুষ, চলিয়াছে লুঠ, চলিয়াছে এখন 'উন্নয়নের স্কিমের' নামে আত্মীয় পোষণ, স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা বহিবার জন্য দেশে বিদেশে ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের নূতন নূতন পদলাভ, ভাতালাভ, কমিটি-কমিশন-বিলাস—আর তৈল, নুন, পোষ্ট কার্ড গরীবের সকল জিনিসের উপর ট্যাক্‌স্। কোনো কারণেই ধনিকের লুঠের মুনাফার উপর হাত দেওয়া চলিবেনা (১৯৪৬এ লিয়াকৎ আলির বাজেটের সময় হইতেই তাহা পরিষ্কার হয়)। কোনো কারণেই কালোবাজার বন্ধ করা হইবে না ('ডিকণ্ট্রোলের' ছ'মাসেই তাই ১৯৪৮ সনে কাপড়ের বাবদ ১০০ কোটি টাকা চোরা-কারবারীরা লুঠ করে, চিনির বাবদ লুঠ করে আরও কয়েক কোটি)। কোনো কারণেই মালিকদের ফাঁকি-দেওয়া আয়-কর (ইহার পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের মতে অন্যূন ৩৫০ কোটি টাকা) সরকার পাইবে না। কোনো দিনই লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ (১৯৪৮ সনের 'ডিভিডেণ্ড কণ্ট্রোল' সত্ত্বেও) অথবা মুনাফার উপর কোনো কর ফাঁকি দিবার

ফিকিরের অভাব হইবে না। আর শ্রীভাবা শ্রীষন্মুখম্ থাকুন বা যান কোনো দিনই এই সব ফাঁকি বন্ধ করার মত সাহস বা ইচ্ছাও কোনো পণ্ডিত-পটেলের হইবে না। কোনো দিনই ষ্টার্লিং ব্যালেন্সের বদলে ব্রিটিশ কারখানা হাত করা হইবে না। মূল কারখানা 'জাতীয়করণ' হইবে না; জাতীয় যত প্রতিষ্ঠানও (রেল, ডাক প্রভৃতি) চলিবে মালিক শ্রেণীর স্বার্থে, তাহাদের শ্রেণী-নেতৃত্বে। কোনো কালেই মুনাফাদারীর পথে আর শিল্পের প্রসার সম্ভব নয়—উৎপাদনহীন মুনাফার ফলে মুদ্রাস্ফীতি চোরা-বাজারী কমিবে না, দ্রব্যমূল্যও কমিবে না—কারণ, মালিকেরা উহারই জোরে মুনাফার হার বজায় রাখিবে, সমস্ত বোঝা চাপাইয়া দিবে শ্রমিকের ও কৃষকের মাথায়। আর দশ বৎসরের কেন, এই ব্যবস্থায় কোনো কালেই তাই মূল শিল্পের 'জাতীয়করণ' হইবে না।

বলা নিষ্প্রয়োজন—সামন্ততন্ত্র ও মালিকতন্ত্রে যখন শোষণস্বার্থে জড়াইয়া গিয়াছে তখন সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও কৃষিসংকটের সমাধানও এখন হইবে না—দেশীয় রাজ্যের রাজাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা আংশিকভাবে ভারত সরকার নিজেরা লাভ করিয়া নিজাম, হরিসিংদের রাজ্যে গণতন্ত্রের গতিরোধ করিয়াছেন—'ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তি'র নামে রাজ্যের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দাবী চাপা দিতেছেন। জমিদারী উচ্ছেদের আইনগুলিকে ব্রিটিশী আমলাতন্ত্রের নিয়মে সুবিবেচনা ও মুদ্রাস্ফীতির নামে চাপা দিয়া রাখিয়াছেন এবং জমিদারী উচ্ছেদের নামে আসলে মৃতকল্প জমিদারদের দিতেছেন উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে ক্ষতিপূরণ; আর জমির মালিকানা কৃষককে না দিয়া "জাতীয়করণের" ও 'সমবায়-কৃষির' নামে আসলে সেই জমিদার-শাসকদেরই আবার এই কৃষক-শোষণের ভার অর্পণ করিতেছেন। সামন্ত ও ধনিকের কুটুম্বিতায় জমির উপর শোষণ ব্যবস্থা অনড় হইয়া আছে।

আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে, 'খাদ্যফসল বাড়াও' প্রয়াসে ভাগ্যবান্‌দের পকেট পুরিয়াছে, আর বাড়িয়াছে কৃষক-বিদ্রোহ—কমিয়াছে খাদ্যশস্য উৎপাদন। আশ্চর্য নয় যে, নিত্য-নূতন শ্রমিক-পরিপালনের আইন পাশ করিয়াও ধর্মঘট কমানো যায় নাই—বাড়ে নাই পণ্যের উৎপাদনও।

তথাপি উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, যুদ্ধান্তের ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা উৎপাদনের সমস্যা বটে, কিন্তু মুখ্যত সমস্যা ক্রয়শক্তির অভাবের—অপরিমিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা, চোরাবাজারী লুঠের সমস্যা,

আজ শ্রমিক-দলনের সমস্যাও। আসলে এই সমস্যা একদিকে অসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যা, অন্য দিকে শিল্প-বিপ্লবহীন বিকৃত ধনিকতন্ত্রের সমস্যা—যুদ্ধান্তের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহাই ভারতীয় আর্থিক সামাজিক সংকটের বিশেষত এই কালোবাজারী অর্থনীতি, আর কালাকানুনী শাসন।

যুদ্ধান্তের আর্থিক সংকট হইতে সমগ্রভাবে পৃথিবীর ধনিকতন্ত্র মাসের পর মাস বহু কষ্টে ঠেকাইয়া চলিয়াছে প্রধানত দুইপথে : এক, নূতন যুদ্ধের জিগীর তুলিয়া তাহারা যুদ্ধোৎপাদন চালাইয়া যাইতেছে ; দুই, মার্শাল প্ল্যানের মত মার্কিন অতি-সাম্রাজ্যবাদের নিকট সাময়িকভাবে নিজ নিজ দেশের স্বার্থ বলি দিতেছে। ভারতের শাসকশ্রেণী এই সমস্যা উদ্ধারের আশায় বসিয়া আছে মার্কিন ঋণ, এশিয়ার 'মার্শাল প্ল্যান' বা বেনামীতে নেহরু প্ল্যান, বিদেশী পুঁজির সহায়তা, প্রভৃতি আশা করিয়া। এই জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ১৯৪৭এর পরে ভারতের শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ করিতেছে এশিয়ায় চিয়াং-কাই-শেকের ভূমিকা। আর জাতীয় ক্ষেত্রে এই শাসকবর্গের সমস্যা সমাধানের পথ কি ?—শ্রমিক আন্দোলন দমন ও বিচ্ছিন্ন করা, কৃষক আন্দোলন চূর্ণ করা, সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিনষ্ট করা ; অন্যদিকে "পুলিশী রাষ্ট্র", কালাকানুন, আইনের পর আইন, লাঠির পর লাঠি, গুলির পর গুলি। নিঃসন্দেহ ইহা ফ্যাশিস্ত পদ্ধতি। কিন্তু বুঝিবার মত কথা এই—ধনিকতন্ত্রের সংকটের দিনে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে আর গণতান্ত্রিক পথে বাড়িবার বাঁচিবার সুযোগ কোথায় ? দুনিয়ার ধনিকতন্ত্রীরা জানে —এই গণবিপ্লবের সম্মুখে ধনিকতন্ত্র ফ্যাশিজমে পরিণত হইয়া যায়— কারণ, সৃষ্টিক্ষমতা আজ ধনিকতন্ত্রের নাই, আছে শ্রমিক শক্তির।

কালোবাজারী কাল্‌চারের রূপ

এই 'কলোনিয়াল্ ফ্যাশিজম্' বা ঔপনিবেশিক ফ্যাশিতন্ত্রের যুগে আমরা ভারতে কোনো বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রয়াস লক্ষ্য করিতে পারিতেছি কি ? ফ্যাশিজম্ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধটা অহি-নকুলের সম্বন্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি বিষয়ে ফ্যাশিস্তরা নিষ্ক্রিয় নয়। কালোবাজারী কাল্‌চারের যুগ আসিয়াছে—এই দেড় বৎসরের মধ্যেও উহার প্রমাণ এই দেশে প্রচুর জুটিয়াছে। প্রথম প্রমাণ—সংবাদপত্র। সংবাদপত্র মালিকতন্ত্রের বিকাশে আজ কালোবাজারের মুখপত্র। ভারতীয় পত্রিকাগুলি এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে

শাসকবর্গের 'রক্ষিতা' পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি অকস্মাৎ শাসকশ্রেণীর ও কালোবাজারী ধনিক শ্রেণীর উপাধি বিতরণের কমিটি হইয়াছে; বহু বহু বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত, গৃহে যাহাই বলুন, শাসক শ্রেণীর চাটুকার বা পারিষদে পরিণত হইয়াছে। তৃতীয়ত, অনেক শিল্প ও সাহিত্য-পরিষদ, উহার সভা ও অধিবেশন, আজ নিকৃষ্ট রুচির ও নিকৃষ্ট বুদ্ধির কালো-বাজারী ও শাসকদের বক্তৃতাগার। সাংস্কৃতিক প্রেরণায় নয়, শুধু ঐতিহ্যগত প্রতিক্রিয়ার সুযোগ লইবার জন্যই—কথনো কথনো শারিপুত্র মৌদ্গলায়নের অস্থি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়ে; লণ্ডনে দিল্লীতে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের প্রদর্শনী হয়। অবশ্য ভারতীয় 'ফ্যাশিস্ত সংস্কৃতি'র আসল পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহার রেডিওতে। সিনেমার উপরও শাসক-শ্রেণীর কড়া নজর স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতও ইহার নিকট সংশয়বস্তু। 'স্বদেশী' আমলের বিদ্রোহ-চিত্র ইহার বিবেচনায় দোষাবহ। সুভাষচন্দ্রের নাম ইহার রেডিওতে সহজে স্থান পায় না।

শিক্ষায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট ব্যবস্থা হইল—ইতরজনের জন্য 'বুনিয়াদি শিক্ষা'। শাসক শ্রেণীর জন্য অবশ্য পাব্‌লিক ইস্কুল চলে ও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমেসির ক্লাশ খোলা হয়। এই মালিক-রাজের সর্বাপেক্ষা বড় সাংস্কৃতিক অস্ত্র হইল 'গান্ধীবাদ'। বলা বাহুল্য, এই 'গান্ধীবাদ' হইল প্রচারের জন্য, প্রয়োগের জন্য নয়। কারণ, কার্যত রাষ্ট্রে লাঠি, টিয়ার গ্যাস, স্ত্রীহত্যা, ছাত্রহত্যা প্রভৃতি ফ্যাশিস্ত পদ্ধতিই শৃংখলা রক্ষায় সুপ্রচলিত হইয়াছে। আর্থিক 'বিকেন্দ্রীকরণের' পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত কেন্দ্রীকরণের নীতি।

লক্ষ্য করিবার বিষয় মত কথা এই যে, এই ফ্যাসিস্ত পদ্ধতিতে ভারতীয় শাসকশ্রেণী ভারতবর্ষের চিরদিনকার সাংস্কৃতিক বিকাশকেই আর স্বীকার করিতে পারিতেছে না। বহু ভাষা, বহু জাতি ও তাহাদের সকলকার সাংস্কৃতিক দান লইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি বিকশিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বহুর সমাহার, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সেই বহুজাতিক সংস্কৃতিকে আজ সংস্কৃত-কণ্টকিত হিন্দী (যাহার রূপ এখনো সুনিশ্চিত নয়) ও নাগরী বর্ণমালার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত যে কতদূর উৎকট ও হাস্যকর তাহারই একটি প্রমাণ বাঙলা সরকারের প্রচারিত 'শাসন পরিভাষা'। কিন্তু হিন্দীর এই 'সাম্রাজ্যবাদী' প্রয়াস হইতে যাহা বুঝিতে পারি

তাহা এই যে, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি সমূহের পক্ষে, বিশেষত বাঙলা সংস্কৃতির পক্ষে, বিপদ ঘনাইতেছে। সম্ভবত এই বিপদ-চেতনা দক্ষিণ দেশেও আসিয়াছে। কিন্তু দ্বিখণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাঙলায় এই বিপদ আরও জটিলতর আকারে দেখা দিয়াছে। বাঙলার সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ কি—বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের ভ্রূকুটি ও হিন্দীভাষীদের দাপটে আজ শিক্ষিত বাঙালী তাহা ভাবিয়া চিন্তান্বিত।

বিভক্ত বাঙলার সংস্কৃতি-সংকট

কালোবাজারী কাল্‌চার অবশ্য ভারতে ও পাকিস্তানে সমান প্রবল। কিন্তু বাঙলার কাল্‌চারে আরও জটিলতর পীড়াও এখন জুটিয়াছে। কারণ, বাঙালীর কাল্‌চারের উপরে শুধু কালোবাজার ও 'কালা কানুনই' চাপিয়া বসে নাই, বাঙলার কাল্‌চারের উপরে মাউণ্টব্যাটনী খড়্গাঘাতও নামিয়া আসিয়াছে। সেই আঘাতে পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে এবং আত্মঘাতী হইয়াছে। পাঞ্জাবী আধুনিক কাল্‌চার ঠিকাদারী কাল্‌চার রূপে শ্রী অর্জন করিতে পারে নাই, বিলাতের দালালী বিলাস-বাহুল্যে মাতিয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম পাঞ্জাব এখন ইকবালী ইস্‌লাম লইয়া তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাবে আর 'উর্দু পাঞ্জাবীর' কোনো প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাঙলা কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হইলেও বাঙলার কাল্‌চার এখনো দ্বিখণ্ডিত হয় নাই। তথাপি পূর্ব বাঙলায় ও পশ্চিম বাঙলায় এই সংস্কৃতির উপর বিভাগের ও বিচ্ছেদের ছায়াও কি ঘনাইয়া উঠিতেছে না? আধুনিক ভারতের সর্বাগ্রগণ্য সংস্কৃতির এই সংকট বা ভীতি সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন তাঁহারাই, যাঁহারা মনে করেন পশ্চিম বাঙলাই সমগ্র বাঙলা; কিংবা পূর্ব বাঙলার পক্ষে 'বাঙলার কাল্‌চার' নিজস্ব জিনিস নয়, অথবা যাঁহারা মনে করেন এই কালেও সংস্কৃতি বুঝি ধর্মের বা ধর্মগত সংস্কারের ঐতিহ্যের উপরই গঠন করা চলে, টিকাইয়া রাখা যায়। বলা বাহুল্য, এইরূপ নির্বোধ মনোভাব শুধু নির্বোধ লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—যে শাসক-স্বার্থের জন্য বাঙলা বিভক্ত হইয়াছে, ইহাও সেই স্বার্থের বর্ণচোরা রূপ। আবার এই শ্রেণীগত বুদ্ধিকে বিস্মৃত হইলে বর্তমান বাঙলার বিভক্ত সংস্কৃতির সমস্যাকে তাহার 'কলোনিয়াল' মূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব; তাহার সম্ভাব্য সমাধানেরও সন্ধান পাইব না, মধ্যবিত্ত বাঙালীর মত শুধু হা-হুতাশই করিব।

বিভক্ত বাঙলায় সত্যই বাঙালী সংস্কৃতির সংকটের স্বরূপ কি?—এই প্রশ্ন ও তাহার বিচার একটু সুদীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত হইল (পরিচয়, কার্তিক, ৫৫ হইতে সংশোধিত)। প্রথমত, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের জীবন ও যুক্তির অসংগতি বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন—

"এই বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই-যে ভারত-বিভাগে ও বঙ্গ-বিভাগে অতি স্পষ্টরূপেই বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে সংকট নূতন রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত স্থূল চক্ষেও এখন তা চোখে পড়ে। দু' রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও কোন জাতি আপনার সত্তা হয়ত অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে—যদি সে দু' রাষ্ট্র হয় আত্মাধিকার সম্পন্ন ও আত্মীয় ভাবাপন্ন। কিন্তু বাংলা দেশের বিভাগ বন্ধু ভাবে হয় নি—আত্মঘাতের মধ্য দিয়ে তার বিভাগ স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিম বাঙলারও যেমন 'ভারতীয় ডোমিনিয়ন'-এ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই, পূর্ব বাঙলারও তেমন 'পাকিস্তান ডোমিনিয়ন'-এ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। বিশেষ করে, এই দুই ডোমিনিয়নের পরস্পর সম্পর্ক বিরোধিতা দিয়ে শুরু হয়েছে, বিরোধিতার পথেই চলেছে; কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি অমীমাংসিত সমস্যাগুলির মীমাংসা হলেও সে বিরোধ সহজে লোপ পাবে না, আর মীমাংসা না হলে তো বিরোধ বৃদ্ধিই পাবে। কাজেই 'দুই রাষ্ট্র এক দেশ'—বাঙালীর পক্ষে এইরূপ একটা আশা বা আদর্শ নিয়ে চলাও বর্তমান মুহূর্তে সহজ নয়—জিন্নাহ্ সাহেবের মতে তেমন ঐক্য-আদর্শ রাষ্ট্রদ্রোহ, আর জহরলালজীর মতে তেমন মিলনের স্বপ্ন অন্যায় ও বর্জনীয়। দুই ডোমিনিয়নের দুই কেন্দ্রশক্তি এই বিভক্ত বাঙালীর আত্মীয়তাবোধকেও সন্দেহের চোখে দেখে, একথাও সত্য। এদিকে প্রাদেশিকতার অপবাদ যতই দেওয়া হোক, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমভাষাভাষী জনতার প্রদেশ গঠনের দাবীও ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালকদের নিকট এখনো অগ্রাহ্য রয়েছে। বিহার তা মানবে না, হয়ত পশ্চিম বঙ্গও এ দাবীর সমস্তটুকু সত্য মানতে স্বীকৃত নয়——গোর্খালি ও সাঁওতালী অঞ্চলের কতখানি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পশ্চিম বাঙলা স্বীকার করতে পারে তা স্পষ্ট নয়। বলা বাহুল্য, 'বৃহত্তর পশ্চিম বঙ্গের' এ দাবী স্বীকৃত হলেই বা ভারতীয় ডোমিনিয়নে বাঙালীর কতটুকু বলবৃদ্ধি হয়? জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে তাহা হয় না।

যতক্ষণ বঙ্গভূমি বিভক্ত হয়ে আছে, ততক্ষণ পশ্চিম বাঙলা ভারতীয় ডোমি-

নিয়নে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র। শুধু জনসংখ্যাতেই পশ্চিম বাঙলা নগণ্য নয়, দৈহিক স্বাস্থ্য ও শ্রম-সম্পদেও নিঃস্ব, ভৌগলিক বিধানে একটি সীমান্ত রেখায় অস্তিত্ব সন্নিবিষ্ট। প্রধানত ভাগীরথী তীরে কলকাতার মত একটি সর্ব-ভারতের আর্থিক উদ্যোগকেন্দ্রকে নিয়েই পশ্চিম বাঙলার জীবন; তার ভাবী দিনের (বিহারের সহযোগিতায়) দামোদর-উদ্যোগে তার ভরসা। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, কি শ্রমক্ষেত্রে কি ধনোদ্যোগ ক্ষেত্রে, পশ্চিম বাঙলার আর্থিক জীবন বাঙালীর হাতে নেই। শুধু কৃষি-জীবনেই স্বাস্থ্যহীন বাঙালী এখনো টিঁকে আছে—কিন্তু বাংলার এই কৃষি-ব্যবস্থা যে অনেক কাল আগেই অচল হয়ে পড়েছে, তা গত মন্বন্তরের পর থেকে কারো পক্ষে আর বুঝতে দেরী হয় না। অতএব বাঙালী সংস্কৃতির আর্থিক ভিত্তিভূমি হিসাবে পশ্চিম বাঙলা যে অত্যন্ত অপরিসর ভূমি,—তা যে বড়ই দুর্বল ও পর-কবলিত ভূমি, তাতে সন্দেহ নেই।

বিচ্ছিন্ন বাঙলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ

এই আর্থিক ও সামাজিক কারণে পশ্চিম বাঙলার উপর হিন্দুস্থানী ভাষীদের যতটা প্রভাব পড়েছে, পূর্ব বাঙলার ওপর উর্দুর ততটা প্রভাব এখনো পড়েনি। তার সহজ প্রমাণ এই—উর্দুকে একমাত্র সর্ব-পাকিস্তানী সাধারণ ভাষা হিসাবে চালাবার কথা উঠতেই পূর্ব বাঙলার হিন্দু-মুসলমান এখনো তুমুল আপত্তি করে—এমন কি, জিন্নাহ্ সাহেবের সামনেই তারা প্রতিবাদ জানাতে সাহস পায়; কিন্তু হিন্দীকে (বা হিন্দুস্তানীকে) ওইরূপ একমাত্র সর্ব-ভারতীয় সাধারণ ভাষা হিসাবে চালাবার কথা উঠ্‌লেও পশ্চিম বাঙলার বাঙালী শিক্ষিত-সমাজ মোটেই আপত্তি করেনি—জওহরলালজীর বা অন্য কারো সামনে মুখ খুলবার সাহসও করে না। তর্ক হবে, উর্দু বাঙলা ভাষার বেশী পর, আর হিন্দী বাঙলা ভাষায় তত পর নয়। কিন্তু পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান বাঙালী উর্দুকে তত পর মনে করবে কেন—যখন পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিত বাঙালী উৎকট রকমে সংস্কৃত পরিভাষা দিয়ে আইন-আদালত ডাকঘরের চিরদিনকার পরিচিত বাঙলা কথাগুলোকে অপাংক্তেয় করতে এত উৎসাহী? তা ছাড়া এই তথাকথিত হিন্দী ও বাঙলার নৈকট্য দুর্বলতর পশ্চিম বাঙলার পক্ষে আসলে আত্ম-বিলোপের না হোক, আত্ম-সমর্পণের পথও মসৃণ করে তুলতে পারে—কারণ, ভারত রাষ্ট্রে

বাঙালী সংখ্যায়, ভৌগোলিক সন্নিবেশে, রাষ্ট্রে, সমাজে হিন্দী-উদ্যোক্তাদের তুলনায় ক্ষীণবল। কলকাতায় যত হিন্দী দৈনিক ও সাময়িক পত্র বের হয়, যত হিন্দী গ্রন্থাদি মুদ্রিত হয়, সম্ভবত হিন্দুস্থানের এলাহাবাদ বাণারসেও তত সংবাদপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না। এখনি কলকাতা শুধু বাঙালী সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, হিন্দী সংস্কৃতির প্রধান উপনিবেশ। বাঙালী সংস্কৃতিও পশ্চিম বাঙলায় ক্রমশই হিন্দী-ঘেঁষা-সংস্কৃতি হতে পারে। এ বিচারে তাই পূর্ব বাঙলার বাস্তুত্যাগীরা পশ্চিম বাঙলার পক্ষে ভীতির নয়,—বরং তার শক্তিরও কারণ হতে পারে কালক্রমে,—পশ্চিম বাঙলার ভীতির কারণ বরং পশ্চিম বাঙলায় হিন্দী-উদ্যোগীদের আর্থিক-রাষ্ট্রিক প্রভুত্ব।

পূর্ব বাঙলার বাঙালীর পক্ষে বর্তমান বাঙালী সংস্কৃতিতে অবশ্য কোনো বড় দান জোগানো শীঘ্র সহজ হবে না, এরূপ ভয় আছে। তার প্রথম কারণ, পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মেরুদণ্ড ভুয়ে যাচ্ছে, সে আর কবে মাথা তুলতে পারবে ঠিক নেই। অবসন্ন হিন্দু নিম্নবর্ণ ও বিত্তহীনরা সমশ্রেণীর মুসলমান জনতার সঙ্গে সমক্ষেত্রে জনতার অংশ হয়ে যেতে পারলে দাঁড়াতে পারবে। অন্যদিকে বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান বাঙালী আমাদের বাঙালী সংস্কৃতিতে মুখ্য বা সম্মানজনক স্থান গ্রহণ করতে ইতিপূর্বে পারেন নি। সবে তাঁরা এবার সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, বিশেষ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন পূর্ব বাঙলার মুসলমান, এমনি সময়ে সেখানে আসছে উর্দুর উদ্ধত আক্রমণ। পাক-ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রীয় ও কতকাংশে সামাজিক জীবনেও পূর্ব বাঙলার স্থান এখন পাঞ্জাবী-শাসিত পাকিস্তানের উপনিবেশের সমতুল্য। এখনো পূর্ব বাঙলার মুসলিম জনশক্তি বিভ্রান্ত, আর মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুষ্টিমেয়; তাই পূর্ব বাঙলার এই অনগ্রসর মুসলমান মধ্যবিত্ত তার এই 'কলোনিয়ল নিয়তি' প্রথম দিকে মেনেও নিতে পারে। কতকটা চাকরীর প্রলোভনে, কতকটা শাসকদের পীড়নে, কতকটা এতদিনকার বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি মমতার অভাবে, কতকটা পশ্চিম বাঙলার বাঙালী সংস্কৃতিধারীদের সংস্কৃতগন্ধী বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায়—আর সর্বোপরি তাঁদের 'ইসলামিক রাষ্ট্র' গঠনের মোহে—পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত মুসলমানের পক্ষে বাঙলা ভাষার উপরে উর্দুকে স্থান দেওয়া আপাতত অসম্ভব নয়। অবশ্য তার ফল এই হবে, পূর্ব বাঙলার সাধারণ মুসলমান শিক্ষা-দীক্ষায় শাসনে রাষ্ট্র-চালনায় যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না 'উর্দু-প্রভাবিত বাঙলা জবান' তাদের রপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ব বাঙলার

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উর্দুভাষী মালিক-গোষ্ঠীর সহযোগিতা সম্ভব হলে শাসন-বিভাগে, স্কুলকলেজে পাঠ্য-পুস্তকের ও সংবাদপত্রের সাহায্যে জনগণকে তা এককালে রপ্ত করানো যেতে পারে। এ সম্ভাবনা একেবারে কাল্পনিক নয়। কারণ, ভাষা পরিবর্তন-সাধ্য জিনিস। পূর্ববাঙলাতেও একটা উর্দু-মেশানো 'বাঙাল-বাঙালা ভাষা' ও সেরূপ বাঙলা সাহিত্য গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়; তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক, তাতে বর্তমান বাঙলা সাহিত্য অন্তত পুষ্ট হবে না। বিচ্ছিন্ন বাঙলার এই রাষ্ট্রীয় বিভাগ বাঙালী জাতির ও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিচ্ছেদে পরিণত হওয়াও সম্ভব যদি এই রাষ্ট্রীয় বিভাগ-বিরোধিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়, অর্থাৎ দু' রাষ্ট্রেই যদি এরূপ মালিকী-শাসন অব্যাহত থাকে, মালিকী স্বার্থে এখনকার মত শাসিত হয়, বাঙালী জনগণ রাষ্ট্রে সমাজে কর্তৃত্ব লাভ না করে।

বাঙালী সংস্কৃতির ভরসা

মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্কৃতির এই বর্তমান সংকট ও অদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে অন্য যে সব কথাও স্মরণীয় তা এই : প্রথমত, পশ্চিম বাঙলার বাঙালীর চেয়েও অনেক সংখ্যাল্প জাতি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছে, এখনো দেয়। যেমন, আইরিশ জাতি। তা হলে পশ্চিম বাঙলাতেই বা বাঙালী সংস্কৃতির ভয় কি? এ যুক্তিরও অবশ্য উত্তর আছে—সংখ্যামাহাত্ম্য হাজার হোক জাতির শক্তির একটা বড় কারণ। আর শুধু সংখ্যাল্পতা নয়, স্বাস্থ্যে, শ্রমসাধ্য কর্মে, রাষ্ট্রে ও অর্থনীতিক জীবনে ভারতরাষ্ট্রমণ্ডলে বাঙালী গৌণ স্থান নিলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুখ্য স্থান অধিকার করতে পারবে কিনা সন্দেহ—বিশেষত যখন পশ্চিম বাঙলা (আয়র্লণ্ডের মত) আত্মনিয়ন্ত্রিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি এই—ভাষা ও সাহিত্যই তো সংস্কৃতির সবটা নয়; বাঙলা সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, আর এ যুগের সিনেমা, রেডিও, এ সব শিল্পকলার মধ্য দিয়ে মূলত বাঙালীর পার্থক্য অপেক্ষা অবিচ্ছিন্নতারই কথা বেশি প্রমাণিত হবে। আর দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো পার্থক্য ঘটতেই পারে না। এরও আবার উত্তর আছে : ভাষা ও সাহিত্যের মত প্রবল সাংস্কৃতিক বন্ধন আর কোনোটি নয়; বিশেষত বাঙালীর পক্ষে অন্য কোনো জিনিস তার স্থান পূরণ করতে পারে না। এবং অন্য শিল্পসৃষ্টিতে

বা দর্শন বিজ্ঞানের অনুশীলনেই বা দু' বাঙলা একত্র চলবে কেন—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন-শক্তি কেবলই যদি একদিকে জন-জীবনকে বিভক্ত করে রাখে, অন্য দিকে ভিন্ন জীবনাদর্শে তাদের বিভ্রান্ত করে ?

এর উত্তরেই উত্থাপন করা যেতে পারে মধ্যবিত্ত ভাববাদীর সাংস্কৃতিক যুক্তি—সংস্কৃতি অমর, তার নিয়ম রহস্যময় ও অপরিবর্তনীয়। তাই বাঙালী চিরদিনই বাঙালী থাকবে, আর বাঙলার সংস্কৃতিও চিরদিনই তার নিজস্ব রূপে বিকশিত হবে,—তা ছোট বড় সকল বাঙালীর মেদে-মজ্জায়-গাঁথা বিশিষ্ট সত্তার প্রকাশ। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী আমরা সবাই জানি,—'সবার উপরে মানুষ সত্য।' বলা বাহুল্য, এর উত্তরও অজানা নয়।—মানুষের সংস্কৃতি অমর বটে, কিন্তু জাতি বিশেষের সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় নয়। আর কোন সংস্কৃতিই অপরিবর্তনীয় নয়। তার বিকাশের নিয়মও আজ মানুষ জানতে পেরেছে—এ সত্যও উপলব্ধি করেছে যে, সংস্কৃতির অনেকাংশেই সচেতন ভাবে পরিকল্পনা ও সংগঠন চলে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই কথা যে—সে বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হয় জাতীয় জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। মানবতাবাদেরও উন্মেষ প্রসার হয়, আর মানবতাবাদ বাঙালীর একান্ত সম্পদও নয় (গ্রীক মানবতাবাদের কথা স্মরণীয়।)

আর যেখানে জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণী-ভেদ রয়েছে সেখানে কোনো সংস্কৃতিই সমাজের সকল শ্রেণীর সমান সম্পদ নয়, সৃষ্টিও নয়। হয়ত এ সত্য ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে অগোচর থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হয় না। কিন্তু যতই সে শ্রেণী-চেতনা সুস্পষ্ট হয় ততই এ সত্যও সুস্পষ্ট হয় যে শোষকপক্ষের আর শোষিতপক্ষের জীবনযাত্রা ও জীবনদৃষ্টিও যেমন এক নয়, তেমনি তাদের সৃষ্টিও এক হতে পারে না। সমাজে যখন যে শ্রেণীর শক্তি প্রবল ও প্রচণ্ড, সে শ্রেণীর সংস্কৃতিই সবল এবং প্রভাব-শালী হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলে তা সর্বাঙ্গীণও নয়, সার্বজনীনও নয়। সোভিয়েট দেশের মত যে দেশে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠছে, একমাত্র সে দেশেই সার্বজনীন সংস্কৃতির জন্ম হতে পারে, 'জনগণের সংস্কৃতি' হতে পারে জনগণের বস্তু, জনগণের সম্পদ, জনগণের সৃষ্টি।"

অন্তত পক্ষে ১৯৪৭-৪৮এ আর সংস্কৃতি-বিচারে এ সত্য ভুলবার উপায় নেই। ভুলতে চাইলেও এই বাঙলা দেশেও আমাদের বাঙালী সংস্কৃতির সংকটই এই সত্য মনে করিয়ে দেবে। কেন সংকট ? কি ছিল বাঙলার

সংস্কৃতির রূপ যাতে এ সংকট এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল ? এ প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে গেলেও আজ ১৯৪৭-৪৮ সালে এই সত্যের সম্মুখীন হতে হয় যে, মধ্যবিত্তের পক্ষেই যেমন এ 'সংকট' সত্য, তেমনি মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে এর সমাধানও নেই।

বাঙলার সংস্কৃতির শ্রেণী-সম্বন্ধ

সাধারণভাবে বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংকটকে দেখেন এরূপ ভাসা-ভাসা চক্ষে। কিন্তু এই সত্য কি সবখানি সত্য যে, শুধু বঙ্গভঙ্গের জন্যেই বাঙলার সংস্কৃতির এ সংকট ? এবং শুধুমাত্র বাঙলার মস্‌নদের অবিবেচক শাসকদের জন্যেই সে সংকট আজ গভীর ?

একটি একটি করে এ প্রশ্ন দুটি বিবেচনা করা যাক।

প্রথমত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালী যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ১৯০৫ সালে; ১৯৪৭ সালে সেই বঙ্গভঙ্গ বাঙালী রাজনৈতিক পরিচালকগণ নিজের ইচ্ছায় দাবী করেছে, আদায় করেছে, এবং সাগ্রহে বরণ করেছে, এমন কি, সোহ্‌রাবর্দী-শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবিত ঐক্যবদ্ধ স্বতন্ত্র বাঙলা রাষ্ট্রের কথা কানে তোলে নি। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, আজ যদি আবার দুই বাঙলার কংগ্রেস ও লীগ কিংবা তাদের আইন সভার সদস্যরা সেই ১৯৪৭ সালের মত এ বিষয়ে ভোটের দ্বারা তাদের মতামত স্থির করবার অধিকার পায়, তা হলেও তারা বঙ্গভঙ্গেরই স্বপক্ষে মত দেবে, দু'বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তও তাদের সমর্থন করবে। অথচ বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে হিন্দু শিক্ষিত সমাজের একটা প্রধান যুক্তি ছিল এই—বঙ্গভঙ্গ না হলেই "বাঙালী সংস্কৃতি" বিপন্ন। মুসলমান বাঙালীর হাত থেকে "বাঙলার সংস্কৃতি" বাঁচাবার কোনো উপায় নেই। বলা বাহুল্য, এ যুক্তির মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা পরিষ্কার—এই বাঙলা সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সংস্কৃতি বলে গ্রাহ্য হয় নি, মুসলমান বাঙালীর দান তাতে নগণ্য, আর মুসলমান বাঙালীর এ সংস্কৃতির প্রতি তত দরদও গভীর বা ব্যাপক ছিল না। বাঙলার সংস্কৃতি যে সকল বাঙালীর সমান সম্পদ হয় নি, এ যুক্তি থেকেই তা পরিষ্কার।

'বাঙলার সংস্কৃতি' তবে ছিল কার সংস্কৃতি ?—শতকরা ৫৪ জন মুসলমানের নয়, শতকরা ৪৪ জন হিন্দুরই কি ? এ বিষয়ে বড় রকমের তর্ক না তুলেও বলা যায় যে বাঙলার এ সংস্কৃতি হিন্দু ভদ্রলোকের হাতে

উনবিংশ ও বিংশ শতকে গড়ে ওঠায় তার দেহে মনে হিন্দু রঙ যথেষ্ট লেগেছিল, অন্য রঙ তাতে লাগবার সুযোগও হয় নি। কিন্তু তাই হলে কি তা বাঙলার হিন্দু জনগণেরই সংস্কৃতি হয়েছে? আছে তাতে বাঙলার হিন্দু চাষী নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, বাগদী, বাউড়ি, মাঝি, মিস্ত্রি, পোদ প্রভৃতি চিরদিনের চাষী আর গ্রামের গরীবের জীবনযাত্রা ও জীবনদৃষ্টির পরিচয়? না, আছে তাতে বাঙালী হিন্দু মজুর, মিস্ত্রি, কলের কুলি, রেলের মজুর প্রভৃতি শহরের নির্বিত্ত শ্রেণীর পরিচয়? তাদের পরিচয় তারা নিজেদের মত করে রাখত বাঙলার লোক-সংস্কৃতিতে—কীর্তনে, বাউলের গীতে, পুঁথিতে, পটে। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, যে বাঙলার সংস্কৃতি নিয়ে আমরা গৌরব করি, —এবং সত্য সত্যই গৌরব করতেও পারি—তা হচ্ছে উনবিংশ ও বিংশ শতকের কৃতি ও সৃষ্টি,—অর্থাৎ প্রধানত, তা হিন্দু ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকদেরই সৃষ্টি, বিশেষ করে আবার কলকাতা-প্রভাবিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সৃষ্টি, তাদের জীবন ও জীবনাদর্শের প্রকাশ, তাদের আশা-আকাঙ্খার, চিন্তা ও ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তার সঙ্গে মধ্যবাঙলার সামন্ত-কালীন সাহিত্য বা সঙ্গীতের সম্পর্ক নেই, তা নয়। সে সম্পর্ক ভাষার, অবয়বের; মনের বা আদর্শের নয়। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এই নতুন বাঙালী সংস্কৃতির সম্পর্ক অবশ্য আরও ক্ষীণ, আরও শৌখীন। পরিহাস করে তাই এই আধুনিক বাংলার সংস্কৃতিকে বলতে পারি 'বাবু কাল্চার' আর তার ভদ্রলোকী জন্মক্ষেত্র মনে রেখে তাকে বলতে পারি 'শিষ্ট সংস্কৃতি', কিন্তু তার আসল পরিচয় হল এই যে, তা ইংরেজ আমলের বাঙালী 'মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি'।"

'বাঙলার কাল্চার' প্রসঙ্গে এই সংস্কৃতির স্বরূপ আমরা দেখিয়াছি—তথাপি সেই মধ্যবিত্তের স্বরূপ আবার মনে করিতে পারি—('পরিচয়', কার্তিক, ১৩৫৫ হইতে উদ্ধৃত)

বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বরূপ

"এই বাঙালী মধ্যবিত্তের শ্রেণী-স্বরূপ কি?" বাঙালী মধ্যবিত্ত আসলে 'বুর্জোয়া' নয়। 'কলোনি'র বড় চাকুরে ও কেরানি, মুখ্যত 'পেটি বুর্জোয়া', আধা-সামন্ত, আধাবুর্জোয়া, সমস্ত শোষণের কাজেরই সে দালাল; কিন্তু শোষক-শাসক শ্রেণীতে চাইলেও সে স্থান পায় না, আর উৎপাদক শ্রমিক

কৃষকের শ্রেণীতে সে স্থান নিতেও চায় না। বলা বাহুল্য, পেটিবুর্জোয়ার শ্রেণীচরিত্র সর্বত্রই এ ধরণের—লোভ তার শাসক বর্গে উঠে যাবার, কিন্তু অবস্থার চাপে প্রাণ 'ত্রাহি ত্রাহি' করে শোষিত বর্গের সঙ্গে সমস্বরে। সত্য বটে, এই বাঙালী পেটিবুর্জোয়ার পেছনে ছিল—তার জন্মক্ষেত্রে পুরনো দিনের ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থ-প্রধান পল্লী সভ্যতার ভদ্রলোক সমাজ—একদিকে উচ্চবর্ণ হিসাবে তাদের উচ্চ স্থান চিরস্থায়ী করেছিল এ সমাজের বহু পুরাতন জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথা; আর দিকে তাদের সে আসন সুদৃঢ় হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা সুস্থির বিন্যাসে, তাঁরা ছিলেন ভূমির উপস্বত্বভোগী ও মসীজীবী—'হাতের কাজ' তাঁদের করতে নেই। এই জন্মক্ষেত্রেই উদ্ভূত হল বাঙালী ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ আমলে। বাঙলার সেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধানতম আর্থিক বনিয়াদ ছিল এই ভূমির উপস্বত্ব ও চাকরি, এবং প্রধানতম মানসিক বনিয়াদ—ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া সভ্যতার পরমাশ্চর্য সম্পদ।

এই বনিয়াদের সুযোগ প্রধানত গ্রহণ করতে পারে বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক—প্রথম দিকে কলকাতা অঞ্চলের 'ভদ্রলোকেরা'; পরে ক্রমশ (প্রায় মোট পঞ্চাশ বছর পরে) তাদের ছাড়িয়ে যায় পূর্ববাঙলার 'ভদ্রলোকেরা'। কিন্তু এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি উনবিংশ শতকের বাঙালী মুসলমান, উনবিংশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত তারা রইল বিদেশী শাসন ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরে। কেন রইল, তাও আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে আমাদের লক্ষণীয় শুধু এই-যে, কি ছিল নতুন আর্থিক বিন্যাস, আর কি ছিল মানসিক প্রেরণা যা অবলম্বন করে উনবিংশ শতকে বাঙালী মধ্যবিত্ত (প্রধানত 'ভদ্রলোক'দেরই সমাজ থেকে এ শ্রেণীর উদ্ভব) জন্মলাভ করল—আর যার এই আবির্ভাবে বাঙালী শুধু মানসিক নবজন্ম লাভ করল না, জন্মলাভ করল নতুন জগতে।

বাঙালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টি ও সৃষ্টি

লক্ষণীয় তাই এই যে, গোড়া থেকেই এই সংস্কৃতির সামাজিক বনিয়াদ অতি সংকীর্ণ—তা একটি অচিরস্থায়ী শ্রেণীর সংস্কৃতি। এমন কি, তাদের জীবন থেকেও স্বাভাবিক ভাবে উত্থিত হয় নি, হয়েছে

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর শাসন-তন্ত্রের চাপে। তবে যতই এ ঔপনিবেশিক চাপ অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে অনুভূত হতে থাকবে, ততই এই নবোদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাক্ষা, স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রভৃতিতে সাধারণ বাঙালীর অন্তরের একটি মোটামুটি সমর্থনও থাকবে। এই খানেই ছিল তার প্রগতিশীল ভূমিকা। উনবিংশ ও বিংশ শতকে যা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ দান, তার পিছনেও দেখব আছে বাঙালী জনতার পরোক্ষ প্রেরণা, শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভের প্রতিলিপি। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ বনিয়াদে যতটুকু ও যতক্ষণ বিকাশ সম্ভব, ততটুকু ও ততক্ষণই এ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি বিকাশশীল থাকবে, তারপর তার সংকট, পতন, বিপর্যয় অনিবার্য। দ্বিতীয়ত, গোড়া থেকেই এ সংস্কৃতির অন্তরে-বাইরে গভীর অসঙ্গতি থেকে গেল—জীবনক্ষেত্রে যারা জমিদারীতন্ত্রে বাঁধা ও কলোনির কেরানি, মনের ক্ষেত্রে তারাই বুর্জোয়া-আদর্শের সৃষ্টিতে মাতাল।

এ জন্যই এই উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতিতে একই কালে যেমন ফিউডাল আধারের মোহ দেখা যায় (বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে তারাশঙ্করে পর্যন্ত; সময় সময় তা ফ্যাশফ্যালিজমের প্রতারণাও ঘটে, যেমন, 'বনফুল'-এ), তেমনি তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায় বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের, স্বাধীনতার, মানবতার জন্য তীব্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। এ হিসাবেই আমরা মধ্যযুগের চণ্ডীদাসের (যাঁর নামে চলে ওই পদগুলি) সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণীর মিল দেখি,—দেখি না গরমিল। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই পরম বাণীটিই ধরা যাক। একি মানবতাবাদের বাণী? চণ্ডীদাস কোন্ 'মানুষ'কে সত্য বলেছেন? —যে মানুষ রক্তমাংসের মানুষ নয়, আসলে 'আত্মা', এবং 'পরমাত্মার' প্রতীক, সামাজিক মানুষ সে নয়।—সামাজিক মানুষ ভালো মন্দে ভরা, সমাজের দশজনের সম্পর্কে বাঁধা, প্রেম তার নিকষিত হেম নয়—কামগন্ধে ভরাও। কিন্তু চণ্ডীদাসের মানুষ অধ্যাত্ম মানুষ বলেই তার জাত নেই, কুল নেই, সব সম্পর্কাতীত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।—এ মানবতাবাদ না অধ্যাত্মবাদ? মধ্যযুগে (এবং তার আগেও) বিদ্রোহী মানুষের প্রাণ এমনি করে অধ্যাত্ম-বিদ্রোহের পথেই শ্রেণী-পীড়নের সমাধান খুঁজত,—এ দেশেও খুঁজত, ইরাণ, ইউরোপেও খুঁজেছে; অবশ্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিচিত সাধনপথে। রবীন্দ্রনাথও সেই অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভাববাদী,

কাজেই এই অধ্যাত্ম মানুষকেই তিনিও পরমমূল্য দিতেন—চণ্ডীদাসের মত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতা ও সত্যেরও সাধক; তাই তাঁর কাছে কামগন্ধহীন প্রেম, বা সেই বিশুদ্ধ অধ্যাত্মসত্তাই একমাত্র সত্য নয়। সমাজের দশজনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভালো-মন্দ-ভরা বিচিত্র মানব চরিত্রেরও শিল্পী তিনি; পৃথিবীর মানব-রসের রসিক। এই বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদকেও (bourgeois humanism) তাই তিনি অসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কাজেই চণ্ডীদাসের মানুষকে মেনেও তিনি সে মানুষকে রূপান্তরিত করে উপস্থিত করেছেন। আবার, এতটা ভাববাদী তিনি যে, ব্যক্তিত্ববাদকে তিনি ব্যক্তিস্বার্থবাদ থেকে (personalityকে private property থেকে) পৃথক্ করে দেখতেও অভিলাষী। এই জন্যেই তাঁর মানবতাবাদে যেমন বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বার্থের (private property) স্বীকৃতি নেই, তেমনি নেই স্বার্থ-বিলোপী সোশ্যালিষ্ট ব্যক্তি-সংগ্রামের স্বীকৃতি—অর্থাৎ এই বিশ্বমানবতাবাদী ও ব্যক্তি-সত্তার মহত্তম কবির কণ্ঠে সোশ্যালিস্ট মানবতাবাদ (Socialist Humanism) বা সোশ্যালিস্ট ব্যক্তিবিকাশবাদের (Socialist Personality) সম্বন্ধে কোনো ঘোষণা নেই। অথচ, আজকের দিনে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ কথা যখন আমরা আবৃত্তি করি তখন ফিউডাল-বন্ধন-মুক্ত অধ্যাত্মসত্তার কথা শুধু বলি না—বলি সামাজিক মানুষের মাহাত্ম্যের কথা,—সাধারণ ও অসাধারণ সকল মানুষের সমান মূল্যের কথা। এবং শুধু বুর্জোয়া মানুষের (ব্যক্তি বা অস্পষ্ট মানব-ধর্মের) বিজয়ও আমরা এই বাণীতে ঘোষণা করি না, স্বপ্ন দেখি সেই নতুন মানুষেরও যে-মানুষ সমাজকে নতুন করে গড়ে আর সেই সূত্রে নিজেকেও আবার সৃষ্টি করে। মানুষের চিন্তা ভাবনার জীবনাদর্শের এমনি রূপান্তর ঘটছে এবং ঘটেছে যুগে যুগে যুগান্তরে, ঘটেছে তা বাংলার সংস্কৃতিতেও, আবার ঘটবেও। মানবতাবাদ বাঙালীর রক্তের ধর্মও নয়, একেবারে পরিপূর্ণ মানবতাবাদরূপেও এখানে তা দেখা দেয় নি; সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এখানেও তার রূপান্তর হয়েছে, হবেও। ফিউডাল যুগের কোনো জের (hang over) চলে এসেছে দেখলে মোটেই মনে করবার কারণ নেই তা আমাদের সংস্কৃতির মৃত্যুহীন প্রাণ। ব্রিটেনের বুর্জোয়া সমাজেও এমন অনেক ফিউডাল ঠাঁট অটুট রয়েছে। বিশেষত আমরা আবার নিজের জোরে ধনিকযুগে পৌঁছতে পারিনি। আমাদের উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে বরং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় আধা-

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর শাসন-তন্ত্রের চাপে। তবে যতই এ ঔপনিবেশিক চাপ অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে অনুভূত হতে থাকবে, ততই এই নবোদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রভৃতিতে সাধারণ বাঙালীর অন্তরের একটি মোটামুটি সমর্থনও থাকবে। এই খানেই ছিল তার প্রগতিশীল ভূমিকা। উনবিংশ ও বিংশ শতকে যা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ দান, তার পিছনেও দেখব আছে বাঙালী জনতার পরোক্ষ প্রেরণা, শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভের প্রতিলিপি। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ বনিয়াদে যতটুকু ও যতক্ষণ বিকাশ সম্ভব, ততটুকু ও ততক্ষণই এ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি বিকাশশীল থাকবে, তারপর তার সংকট, পতন, বিপর্যয় অনিবার্য। দ্বিতীয়ত, গোড়া থেকেই এ সংস্কৃতির অন্তরে-বাইরে গভীর অসঙ্গতি থেকে গেল—জীবনক্ষেত্রে যারা জমিদারীতন্ত্রে বাঁধা ও কলোনির কেরানি, মনের ক্ষেত্রে তারাই বুর্জোয়া-আদর্শের সৃষ্টিতে মাতাল।

এ জন্যই এই উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতিতে একই কালে যেমন ফিউডাল আধারের মোহ দেখা যায় (বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে তারাশঙ্করে পর্যন্ত ; সময় সময় তা ছ্যাশন্যালিজমের প্রতারণাও ঘটে, যেমন, 'বনফুল'-এ), তেমনি তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায় বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের, স্বাধীনতার, মানবতার জন্য তীব্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। এ হিসাবেই আমরা মধ্যযুগের চণ্ডীদাসের (যাঁর নামে চলে ওই পদগুলি) সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণীর মিল দেখি,—দেখি না গরমিল। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই পরম বাণীটিই ধরা যাক। একি মানবতাবাদের বাণী? চণ্ডীদাস কোন্ 'মানুষ'কে সত্য বলেছেন? —যে মানুষ রক্তমাংসের মানুষ নয়, আসলে 'আত্মা', এবং 'পরমাত্মার' প্রতীক, সামাজিক মানুষ সে নয়।—সামাজিক মানুষ ভালো মন্দে ভরা, সমাজের দশজনের সম্পর্কে বাঁধা, প্রেম তার নিকষিত হেম নয়—কামগন্ধে ভরাও। কিন্তু চণ্ডীদাসের মানুষ অধ্যাত্ম মানুষ বলেই তার জাত নেই, কুল নেই, সব সম্পর্কাতীত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।—এ মানবতাবাদ না অধ্যাত্মবাদ? মধ্যযুগে (এবং তার আগেও) বিদ্রোহী মানুষের প্রাণ এমনি করে অধ্যাত্ম-বিদ্রোহের পথেই শ্রেণী-পীড়নের সমাধান খুঁজত,—এ দেশেও খুঁজত, ইরাণ, ইউরোপেও খুঁজেছে; অবশ্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিচিত সাধনপথে। রবীন্দ্রনাথও সেই অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভাববাদী,

কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বাঙলার বিপ্লববাদকে অস্বীকার করেন নি, ১৯০৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত বাঙলার বা ভারতবর্ষের সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক প্রয়াসের হিসাব নিলে তাও দেখা যাবে : দেখা যাবে গান্ধীবাদের নামেও তার বিপ্লবী মতাদর্শকে কোনো শিল্পে বাঙালী বিসর্জন দেয় নি।

বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান সত্য হল এই বিপ্লবী ঐতিহ্য, আর তার দ্বিতীয় সত্য তার আবেগ-উজ্জ্বল সাহিত্য।—এই দুই সত্যই মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রাহ্য ভাবী বাঙলার।

মধ্যবিত্তের আত্মঘাত

অথচ প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বোঝা গিয়েছিল বাঙালী সংস্কৃতির সংকীর্ণ বনিয়াদে এবার ফাটল ধরছে, বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে ভূমি ছাড়া, শ্রেণী স্বার্থের বশে সে পরগাছা হয়ে থাকছে। প্রথমত, জমিদারীতন্ত্রের মধ্যে যতটুকু অবকাশ মধ্যবিত্তের মিলেছিল তা আর তখন নেই—জমিদারী, মহাজনী ও সাম্রাজ্যবাদী মিলিত শোষণে বাংলার কৃষি ও কৃষক চরম দুর্দশায় গিয়ে পৌঁছেচে। কৃষক-বিপ্লব তখন থেকেই অবিলম্বে আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে—অথচ ভূমির উপস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণী (ও জমিদার, মহাজন শ্রেণী) তা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। দ্বিতীয়ত, সরকারী চাকরি ও "ভদ্র"বৃত্তি (ওকালতি, মাস্টারি, প্রধানত যাতে হাতে কাজ করতে হয় না) প্রভৃতিতে তখন আর স্থান হচ্ছেনা ; শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সন্তান-সন্ততি বেকার থাকতে বাধ্য—যদি না শিল্প-বিপ্লব প্রারব্ধ হয়। বলা বাহুল্য, জমিদারতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তা সহজ ছিল না, সে উদ্যোগও বিশেষ দেখা গেল না। তাই তৃতীয় দশকের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরির দাবী নিয়ে এই হিন্দু মধ্যবিত্তদের দুয়ারে হানা দিল—তখন দেখতে না দেখতে বাঙালীর এই দুই মধ্যবিত্ত শাখার অন্তর্বিরোধে বাঙালীর ভাষা ও জাতিগত ঐক্য ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে মধ্যবিত্ত স্বার্থের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে তখন জাতিগত, আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ভেদে পরিণত হতে চলেছে, তাই শুধুমাত্র বাঙালী মধ্যবিত্তের চেষ্টায় সম্ভবও হত না তার কোনো মীমাংসা (যতই দেশবন্ধু করতেন প্যাক্ট আর ফজলুল হক গড়তেন কৃষক

প্রজা পার্টি)। বিশেষত যখন সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ বিভেদনীতি প্রয়োগ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসেই ছিল। আর, এর সমাধান মধ্যবিত্ত শ্রেণী করতে পারে না, করতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক নীতি।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশেই তাই অবশেষে এ সমস্যার সমাধান (?) হল এখন দেশ বিভাগে—দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মালিক-স্বার্থের হাতে তুলে দিলেন ম্যাউণ্টব্যাটেন দুই বিভক্ত দেশ—তাদেয় বিরোধ জীইয়ে রাখবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা রইল; আর তাই তাদের দু'বাহুকেই বরাবরকার মত মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত করে রাখবার মত আয়োজনও হল এই বিভাগের দ্বারা পাকা।

এ বিভাগেরই অন্য নাম পনেরই আগস্টের "স্বাধীনতা"। এ সাম্রাজ্যবাদী প্ল্যানই পাকা করবার জন্য ব্যবস্থা হয় দেশ বিভাগের, বিরোধের, বৈরিতার। দেশবাসী তা মেনে নিলে বিভ্রান্ত হয়ে;—অনেকাংশে তারা মালিক-তন্ত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও নেতৃত্বের আপোষ-পন্থার বিরুদ্ধে প্রস্তুত ছিল না বলে, আর কতকাংশে কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাবের বীভৎস হত্যালীলায় দেশের মানুষ দিশাহারা হয়েছিল বলে, এবং শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সুগঠিত হয়ে উঠতে পারে নি বলে।

মধ্যবিত্তের পরিসমাপ্তি

ইতিমধ্যে বাংলার সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী-হিসাবে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চোরাকারবার ও মুনাফা-লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়ে বাঙলার মধ্যবিত্তের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ—মাত্র দু-একজন ব্যাংক, ইনসিওরেন্সের কর্তা, দু-একজন কলকারখানার মালিক, দু-একজন সংবাদ-পত্রের সত্বাধিকারী, এক-আধজন লেখক, অধ্যাপক মালিকের স্তরে উঠে গিয়েছেন (ভারতীয় মালিক-গোষ্ঠীতে এই বাঙালীরা এখনো 'ছিঁচকে' মালিক মাত্র), কিন্তু শতকরা নব্বইটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মাস্টার, প্রফেসর, উকিল, ডাক্তার, লেখক, সাংবাদিক, কেরানি, কর্মচারী—এক কথায় যে বুদ্ধিজীবীরা বাঙালী সংস্কৃতির মেরুদণ্ড তাঁরা—স্ত্রী পুরুষে নেমে গেছেন নির্বিত্ত শ্রমজীবীর পর্যায়ে—'ওয়েজ আর্নার' থেকে তাঁরা এখন পরিণত হচ্ছেন 'ওয়েজ স্লেভ'-এ অমৃতবাজারের মালিক তাঁদের কাছে দাসখত চাইবেই তো—মধ্যবিত্ত তো বেতন দাস।

যে বনিয়াদের ওপর বাঙালীর মধ্যবিত্ত এতদিন কোনো রকমে দাঁড়িয়ে ছিলেন—১৯৪০-৪৫ এর মধ্যে তা ধ্বসে গিয়েছে—ধ্বসে গিয়েছে তাঁদের নীতিবোধ, ভদ্রতা, গৃহব্যবস্থা, পরিবার-বিন্যাসও। এখন তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়েছেন সে শ্রেণীর অনিবার্য নিয়মে তাঁরা আজ ধাবিত হচ্ছেন শ্রমিক ধর্মঘটে, বিপ্লবের পথে—কিন্তু তবু পূর্বদিনের ভদ্রলোক-সংস্কার সবাংশে কি ঘুচে গিয়েছে? তারা বিত্তহীন, চাকুরিজীবী, তবু মধ্যবিত্ত বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। আর, 'ভদ্রলোকের মনোভাবও' তাই যায় নি।

কিন্তু কথা হল এই, যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বনিয়াদ ধ্বসে গিয়েছে, সে মধ্য-বিত্ত সংস্কৃতিতে সংকট এখন হঠাৎ আসে নি—এখন এসেছে অনিবার্য নিয়মে তার শেষ দিন। সংকট এসেছিল বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে—১৯৪৭-এর 'দেশ বিভাগে' নয়, যখন সেই দেশ বিভাগের গোড়াপত্তন হয় তখন। মধ্যবিত্তের পরিচয় আজ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বলে, বেতন-দাস বলে। তার চক্ষে তাই এখন এসেছে বাঙালী সংস্কৃতিরও পালা-বদলের দিন—মধ্যবিত্তের সেই আধা-সামন্ত আধা-বুর্জোয়া জীবনাদর্শ ছেড়ে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনাদর্শে প্রাণলাভের ডাক। আর এ দৃষ্টিতে দেখলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বুঝবেন আসলে এটা 'সংকট' নয়, নবজন্মের তাগিদ।

আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই সম্ভবত আমরা এই বিভক্ত বাঙলার প্রসঙ্গ এখানে শেষ করতে পারি—বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির পক্ষে এই বিভাগ-জনিত সংকট কাটিয়ে ওঠবার কি সত্যই কোনো পথ আছে? এর উত্তর স্পষ্টঃ—পথ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে পথ মালিক-রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারে না, ফ্যাসিস্ত-রাষ্ট্র তা বরদাস্তও করে না। সে পথ হচ্ছে—যাকে সূত্রাকারে বলা হয় "জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" প্রতিষ্ঠায়। যদিই বা এ সূত্র অতীতে কোনো সময়ে কংগ্রেস নেতারা আউড়ে থাকেন, আজ তাঁরা আর তাতে কর্ণপাতও করবেন না। আজ ভারতের ও পাকিস্তানের মালিকতন্ত্র নিজেদের স্বার্থের জন্যই চায় দু' দু' রাষ্ট্রের ছোট ছোট জাতি ও পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীদের অবাধে শোষণ করবার অব্যাহত অধিকার, আর সে শোষণের যন্ত্র স্বরূপ তারা চায় পাকিস্তানেও 'সবল কেন্দ্রীয় সরকার', হিন্দুস্থানেও 'সবল কেন্দ্রীয় সরকার'—'শিশুরাষ্ট্র', 'বাহিরের বিপদ', 'ভিতরের শত্রু' প্রভৃতি নানা ছলনা সহজেই তাই এই দুই রাষ্ট্র-নায়কদের মুখে জোগায়। কিন্তু সত্য কথা যা তা এই, জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মালিক-শ্রেণী মানতে পারে

না; আর এ নীতি কার্যে পরিণত করতে হলে প্রথমেই দরকার "নব্য গণতান্ত্রিক" বিপ্লব—কৃষককে ভূমির মালিক ক'রে, ব্যাঙ্ক খনি যানবাহন শিল্পগুলি সাধারণের সম্পত্তি ক'রে, মুনাফাবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে মালিকেরা 'জাতীয়তার' নামে জাতি-শোষণের পথ খুঁজবেই।

বিভাগের ফলে বাংলার সংস্কৃতির যা 'সংকট', মূলত তা হচ্ছে আজকের বাঙালী সাধারণের পক্ষে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি রচনার সমস্যা—'বিপ্লবী সংস্কৃতি' রচনার প্রয়োজন—যে সমাগত বিপ্লব ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট মালিক-নেতৃত্বে ব্যাহত হয়েছে,—আজ শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী নেতৃত্বে তাকে আবার পুনর্গঠিত করার প্রয়োজন।—আর এ শুধু বাংলার সমস্যা নয়, ভারতবর্ষেরও—অর্থাৎ ইণ্ডিয়ারও, পাকিস্তানেরও। এ প্রসঙ্গেই বিবেচনা করা যেতে পারে বাঙলার সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিম বাংলার বাঙালী শাসকদের দায়িত্ব।

কলোনির ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর রূপ

পশ্চিম বাঙলার বর্তমান (১৯৪৯) মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেস-চালিত, তাঁদের কার্যকলাপ বর্তমান কংগ্রেসের অভিপ্রেত, অনুমোদিত—মায় অর্ডিন্যান্স যোগে বিচারকে প্রহসনে পর্যবসিত করা পর্যন্ত। এমন কি, এ কথাও সত্য যে, সুবিবেচনা ও অবিবেচনার ব্যাপারেও তাঁরা অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে একই নীতির অনুসারী। মাদ্রাজ প্রদেশের কথা ছেড়ে দিলেও বোম্বাইতে, মধ্যপ্রদেশে, বিহারে, যুক্ত প্রদেশে শাসন-ধারা যে পদ্ধতিতে চলেছে, পশ্চিম বাংলার শাসনধারাও ঠিক সেই পদ্ধতিতেই চলেছে,—সর্বত্রই নানা সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি-অনুষ্ঠান নির্জিত হচ্ছে, পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী-মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য কমিউনিস্ট পার্টিকে এ প্রদেশে বে-আইনী করায়—তা ছাড়া অন্য কিছুতে নয়। এসব মন্ত্রীমণ্ডল সকলেই আসলে সে নীতিতে চলেছে, যে নীতিতে চলেছে পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার প্যাটেলের ভারত-রাষ্ট্র। কাজেই শুধুমাত্র বিধান-নলিনী-কিরণবাবুর নেতৃত্বেই পশ্চিম বাংলার 'পুলিশ রাষ্ট্র' বাঙালী সংস্কৃতিকে পীড়িত করছে—মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের এ কথা ঠিক নয়। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সর্বত্রই সেই 'পুলিশ রাষ্ট্র' অব্যাহত শক্তিতে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করছে, 'শিশু' রাষ্ট্র চালিত করছে। আর এ কথাও আমরা বুঝি—ডাঃ বিধানচন্দ্রের স্থলে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের উদয়ে কিংবা অপর কোন

চন্দ্রের ভাগ্য-প্রকাশেও মূলত পশ্চিম বাংলার এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না —শ্রীষন্মুখম্ চেটি বা শ্রীভাবার বিদায়েও যেমন ভারতরাষ্ট্রের শাসনে অবস্থান্তর ঘটে নি। মালিক-শ্রেণীর কবলিত রাষ্ট্রে মালিক-শ্রেণীর প্রতিনিধি মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয় মালিকদেরই ইচ্ছায়, তাদের স্বার্থে; কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তিত হয় না। মূল নীতির পরিবর্তন হয় নূতন শ্রেণীর বিজয়ে, তার নেতৃত্বে। কাজেই, সংস্কৃতির সংকট শুধু বাংলা দেশেই এ কারণে জটিলতর হয়ে ওঠে নি। উঠেছে ভারতবর্ষের সর্বত্র—পাকিস্তানেও। এবং কারণটা শুধু প্রদেশগত বা ব্যক্তিগত নয়, কারণটা আসলে শ্রেণীগত—এমন কি, আন্তর্জাতিকও। পৃথিবীব্যাপী মার্কিন ফ্যাশিজ্‌মের আবির্ভাবের সঙ্গেই ভারতের দুই বিরোধী রাষ্ট্রেও এই 'ঔপনিবেশিক ফ্যাশিজম'-এরও অপূর্ব আবির্ভাব সম্পর্কিত।

একবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝব—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে, পৃথিবী ছোট বড় সাম্রাজ্যতন্ত্রী ও ধনিকতন্ত্রীরা (আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও) কেমন ফ্যাশিস্ত পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ—সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত। ধনিকতন্ত্র কি প্রাণপণে এশিয়া-ইয়োরোপ জুড়ে আপনাদের ব্যূহ রচনায় লেগে গিয়েছে—জিব্রাল্‌টার, মিশর থেকে জাপান কোরিয়া পর্যন্ত—ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে, ব্রহ্মে, ইরানে, প্যালেস্টাইনে, গ্রীসে কেমন প্রকাশ্যভাবেই স্বাধীনতা ও গণআন্দোলন দমিয়ে স্থাপন করা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটি ও তাঁবেদার শাসন। তাদের এই প্রকাণ্ড সামরিক ব্যূহের প্রধান সামরিক ও আর্থিক আশ্রয়কেন্দ্র যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ কথাও তাই বোঝা উচিত—ভারতবর্ষের এই দুই রাষ্ট্র থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা "বিদায়" নিয়ে গিয়েছে এ কথা কিছুতেই সত্য নয়; বরং দুই রাষ্ট্রই দেশীয় মালিকতন্ত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বন্ধনে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, যেমন তা তারা করছে গ্রীসে, বর্মায়, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, জাপানে। করছিল চীনেও। অতএব ভারতবর্ষে ফ্যাশিজম্ শুধু ভারতীয় মালিকতন্ত্রেরই ইচ্ছায় গঠিত হয় নি; তার রীতি নীতি পদ্ধতি স্পষ্টত মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নায়কদের অভিপ্রায়ানুযায়ী —তাই শিল্প জাতীয়করণ বন্ধ থাকে, বিদেশীয় পুঁজিপতিদের জন্য শোষণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর আভ্যন্তরীণ গণশক্তির বিরুদ্ধে—শ্রমিক-কৃষকের ও

বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে, সমস্ত প্রগতিমূলক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গঠিত হয় 'পুলিশ রাষ্ট্র'—ব্যবস্থা হয় বন্দুকের, লাঠির, রেডিওতে মিথ্যা প্রচারের, সিনেমার মিথ্যা চিত্রের, মালিকী সংবাদপত্রের কদর্য মিথ্যাবিলাসের, হয়ত বা জাতীয় টি. ইউ সি-র মত পি. ই. এন. বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত বনিয়াদী-প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সংস্কৃতির বিকৃতির, বিভিন্ন মার্কাধারী মালিক অনুচরদের সাহায্যে গণ-সংহতি বিনাশের, সংস্কৃতিক্ষেত্রে রবীন্দ্র-উৎসবে অর্ডিনান্স্-রাজের পুলিশ-মন্ত্রীর পৌরহিত্যের, ভাড়া-করা পণ্ডিত অধ্যাপকদের ইন্‌ফ্লেশান নিয়ে ধার-করা বুলি-পরামর্শের, এবং সময়ে-অসময়ে গান্ধীজীর নাম ও অহিংসা-মন্ত্র আবৃত্তির ;—গান্ধীবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আসে, তার সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা আসে, আসে শেষে তার "বৈপ্লবিক" ব্যাখ্যা পর্যন্ত—অগ্নিযুগের 'দাদা'দের মারফৎ। এমন কি, মূল বিশ্বসংকট থেকে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য 'বাংলার সংস্কৃতির সংকট' নামেই একটা কাগজী আর কেতাবী আন্দোলনও গড়া হতে পারে।

ভরসা এই, তবু বিপ্লব হার মানে না—মানে না বলেই পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশে ফুটে উঠছে সমাজতান্ত্রিক জীবন ও সংস্কৃতি, আর এক পঞ্চমাংশেও (চীনে, পূর্ব ইউরোপে) তার গোড়াপত্তন সুসম্পন্ন, আর বাকী পৃথিবীতেই কি মার্শাল প্ল্যান কিংবা নেহরু প্ল্যানের বাঁধ বেঁধে বিপ্লবের সেই জোয়ার রোধ করা যায় ? যায় না, যাবে না। কারণ এটা বিপ্লবের যুগ—১৯১৭ থেকেই বুর্জোয়া যুগ ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবসান ঘোষিত হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭এ তার আহ্বান পৃথিবীর সকল দেশের জনশক্তির প্রাণে গিয়ে পৌছেছে। বোঝাই যাচ্ছেপৃথিবী আজ ১৯৩৯-এর থেকেও বেশি পরিষ্কার রূপে দুই শিবিরে বিভক্ত। —কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছে সভ্যতার সংকট আর এখন নেই ততটা, এটা সভ্যতার রূপান্তরেরই শুভারম্ভ ; এরই সাক্ষ্য সোভিয়েট সভ্যতা। আর, এ বিপ্লবের যুগে তারাই হবে সৃষ্টির বাহন যারা এই বিপ্লবী ধারার অগ্রদূত। সে সৃষ্টিই হবে এখন সৃষ্টি, যাতে আছে আজকের বিপ্লবী শ্রেণীর কথা তার সাধনার স্বাক্ষর, আর আগামী কালের সমাজতান্ত্রিক জীবনের আভাস, শ্রেণীহীন সংস্কৃতির প্রতিশ্রুতি। অন্য সবই হবে সংস্কৃতির বিকৃতি ; যত থাকুক তার সূক্ষ্মতা, যত সুনিপুণ হোক তার রূপকর্ম, তার রসবিলাস,—তা সত্যহীন। কথাটা পরিষ্কার—বাঙালী সংস্কৃতির এ 'সংকট' আসলে বিপ্লবী দৃষ্টিতে সংকট নয়,—বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তরের দাবী,

বাঙালী মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি তার বিপ্লবী দান নিয়ে বাঙালী মজুর কৃষক বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী সংস্কৃতি রূপে বিকাশোন্মুখ,—বিকাশোন্মুখ তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবী শ্রেণীর সংস্কৃতির সঙ্গে মানব-মহীরুহের এই খণ্ডিত রক্তাক্ত শাখায়।”

এই অসমাপ্ত বিপ্লবের বিকৃতি কাটাইয়া ভারতের বহু জাতির সংস্কৃতি সেই সুসম্পূর্ণ গণবিপ্লবের মধ্য দিয়াই আবার নূতন যাত্রা আরম্ভ করিবে—বিশ্ব সংস্কৃতির দিকে; হইবে—Culture of the People, for the People and by the People-

———

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ ও পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধরূপ
পৃঃ ৩৯। ১১;	'শিকার করে খায়' নহে	'শিকার করে, খায়' হইবে।
পৃঃ ৪৩। ৫।৬;	'ধাতু বিশেষে' নহে,	'ধাতুর অভাবে' হইবে।
পৃঃ ৮৯। ১৯;	'কৃষি সেই প্রস্তর যুগের দ্বারা পুষ্ট হয় নাই' নহে,	'কৃষি সেই প্রস্তর-যুগের কাল হইতে প্রচলিত হয় নাই' হইবে।
পৃঃ ৯৭। ১৩;	'প্রকল্পনীয়' নহে,	'প্রকল্প' হইবে।
পৃঃ ৯৮। ৯;	'বাহাডালপুর' নহে,	'বাহাওয়ালপুর' হইবে।
,, । ১৩;	'মোহেন-জো-দড়ো, এই দুইটি নগর' নহে	'মোহেন-জো-দড়ো এই দুইটি নগর,' হইবে।
পৃঃ ৯৯। ৮;	'দয়ারাহ পাহানির' নহে	'দয়ারাম সাহানির' হইবে।
পৃঃ ১১৪। ২;	'কাশী বা কাঞ্চিতে' নহে	'—কাশীতে বা কাঞ্চিতে' হইবে।
,, ।২৫-২৬;	'(২) দাসতা প্রথার সমাজ, (৩) এশিয়াটিক সামন্ত-সমাজ, উহারই সমতুল্য' নহে	(২) এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ; (৩) দাসতা প্রথার সমাজ;' হইবে।
পৃঃ ১১৭। ২৫;	'গ্রীস বারেজের নহে	'গ্রীস বা রোমের' হইবে।
পৃঃ ১৩০। ২৩;	'দেখা দেয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে' নহে	'দেখা দেয় ক্ষত্রিয় নেতৃত্বে;' হইবে।
পৃঃ ১৩২। ১৯;	"বেদের কাণ্ডও" নহে	'বেদের কর্মকাণ্ডও' হইবে।
পৃঃ ১৫৬। ৪;	'শূদ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা' নহে	'শূদ্রে পরিণত হইয়াছিল, তাহারা' হইবে।
,, । ৫;	'আমরা শ্বেতকায়, আমাদের' নহে	'আমরা শ্বেতকায়,—আমাদের' হইবে।
পৃঃ ১৫৭। ১;	'উত্ত যুগের' নহে	'গুপ্ত যুগের' হইবে।
১৬৫। ৯;	'সামন্ততন্ত্রে টানিয়া' নহে	'সামন্ততন্ত্র টিকিয়া' হইবে।

শুদ্ধিপত্র

১৬৫ । ১৪ ;	'সমাজতন্ত্র টিকাইয়া' নহে	'সামন্ততন্ত্র টিকাইয়া' হইবে।
১৬৬ । ২৮ ;	'দ্বিতীয়ত' ইত্যাদি নহে	'দ্বিতীয়ত,' হইতে নূতন প্যারা হইবে।
১৬৭ । ৭ ;	'শেষ কথা…'নহে	'শেষ কথা' হইতে নূতন প্যারা আরম্ভ হইবে।
পৃঃ ১৬৭ । ১২ ;	'অবস্থাটা অদ্ভুত' নহে	'অবস্থা হইতে উদ্ভূত' হইবে।
পৃঃ ১৬৭ । ২৩ ;	'মালিকের সম্পর্ক কি কি' নহে	'মালিকের সম্পর্ক কি ? এবং কি' হইবে।

পৃঃ ১৬৭ । ৮ ; দ্বিতীয় ফুটনোট নিম্নরূপ হইবে ঃ

"The direct producer is here (i. e. in Feudalism) in possession of his means of production, of the material labour conditions required for the realization of his labour and the production of his means of subsistence. He carries on his agriculture and the rural house industries connected with it as an independed producer....At the same time, the property relation must assert itself as a direct relation belween rulers and servants, so that the direct producer is not free. (Capital III, p 918 Dobb এর গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬)

পৃঃ ১৬৮ । ৩ ;	'কোন্ শ্রেণীর'—ইত্যাদি নহে	'কোন্ শ্রেণীর,—যোদ্ধশ্রেণীর অস্ত্রই বল, না, পুরোহিত-রাজাদের' ইত্যাদি হইবে।
„ । শেষ পংক্তি	'নির্বাচিত হইত না' নহে	'নির্বাচনের নিয়ম ছিল না' হইবে।
পৃঃ ১৬৯ । ৩ ;	'বিলস পণ এবং' নহে	'বিলাসপণ্য ; এবং' হইবে।
১৭০ । ১৩	'খুঁজিয়া পাওয়া' নহে	'খুঁজিলেই পাওয়া যায়' হইবে।
১৭১ । ২৩	'ধনিকতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রে' নহে	'বণিকতন্ত্রও ধনিকতন্ত্রে হইবে।
১৯২ । ৮	'সমাজের নূতন সংস্করণ' নহে	'সাম্রাজ্যের নূতন সংস্করণ' হইবে।
১৯৪ । ২৬ ;	'মুসলমান শাসক' নহে	'মুসলমান শাসন' হইবে।
১৯৫ । ৭ ;	'গ্রামের চিহ্নিত' নহে	'গ্রামেরই উন্নত' হইবে।

" । ৮ ;	'অবস্থিত হইয়া বলিয়া' নহে	'অবস্থিত ছিল বলিয়া' হইবে।
১৯৬ । ৪-৫ ;	'ক্রম প্রভাবিত' নহে	'কম প্রভাবিত' হইবে।
" । ৯ ;	'উহারই মধ্যে' নহে	'উহাদের' হইবে।
" । ১০ ;	'রাষ্ট্র বন্ধনের 'অথবা ভারতীয়' নহে	'রাষ্ট্র বন্ধন ও সবথা' হইবে।
" । ১২ ;	'নাই—ব্রাহ্মণ' নহে	'নাই ; এখানে ব্রাহ্মণ' হইবে।
১৯৭ । ৮ ;	'নবশাঁখ' নহে	'নবশাখ' হইবে।
১৯০ । ২৩ ;	'নির্বাণ ও মুক্তির আদর্শেও' নহে	'মুক্তির আদর্শেও নির্বাণ' হইবে।
১৯৮ । ১১ ;	'মুসলমান এত সংখ্যাধিক্য' নহে	'মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য' হইবে।
১৯৯ । ৫ ;	'ঐতিহ্য এবং লৌকিক সঙ্গীত' নহে	'ঐতিহ্য এই লৌকিক সঙ্গীত' হইবে।
" । ১৮ ;	'কিছু কিছু তখন' নহে	'কিছু কিছু লোক তখন' হইবে।
২০০ । ২৫-৬ ;	'আর সংস্কৃতি, কাব্য রচনা' নহে	'আর সংস্কৃতে কাব্য-রচনা' হইবে।